মহাশ্বেতা দেবীর

# শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রমা

৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ । কলকাতা-১৭

প্রথম প্রকাশ
পয়লা বৈশাখ ১৩৫১

প্রচ্ছদ
খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক
সুরজিৎ ঘোষ
প্রমা প্রকাশনী। ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ
কলকাতা-১৭

মুদ্রাকর
মন্মথ সিংহরায়
রূপ-লেখা। ২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট। ৭/১ বিধান সরণী
কলকাতা-৬

চিন্ময়মোহন সেহানবীশ ও উমা সেহানবীশকে—

একটি সময়কে সংগ্রহ করে

যাঁরা জাতির জন্য রেখে গেলেন—

মহাশ্বেতা দেবী আজ বাংলা সাহিত্যে এমনই একটি নাম যা পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘদিন ধরে এত বিভিন্ন স্বাদের গল্প তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, যে তার থেকে নির্বাচন করে শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন করতে গেলে তা আকারে বিশাল হয়ে পড়বে। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত তাঁর বহু বিখ্যাত গল্পই বিভিন্ন গল্পসংগ্রহের মাধ্যমে পাঠকের কাছে অল্পায়াসলভ্য। আমরা তাই এই শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলনে তাঁর অধুনালুপ্ত পুরনো বইগুলি থেকে আশ্চর্য উজ্জ্বল কিছু গল্প বেশি পরিমাণে নিয়েছি, পাঠকদের কথা ভেবেই। সেই কারণেই তাঁর বর্তমান কালের বহুলপ্রচারিত বিখ্যাত গল্পগুলি সংকলনে তুলনায় কম স্থান পেয়েছে, যদিও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি তাদের কোনো অংশে কম নয়। যেমন এই মুহূর্তেই মনে পড়ছে প্রমা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বেহুলা' বা 'দ্রৌপদী'র মতো গল্পের নাম।

এই বইয়ের গল্পগুলি যথাসম্ভব সাজানো হয়েছে প্রকাশকালের ক্রম অনুসারে। এতে তাঁর গল্পের রীতি পরিবর্তন এবং বিকাশের ধারাটিকে বোঝা সহজ হবে। তবু তাঁর মতো একজন নিয়ত সৃষ্টিশীল লেখকের শ্রেষ্ঠগল্পের নির্বাচন নিশ্চয়ই বার বার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের সুযোগ রেখে দেয়। পরবর্তী সংস্করণে আরও অনেক অসাধারণ গল্পই হয়তো এই সংস্করণের কিছু গল্পকে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য করবে। তবু এই সংস্করণের গল্প নির্বাচনে সহায়তা করার জন্য লেখকের সঙ্গে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই শ্রীনির্মল ঘোষকে।

# লেখকের কথা

বর্তমান সংকলনটি আমার লেখক জীবনের প্রথম দিকের লেখা থেকে পরবর্তী সময় কাল—একটি দীর্ঘ পরিক্রমার মোটামুটি পরিচয়বাহী। সেই অর্থে পাঠক কৌতুহলী হতে পারেন। ইদানিং কালে একটা কথা বারবার আমার সম্পর্কে শুনতে হয়, যে সত্তরের দশকে "হাজার চুরাশির মা" থেকে আমি নতুন পথ নিলাম কেন। এই ধারণাটি সম্ভবত আমার ক্ষেত্রে ঠিক নয়। সাধারণ মানুষে আমার আগ্রহ প্রথম থেকেই। প্রথম বই "ঝাঁসীর রাণী"-তেও আমি অক্ষম ভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম যে সমগ্র মধ্য ভারতে ১৮৫৭-৫৮ গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল এবং লক্ষ্মীবাইয়ের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রেক্ষিত গণবৃত্তে বিচার্য। সাধারণ মানুষই যে ইতিহাসের প্রকৃত স্রষ্টা, সে ধারণাও আমার বরাবরই ছিল। একই বিশ্বাস, উৎস থেকে মোহনা অবধি আমার ক্ষেত্রে। সত্তরের দশক খুব গুরুত্বপূর্ণ আজও আমার কাছে। আপাত সিদ্ধিতে নয়। প্রচণ্ড অভিঘাতে। তার প্রতিঘাত ও প্রতিক্রিয়া দুইই আজ অনেক বেশি সত্য। সময়টিকে আমি ধরতে চেয়েছিলাম মাত্র। কী পেরেছি, কী পারিনি; পাঠকই শ্রেষ্ঠ বিচারক। অতীত ইতিহাসও ইতিহাস, (চম্পা, দেওয়ানা খইমালা)—আবার বর্তমান ইতিহাসও ইতিহাস (শরীর, ধীবর, পিণ্ডদান, জল, রং নাম্বার)। কোন কোন ইতিহাস সর্বকালের (আজীর, স্তনদায়িনী)। আমি বিশ্বাস করি, ইতিহাস চেতনা (গল্প লেখকের ক্ষেত্রে) এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা বর্তমান সময়কে বুঝতে সহায়তা করবে। শিল্পের জন্য শিল্প করার ক্ষমতা বা সাধ আমার ছিল না, করিনি। যেহেতু অন্য কিছু কাজের কাজ করতে শিখিনি, তাই পারি না-পারি লিখে গেছি। অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যও যথার্থ দলিলীকরণকেই যোগ্যতম মাধ্যম মনে করেছি। দুই একটি গল্পের "কি ও কেন" পাঠকের কাছে রাখছি। "চিন্তা" গল্পের ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। "চম্পা" গল্পের ধারণাটি পেয়েছিলাম ১৮৫৭-৫৮ বিষয়ে পড়তে পড়তে। "ঝাঁসীর রানী" লেখার সময়ে অনেক পড়েছিলাম, দলিলদস্তাবেজ ঘেঁটে ছিলাম। লোকবৃত্ত থেকে যা লেখা নয়, ছাপা নয়, যেমন গাথা, ছড়া, গান ও কিংবদন্তী

সংগ্রহ করেছিলাম। লোকবৃত্ত থেকে সংগৃহীত উপাদানকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি, কেননা তা থেকে বোঝা যায় অতীত ও বর্তমানের সাধারণ লোক কি চোখে ঘটনাটিকে দেখেছেন। সেই সব পুঁজি করেই "নটী" ও "অমৃতসঞ্চয়" লিখি এবং "চম্পা" সহ কয়েকটি গল্প। "ছায়াবাজি"র নায়ক পশ্চিমবঙ্গে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সত্য। "আজীর" গল্পটি উলো-বীরনগরের মুস্তফি বংশের ইতিহাসে মুদ্রিত এক আত্মবিক্রয়কারী দাসের দাসপাট্টা দেখে মনে আসে। "দেওয়ানা খইমালা"র গুরুবাবা ও "ধীবর"-এর নায়ক দেখা চরিত্র। "উর্বশী ও জনি" জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে সেই সময়েই লেখা "স্তনদায়িনী"র যশোদাকে পশ্চিমবঙ্গ বলে মনে করে লিখেছি, যদিও স্তনে ক্যানসারের ব্যাপারটি সাধ্যমত জেনে নিই সদাশয় ডাক্তার টম চৌধুরীর সহায়তায়। অবশ্যই মেডিক্যাল ডিকশনারিও ছিল। গল্পগুলিকে নিছক বিষয়বস্তু, ভাষা, শৈলী ও আঙ্গিকের নিরিখে না দেখে বক্তব্য, প্রেক্ষিত ও বক্তব্য প্রকাশে সার্থকতা ও ব্যর্থতা, এগুলো জড়িয়ে সামগ্রিকতায় দেখতে পারলে ভালো। এ কথা সম্ভবত আমার সব লেখা বিষয়েই এবং সকলের সব লেখা, সাহিত্যবিচার ক্ষেত্রেই সত্য। সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। সাহিত্য বিচার ইতিহাস প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোনো লেখককেই মূল্যায়ন করা যায় না। পুরাকথাকে, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে আমি বর্তমানের প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করি অতীত ও বর্তমান যে লোকবৃত্তে আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রথিত তাই বলার জন্য,—যেমন "পিণ্ডদান"—এ দশরথের কাহিনী এবং "বাঁয়েন"—এ কালু ডোমের উপাখ্যান। এই তো সব কথা। যেহেতু এখনো লিখছি, সেহেতু আমি আমার বর্তমানে যতটা আগ্রহী, অতীতে ততটা নয়। তবে অতীত থেকে বর্তমান মোটামুটি একটা ঠিকানায় পৌঁছবার জন্যই পথ চলা। পথ পথের নিয়মে বহুধা, বিস্তৃত, ব্যাপক ও বিচিত্র হয়েছে মাত্র। এই পথিক পারুক না পারুক, কোনো পথের আহ্বানকেই এড়িয়ে যাচ্ছে না এখনো। সব পথ না হাঁটলে ঠিকানায় পৌঁছনো যাবে না, আমি এখনো হাঁটছি।

## সূচী

# চম্পা

১৮৫৭ সাল। কানপুর ক্যান্টনমেণ্ট।

ল্যাংড়া কোতোয়ালি পিওন হরচান্দ্ সিং কানপুর রেজিমেণ্টে সকলের চেনা। বুড়ো গাড়োয়ালি। ভুরু অবধি সাদা। কাঠামোখানা শক্ত বলে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। ১৮৩৭ সালে হুইলার সাহেবের ঘোড়াকে ছুট করাতে গিয়ে উলটে পড়ে একখানা পা জখম হয়ে যায় হরচান্দের। হুইলার সাহেবের দয়াতে মাসে দুই টাকা মিলছে তার আজও। বিশবছর বাদেও সামরিক দপ্তর থেকে। তাতে পেট চলবার কথা নয়। তাই হরচান্দ্ রেজিমেণ্টের রিসালাবাজারে একখানা ঘর ভাড়া করে শাকসবজি বেচবার পারমিট নিয়েছে। তার পাশে বসে থাকে তার বাইশ বছরের নাতজামাই ব্রিজলাল। মা-বাপ মরা নাতনি চম্পার সঙ্গে ব্রিজলালকে বিয়ে দিয়ে সংসারে বাঁধন জড়িয়েছে হরচান্দ্। বড়ো ভালো মেয়ে চম্পা। বড়ো ভালবাসেন তাকে ক্যান্টনমেণ্টের মেমসাহেবরা। বিশেষত শেরিডান সাহেবের বিবি তো চম্পাকে ছোটোবেলা থেকেই স্নেহ করেন। বাইবেলের ছবি দিয়ে, চুল বাঁধতে শিখিয়ে, সেলাই শিখিয়ে নানাভাবে চম্পার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন মেমসাহেব। হিন্দু বিয়ের রীতিনীতি আলাদা। ইচ্ছে থাকলেও এই বিয়েতে কেক বানাবার সুযোগ ছিল না। তাই অনেক আশীর্বাদ জানিয়ে একটি লাল থলিতে দশটি টাকা দিয়েছিলেন মেমসাহেব চম্পাকে। চম্পার কানের গহনা সেই টাকাতেই কেনা। চম্পা আর ব্রিজলালকে নিয়ে সুখে থাকে হরচান্দ্। কেউ জিজ্ঞাসা করে যখন—কেমন আছ? কী খবর?

কোম্পানিকী দয়া মেঁ···বলে কথা শুরু করে হরচান্দ্। সকলেই কৌতুক অনুভব করে হাসে। সবাই জানে কথা শুরু করতে হলেই হরচান্দ্ বলবে—কোম্পানিকী দয়া মেঁ···। একদিন হুইলার সাহেবকেও পথে সেলাম দিয়েছিল হরচান্দ্। হুইলার বলেছিলেন- ভবিষ্যতের কী হাল হরচান্দ্?

কোম্পানিকী দয়া মেঁ·····হরচান্দের জবাব শুনে খুব কৌতুক অনুভব করেছিলেন হুইলার। সেই থেকে হরচান্দ্ আরো বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। কোম্পানিকী দয়া মেঁ...তার মুখে এই কথাটা শুনবে বলেই লোকজন

তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছ হরচান্দ্? তবিয়তের কী হাল? হাসতে হাসতে হরচান্দ্ বলে—কোম্পানিকী দয়া মে⋯

দোকানে বসে প্রভুলালের সঙ্গে দাবা খেলছে হরচান্দ্ আর আলু তৌল করছে ব্রিজলাল, এমন সময় চুড়ি বাজাতে বাজাতে দোকানে ঢুকল চম্পা। রাস্তা থেকে উঠে আসতে ব্রিজলালকে যেন দেখেও দেখল না। আহ্লাদ করে ফরসা কাপড় পরেই দাদার কাছে বসে পড়ল মাটিতে। বলল—দেখ দাদা, মেমসাহেব কী দিল আমায়।

মোরাদাবাদের পেতলের জালিকাজ করা কাস্কেট। তাতে থরে থরে সুঁচ, নানা রঙের সুতো, বোতাম সাজানো। হরচান্দ্ বলল—দেশে চলে যাবে মেমসাহেব। তার কাছ থেকে এটা কী জিনিস নিলি চম্পা? দামি কিছু নিলি না কেন?

—এটাও দেখ।

রুপোর চেনে ছোট্ট একটা লকেট। দিল্লির রেজিমেণ্টের চ্যারিটি ফেয়ার পরিচালনায় পারদর্শিতার জন্য ক্লাবের তরফ থেকে মার্গারেট শেরিডানকে দেওয়া উপহার। চম্পা বলল - মেমসাহেব বললেন, চম্পা, কী চাস তুই বল? আমি বললাম, এমন একটা কিছু দিন, যাতে আমার সর্বদা আপনাকে মনে পড়ে আর সকলকে দেখাতে পারি। মেমসাহেব বললেন, এটা তাঁর অল্পবয়সের মেডেল। কখনও পরেননি গলায়। যত্নের জিনিস, তাই এটাই দিলেন।

কী করবি?

—গলায় পরব—বলে ঘরে উঠে গেল চম্পা। ব্রিজলালকে চোখ টিপে ইশারা করল। করুণ চোখে দাদাশ্বশুরের দিকে তাকাল ব্রিজলাল। একহাত কাচের চুড়ি আর পেতলের চাবির গোছা ঝনঝনিয়ে রাগ জানিয়ে গেল চম্পা। ব্রিজলাল দেয়ালের গায়ে কুলুঙ্গিতে গণেশ-মূর্তির দিকে তাকাল। তার বিপদের কথা সে-ই জানে। এদিকে খদ্দের দোকানে,—দাদাশ্বশুর দাবা খেলছে, বৌ হয়তো রাগ করল। সবদিক কি ঠেকা দেওয়া যায়? সুজনকে আদা দিয়ে পয়সা নিতে নিতে মনে মনে তারিফ করল ব্রিজ। এই কালো, রোগা, বাতিক আর বাতগ্রস্ত লোকটা কী অসীম দক্ষতার সঙ্গে দুটো দজ্জাল বৌ আর দুই প্রস্থ শ্বশুরবাড়ি সামলে যাচ্ছে সাত বছর ধরে। পয়সা দিতে দিতে বলল—বাহাদুর! সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল সুজন। ব্রিজের ওপর তার অনাস্থা অসীম। চারপাশে এতগুলো মামুলি চেহারা থাকতে এই রকম লম্বা-চওড়া গোঁফওয়ালা একটা

বর্বরকে কেন যে নাতনি দিল হরচান্দ, কে জানে। লাভের মধ্যে কুয়োতলায় বসে বাসন মাজতে মাজতে রামসহায় মিশিরের গলির সব মেয়েরাই বলাবলি করে, বর চাই বিরিজের মতো, অমনি গোঁফ না থাকলে পুরুষের শোভা হয় না।

পেতলের সানকিতে আটা ঢেলে জল ছিটিয়ে বেগুন কুটল চম্পা। চুলো জ্বালিয়ে ডাল চাপিয়ে দিল। পরিষ্কার ঠাণ্ডা আঁধার ঘরখানার আবার ঝাড়ু দিল। তারপর যত্ন করে মেম-সাহেবের দেওয়া মালাটা টাঙিয়ে রাখল দেয়ালে। এ কী রকম মালা? কোনো কারুকাজ নেই, কী সব লেখা। এ মালা সে কোনোদিনই পরবে না।

শেষ অবধি অবিশ্যি শেরিডান সাহেবের দেশে যাওয়া হল না। বাজার গরম করে নানারকম কানাঘুষো শোনা গেল। রেজিমেণ্টবাজারে গুজবের যেন পাখা গজিয়েছে। ফৌজ আর রিসালার মধ্যে কানাকানি চলতে লাগল। তাই নিয়ে জটলা হতে লাগল হরচান্দের ছোট্ট দোকানে। এই গোলমালের মধ্যেই শেরিডান সাহেব ঘোড়া থেকে পড়ে পা ভাঙলেন। বুড়ো ডাক্তার ম্যাকলে মাথা নাড়লেন। মিসেস শেরিডানের বিয়ের উপহারের রুপোর পেয়ালায় কফি খেতে খেতে বললেন—জায়গা বদলানো চলবে না। ডাকের গাড়িতে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

মে মাসের প্রথম দিক। গরম পড়ছে। ছোট্ট পাখাকুলিটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ধুলোর ঘূর্ণি পাকিয়ে উঠছে বাতাসে। গঙ্গার ওপার থেকে খেয়া মাঝির গলার ডাকটা কেমন উদাস করে দিচ্ছে মন। সেইদিকে তাকিয়ে মিসেস শেরিডানের হাতটা টেনে নিলেন শেরিডান। বললেন—ইণ্ডিয়াতে পঞ্চাশটা বছরই কাটিয়ে দিলাম, কী হবে ছুটির কথা ভেবে। এখানেই থাকি, কী বল মার্গারেট? মার্গারেট স্বামীর হাতে মৃদু চাপ দিলেন। বৈশাখের সকালের এই মন উদাস করা ধু ধু পরিবেশে মনটা শান্ত হয়ে এল। মনে হল, কী হবে আর নতুন করে ঝামেলা করে। এই তো বেশ আছি। ছেলে-মেয়ে নেই, আছে একমাত্র শেরিডানের ছোট ভাইয়ের ছেলে এভারেট। সেও আগ্রাতেই রয়েছে। বললেন—তাহলে মিসেস ড্যানিয়েল্‌সকে লিখে দিই, কী বলো? অরফান স্কুলটার জন্যে চ্যারিটি যদি কিছু করা যায়।

সেই মালাটার কথা সবাই ভুলে গেল। বিরিজ চম্পাকে বলল—ও কি গলায়

পরে? তোকে আমি সোনার হার দিচ্ছি, সবুর কর। চম্পা স্বামীর হাত গলায় জড়িয়ে নিয়ে বলল—বা রে, আমি কি গয়না চেয়েছি? টাকা হলে সবচেয়ে আগে দাদাকে একবার কাশী ঘুরিয়ে আনতে হবে। কথা দেওয়া আছে, মনে নেই।

ব্রিজ বলল—নাতনি ভাবে দাদার কথা, দাদা ভাবে নাতনির কথা, আমার কথা কে ভাববে বল। বিয়ের আগে কি এত জানতাম?

—জানলে বুঝি বিয়ে করতে না?

এই সব কথাবার্তার ভেতর দিয়ে মালাটার প্রসঙ্গ সবাই ভুলেই গেল। দেওয়ালে তেমনিই টাঙানো রইল মালাটা। মেমসাহেবের সঙ্গে আর একবার দেখা করবে ভাবল চম্পা। সংসারের নানা কাজে সময় পেল না। যাই যাই করেও যাওয়া হল না। আর গরমও পড়ল প্রচণ্ড। ভরা বৈশাখ। মাটি যেন জ্বলে যাচ্ছে, গঙ্গার জল শুকিয়ে যাচ্ছে। নৌকো চলাই কঠিন হয়ে উঠবে মনে হয়।

সেই প্রভাতের প্রশান্তি ভেঙেচুরে ঘনিয়ে নামল কালবৈশাখী। মীরাট ছাউনিতে তুফান উঠল। ১০ই মে। ঝাপটায় টালমাটাল হয়ে গেল কানপুর। বিজিত ও বিজেতা, দুই জাতের মোকাবিলার সময়ে দিনগুলো হয়ে গেল রক্তাক্ত। কানপুরে খুন হয়ে গেল ইংরেজ নরনারী ও শিশু। গঙ্গায় জল ছিল না। নৌকোয় চড়ে পালাবার চেষ্টা মর্মান্তিকভাবে বিফল হল। সতীচৌড়া ঘাটের জল লাল হয়ে গেল। বিবিঘরে ইংরেজ নারী আর শিশুরা হল নিহত। তার জবাব নিতে এগিয়ে এল হ্যাভলকের বিজয়ী ফৌজ। কানপুরের যে সব ভারতীয় নাগরিক ইংরেজ হত্যায় কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি, তারা ছাড়া সকলেই পালিয়ে গেল শহর ছেড়ে। রইল তারাই, যারা খুব ভালো করে জানে যে তারা নিরাপদ।

আজ তারিখ কত? ১৩ই জুলাই ১৮৫৭। হরচান্দের ঘরে বিছানায় শুয়ে পাশের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে এভারেট শেরিডান আবার মনে মনে উচ্চারণ করল তারিখটা। দুরন্ত গরম। হ্যাভলকের ফৌজের সঙ্গে আসতে আসতে ফতেগড়ে একটা ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়ে গেল। হতভাগ্য এভারেট। নিহত নারী ও শিশুদের হয়ে প্রতিশোধ নিতে প্রতিশ্রুত প্রত্যেকটি ইংরেজ সৈনিক। যাদের আত্মীয়-স্বজনরা নিহত হয়েছে তাদের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। কাকা আর কাকিমার মৃত্যু-সংবাদ এভারেট বিশ্বাস করতে পারে

নি। কিন্তু সংশয়ের কোনো অবকাশই নেই। বৃদ্ধ শেরিডান নিহত হয়েছেন সতীচৌড়া ঘাটে। তার কাকিমা? বালিশে মুখ গুঁজল এভারেট। তার কাকিমা কাছে থাকলে কী বলতেন? সাহস রাখো, ধৈর্য ধরো? ভালোই হয়েছে। এই চরম বেইমানির দিনগুলো দেখছেন না তাঁরা। ঈশ্বরের প্রত্যেকটি সন্তানকে ভালোবাসবার ও ক্ষমা করবার নীতিটা একমাসেই বরবাদ হয়ে গিয়েছে। জানের বদলে জান, তরোয়ালের বদলে গুলি এই হচ্ছে নতুন নীতি। বড় দুঃখের কথা, এই সময়ই এভারেট চোট খেল পায়ে। পথে এই বাড়িটা ছিল তাই ডুলির জন্যে অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু নেটিভের বাড়ি?

দুধের লোটা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল হরচান্দ্। বলল—এ চম্পা, এ দিকে আয়। দুধ গরম করে দে সাহেবকে।

করজোড়ে বলল—সাহেব, একটু দুধ খাও। বড়ো তকলিফ করে এনেছি। কোম্পানিকী দয়া মেঁ···

ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে দুধের গ্লাস নিয়ে এল বুড়োর নাতনি। অদ্ভুত নাম—চম্পা······ম্যাগনোলিয়া······দুধের গ্লাসটা হাতে ধরে এমন হাসি পেল এভারেটের। আরনল্ড প্রেটারসের ডে-স্কুল······বটানি ক্লাসে অ্যালবামের জন্য ফুল-পাতা সংগ্রহ করে ল্যাটিন নামগুলো মুখস্থ করা, স্কটল্যাণ্ডে ছুটি যাপন আর লেক্ ডিসট্রিক্ট-এ পথ হারিয়ে নেভিলের সঙ্গে এক চাষীর কুটিরে গিয়ে রাত কাটানো······টেবিলে বসে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে এক-সঙ্গে প্রার্থনা করা—**Hallowed be Thy Name**—এই সবগুলো কেমন অর্থহীন হয়ে গেল। সে-জীবনটা সে—এভারেট শেরিডান, 84th ইন্‌ফ্যান্‌ট্রির সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার—কোনোদিনও কাটায়নি। সে-সব অন্য কোথাও, অন্য কারো জীবনে ঘটেছিল।

ভয়ে ভয়ে চম্পা দুধের গেলাসটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। এভারেট হরচান্দ্‌কে বলল—ডুলি মিলতে কত দেরি আছে?

কোম্পানিকী দয়া মেঁ······বলে হরচান্দ্ লাঠি ঠকঠক করতে করতে বেরিয়ে গেল। মাথার নিচে দু-হাত দিয়ে এভারেট চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। এই নোংরা চেহারার বুড়োটা নাকি খুব বিশ্বাসী। বাড়িতে আর একজন পুরুষমানুষও আছে, লম্বা-চওড়া, চোয়াড়ে চেহারা। মুখ দেখলে তো নেটিভমাত্রকেই গুলি করতে ইচ্ছে করে। তবে এরা নাকি লুঠতরাজে কোনো কিছুতেই যোগ দেয়নি। আর এখন তো ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে সবাই।

হাভলক মানুষ ধরে ফাঁসি দিতে দিতে এসেছেন! মরতে কে না ভয় পায়! এরা সেইজন্যেই বিশ্বাসী সাজছে কিনা কে বলবে। কানপুরে তদন্ত কমিশন বসবে। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী দোষী-নির্দোষ সাব্যস্ত হবে। লুঠের মাল যার কাছ থেকে বেরুবে—

বোধ হয় ডুলি এসেছে। নিচে বাদানুবাদ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ উত্তেজিত গলা শোনা গেল ব্রিজলালের—কে বলেছিল তোমাকে ছুটোছুটি করতে? ডুলিতে কাঁধ দিতে বলছ আমাকে? বেয়ারা কম পড়েছে তাতে আমি কী করব? সব তাতেই বাড়াবাড়ি তোমার—নিজে পারো না। আমাকেও বিশ্বাস করো না···আমি গেলে ঠিক বেয়ারাকে ধরে আনতাম···পয়সা নেবে কাজ করবে—

—চুপ কর্ ব্রিজলাল, চুপ কর্—

—আসলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না—

—ব্রিজ!

—আমাকে বেরোতে দাও না—

—দাদা!

চম্পার গলার আর্ত মিনতি শোনা গেল! কৌতূহলী এভারেট কান খাড়া করল। ভাঙা-ভাঙা গলায় মেয়েটি বলছে—দাদা যা বলছে তা তো ভালোর জন্যেই—তুমি যে সেদিন উধমজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে—সকলে তো তা মানবে না। যদি কেউ বলে যে সতীচৌড়া ঘাটে ছিলে তুমি?

উধমজী নিশ্চয় কারো নাম নামটা মুখস্থ করলে এভারেট।

—আমি যে কী ভয়ে দিন কাটাচ্ছি······কেউ কি ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করবে? ······চারপাশে শুধু চোরা খবর ছড়াচ্ছে···লখপতিয়ার কথা ভাবো···কোনো বিচারের আগেই ভজন সাহাকে ফাঁসি দিল···আমি কি লখপতিয়ার মতো বিধবা হবো, তা-ই চাও তুমি?

এভারেট উঠে দাঁড়াল। সে কি কোনো ষড়যন্ত্রের কথা শুনছে? ······কী ব্যাপার? তার পিস্তলটা পড়ে গেল মাটিতে। শব্দ হল। আর হঠাৎ একসঙ্গে কথাবার্তা থেমে গেল। এভারেট ডাকল—কোঈ হ্যায়? ছুটতে ছুটতে ঢুকল হরচান্দ্। ভয়ে কুঁকড়ে গেছে রেখাঙ্কিত মুখখানা। থরথর করে কাঁপছে ঠোঁট। বলল—হাঁ হুজুর, মেহেরবান······ডুলি এসে গিয়েছে···এক বেয়ারা কম···

—চলুন সাহেব···দরজায় এসে দাঁড়াল ব্রিজলাল। হরচান্দ্‌কে বলল—আমি যাচ্ছি সঙ্গে। দেয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে এসে দাঁড়াল মেয়েটা।

—টোটা কোথায় ? বলল এভারেট।

—দিচ্ছি···

চম্পাকে অবকাশ না দিয়েই দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল এভারেট। দেয়ালের গায়ে সামান্য রোদ এসে পড়েছে। পেরেকের গায়ে ঝুলছে টোটার মালাটা। তার পাশেই চকচক করছে কী যেন। পিঠের যন্ত্রণায় টেবিল ধরে বেঁকে গিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ করে দেখল জিনিসটা। বলল—উতারো।

রুপোর চেনের সঙ্গে পুরোনো ঢঙের একটা লকেট। দেখে রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করতে লাগল এভারেটের শিরা-উপশিরায়। **Awarded to Mrs. Margaret E. Sheridan, On the excellent occasion of……**

—আপনি মেমসাহেবকে জানেন হুজুর ? ···হরচান্দের প্রশ্নের জবাব মিলল না। এই লকেটটার সঙ্গে এভারেটের কৈশোর ও বাল্যের অনেক স্মৃতি জড়িত। হরচান্দ্‌কে ঠেলে সরিয়ে দিল চম্পা। ঘোমটা খুলে ফেলল। বলল—হুজুর, শেরিডান সাহেবের বিবি আমাকে খুব পছন্দ করতেন। যখন ঘরে যাবার কথা হল, তখন আমাকে উনি মেহেরবানি করে এই মালা আর···

—আর কী ?

—এক সেলাই বাক্স দিয়েছিলেন—

—দেখাও···

খুলে দেখাল চম্পা। 'মার্গারেট শেরিডান' নাম খোদাই করা কোনায়। এভারেট জ্বলন্ত ঘৃণাভরা চোখে তাকাল তাদের দিকে। ভয়ঙ্কর কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল, শ্বাসরোধকারী হয়ে উঠল বাতাস।

এক মিনিট···দুইমিনিট···মাটিতে আছড়ে লম্বা হয়ে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল চম্পা—হুজুর আপনি যা ভাবছেন তা নয়··· আপনি অন্য কিছু ভাববেন না······এ সাহেবদের কুঠি লুঠের মাল নয়······

জুতোর শব্দে পাথরের মেঝেতে ঝড় তুলে ঘরে ঢুকল চারজন ইংরেজ সৈনিক। স্ট্রেচার তাদের সঙ্গে। এভারেটের হাতে রুপোর লকেটটা দেখে থেমে গেল তারা।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল হরচান্দ্‌। ব্রিজলালও হতবুদ্ধির মতো পাশে বসল

প্রত্যেকের চোখে ফুটে উঠছে দণ্ডাজ্ঞা। কোম্পানিকী দয়া মেঁ··· হরচান্দের গলায় কথাটা ভয়ে ফুটতে পেল না। তবু রুদ্ধগলায় বলল—কোম্পানিকী দয়া মেঁ···

সমরকালীন জরুরি তদন্ত কমিশন অবশ্য ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করল, কিন্তু সে শুধু আইনের ব্যাপার। তাতে বিচার উলটে গেল না। বারবার বলেছিল বটে খোঁড়া বুড়ো—শেরিডানের বিবি তার নাতনিকে দিয়েছিলেন জিনিসগুলো। কিন্তু কে না জানে এসব বাস্তবে ঘটে না। নেটিভ একটা মেয়েকে ব্যক্তিগত স্মারকচিহ্ন উপহার দেয় কোনো ইংরেজ মহিলা? এরকম পাগলামি কি কেউ করে? প্রশ্নরত শেরার সাহেবকে বুড়োটা প্রাণের মায়ায় বলেছিল—হ্যাঁ হুজুর, বিবি শেরিডান পাগলই ছিলেন···

—কী বলছ?

—নইলে কেন দিয়েছিলেন বলুন আবার নাতনিকে?

**—Withdraw, withdraw...**

—না হুজুর, পাগল ছিলেন না···

—বল্ দোষ করেছিস?

—হাঁ হুজুর···কোম্পানিকী দয়া মেঁ···

তখন ব্রিজলাল সঘৃণায় বলেছিল—বুডঢা, কোম্পানির দয়ায় তুমি ফাঁসিকাঠ অবধি পৌঁছে গিয়েছো। এখন ও মুর্দা কথা ছাড়ো।

**—Stop his mouth···**

—একবার হাত খুলে দিতে পারো সাহেব, এই কাপুরুষ বুড়োকে আমিই গলা টিপে খতম করে দিই···কেন, মরতে শেখোনি? দয়া চাইছ? ভিক্ষা করছ?

—ব্রিজ, চম্পা··· আমার চম্পা···

হরচান্দ্ ভেউ ভেউ করে শিশুর মত কেঁদেছিল। তাদের বয়ালগাড়িতে চড়িয়ে গাছের নিচে নিয়ে ফাঁস পরাতে পরাতে মেথরটা হাসছিল। কোম্পানিকী দয়া মেঁ···কোম্পানির দয়ায় ওকে সিধা স্বর্গে পাঠিয়ে দাও···সৈনিকরা বলছিল। স্বর্গে চলে যা ব্যাটা···বলে হাসছিল সিপাহিরা।

কয়েকমাস কেটে গিয়েছে।

ম্যাক্সওয়েলের বিজয়ী বাহিনী কাল্পিরোডের ধারে ভগবানপুরে ক্যাম্প

করেছে। পরিত্যক্ত গ্রাম। গ্রামবাসীরা পালিয়েছে ইংরেজ আসবার আগেই। অফিসার-ক্যাম্পের সামনে ধুনি জ্বলছে। তার তাপে মাঘ মাসের শীত টের পাওয়া মুশকিল। সামনে ছড়িয়ে রয়েছে খাট, চৌকি, খাটিয়া, আলনা, ছোটছেলের দোলনা। সেগুলো আছড়ে ভেঙে শিখ সিপাহিরা ধুনির মধ্যে ফেলছে। গাঁয়ে আগুন দিতে পারলে মজা জমত ভালো। কিন্তু বেশ কিছু গোলাবারুদ, বন্দুক মিলেছে। তাতে যদি আগুনের হলকা এসে পড়ে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শিখ সিপাহিদের জমায়েত। নৈশ-ভোজনের পর বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে উল্লাস চলেছে। আজ একটা সুবর্ণসুযোগ এসেছিল। সন্ধের সময় গাঁয়ের অদূরে ঝোপের মধ্যে ঝুড়ি বোঝাই বোতল বোতল দেশি মদ পাওয়া গিয়েছে। বয়ালবিহীন একটা গাড়িতে মদের বোতলগুলো নিয়ে বসে ছিল একটি মেয়ে। বয়াল নিয়ে আসবার নাম করে সঙ্গী পুরুষটি পালিয়ে গিয়েছে। মেয়েটার সঙ্গে দলবল নিশ্চয় ছিল। নইলে ভাটিখানা চালু করল কে? নিশ্চয়ই সে একা নয়। যাই হোক ইংরেজের সঙ্গে দুশমনি করবার থেকে এ কাজ যে অনেক ভালো, তাতে সন্দেহ নেই। মেয়েটা দেখতে সুন্দর, কিন্তু মেজাজ যেন সাপের মতো। কানে বড়ো বড়ো আংটা, পরনে ঘাঘরা, মাথায় রুমাল বাঁধা, ইরানি মেয়ে হবে। ধরা পড়তে দাঁতে একটা ছোরা কামড়ে ধরে, হাতে পিস্তল নিয়ে লড়তে এসেছিল। সাহেবদের বারণ আছে তাই—নইলে শিখরা দেখিয়ে দিত যে, কেমন করে সায়েস্তা করতে হয় এইসব মেয়েকে। শিখ সিপাহিদের সঙ্গে সে ঝগড়া করতে করতে এল। বেতের গাছের মতো ছিপ-ছিপে শরীর। ফুঁসে ফুঁসে উঠছিল রাগে। পুরুষগুলোকে পেছনে রেখে রানীর মতো সগর্বে নিজেই আসছিল আগে আগে। সে তাদের মালিক, এমনই ভাবখানা। সাহেবের কাছে এসে মাটিতে শুয়ে পড়ল সেলাম জানিয়ে। ভালো অভিনয় জানে। বিনয় ও ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে ছোটো ছোটো কথায় জানাল যে মদের বোতলগুলো কোম্পানিসাহেবের সেবায় ছেড়ে দিয়ে সে চলে যেতে চায়। দাম সে চায় না। কোম্পানির কাছে সে এমনিতেই কৃতজ্ঞ। এভা-রেট সাহেবের দয়ার প্রাণ। যুবতী দেখে পাঁচটা টাকা ফেলে দিলেন মেয়েটাকে।

তখনই চলে না গিয়ে মেয়েটা ঝাঁকিয়ে বসল। বলল—সাহেব, সাপের ওষুধ নেবে? কোনো খেলা দেখবে?

অন্যান্য সাহেবেরা ভিড় করে দাঁড়াল। বলল—নাচ-গান কিছু জানো না কি ?

নাচতে জানে না বটে, কিন্তু গান গাইল মেয়েটা। ধুনির আগুন কমে এসেছে। কাঠকয়লার অঙ্গারের আভায় কালো চোখে ঝিলিক খেলছে। লম্বা বেণীদুটো লুটিয়ে পড়েছে কাঁধ দিয়ে। মাটিতে ঘাঘরা বিছিয়ে বসে মেয়েটা যখন গান গাইল, দেখতে তো ভালোই লাগল, কানে যেমনই শোনাক না কেন গান।

—হাত দেখতে জানো নাকি ?

প্রশ্নটা শুনে মেয়েটা খিলখিল করে হাসল। বলল—কানপুর রেজিমেন্টে যাব সাহেব, হাত দেখে দেব তোমাদের। টাকা নেব, কাপড় নেব। এখন আঁধার হয়ে গিয়েছে, ঘরে যাব না ?

—কোথায় ঘর তোমার ?

—এই তো হুজুর একটু আগেই। তোমার সিপাহিদের দাও না, দেখে আসবে ঘর।

দুজন সিপাহি সঙ্গে চলল, ক্যাম্প ছাড়িয়ে এসেই চোখে চোখে ইশারা করে পরস্পর হাসল। মেয়েটিকে বলল—পিয়ারা, একটা গান শোনাবে ?

মেয়েটা বলল—একটা বেচালের কথা বলেছ কি সাহেবকে বলে দেব।

—আরে রাগ কর কেন ?

মেয়েটার বাড়িতেই বোধহয় আলো জ্বলছিল। কাছাকাছি এসে মেয়েটা বলল—এবার তোমরা যাও সিপাহিজী। ক্যাম্পে যাও, মৌজ কর।

মেয়েটার গলায় কিছু বিদ্রূপ ছিল কি ? মুখে হাসি ছিল ? অন্ধকারে বোঝা গেল না। ক্ষেত পেরিয়ে টপকে চলে গেল মেয়েটা।

এই সব লুটের মালের মতো বোতলগুলো নিয়েও জমা করতে হবে নাকি— এই নিয়ে যখন তর্ক চলেছে তখন ত্রিশ-বত্রিশ সালের পাকা লড়িয়ে বুড়ো জঙ্গিরা ছোকরা-গোরাদের টিটকিরি দিতে লাগল। মুলতান, বক্সার আর বোম্বাই-এ কখনো-সখনো দেশি জিনিস খেয়ে দেখেছে তারা। নেশার কথা ? ইয়ংম্যান, এরা কী জানবে। আফগান লড়াইএর সময় হরদম কান্ট্রির বোতল ফুঁকে দিত গোরাগুলো। নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকত। তখন তাদের ওপর ছুরি চালাত সার্জন সাহেব। কান্ট্রি লিকারের গুণের কথা বলতে গেলে এখনো ম্যাকনীলের চোখ দিয়ে জল পড়বে। **Glorious thirties**—! ছোকরা

লরেন্স কি গানই বানিয়েছিল কাণ্টি নিয়ে। কোথায় গেল সেইসব দিন? পেট্রিক পড়ে আছে সাহাবাদের কবরখানায়, আর লরেন্স হয়ে গিয়েছে মস্ত বড়ো মানুষ।

—কাণ্টির ওপর ভোট নেব নাকি? —বলতে গিয়ে কানিংহাম ধমক খেল। —লে-আও, লে-আও। হুকুম পেয়ে দৌড়ল দুইজন শিখ সিপাহি।

বোতলগুলো খোলার আগেই কিন্তু দেশি সিপাহির জমায়েত থেকে হৈ-চৈ শোনা গেল। ছুটতে ছুটতে এল একজন ছোকরা। সামরিক রীতিনীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ছুটে এল সাহেবদের মাঝখানে, এর ঘাড়ে হাত দিয়ে টপকে, ওর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল—হুজুর, জহর…… পুরা জহর…জ্বলে গেলাম!

উপুড় হয়ে পড়ে গড়াতে গড়াতে আগুনের কাছাকাছি গিয়ে কয়েকটা ঝাঁকুনিতে আক্ষিপ্ত হয়ে চুপ করে গেল ছোকরা। মুখ দিয়ে গড়াতে গড়াতে মাটিতে পড়তে লাগল ফেনা।

ভয়াবহ মুহূর্ত কয়েকটা। সকলেই নিস্তব্ধ। কালো কালো বোতলগুলোর উপর আগুনের শিখার আভা নাচছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সাহেবরা। তিন ঘণ্টা হয়েছে মাত্র। সেই মেয়েটা কখনোই পালাতে পারে না বেশি দূর। নিশ্চয় কাছাকাছি আছে।

মেয়েটি ধরা পড়ল ভোরবেলা। যমুনার ঘাটে খেয়ামাঝিকে টাকা কবুল করে তাড়াতাড়ি নৌকো ছাড়তে বলছিল সে। ভয়ার্ত চাহনি। এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। সঙ্গে কোনো জিনিসপত্র নেই। একরাতে দশ মাইল পথ এসেছে কেমন করে কে জানে। নিশ্চয় প্রাণের ভয়ে।

শিখ সিপাহিদের ওপর হুকুম ছিল এতটুকু যেন ক্ষতি না করা হয়। ধরে নিয়ে যাবার হুকুম ছিল শুধু।

মেয়েটি একবার তাকাল সামনের দিকে। যমুনার ওপারে অনেক দূরে রয়েছে ভারতীয় ছাউনি। একবার যদি পেরিয়ে যাওয়া যেত। বিস্তীর্ণ চড়া। জলের ওপর জমে রয়েছে নীল কুয়াশা। নৌকোর ছাউনিতে, পাড়ের ঘাসে গাছের পাতায় শিশির জমে রয়েছে। তরল আঁধারের মধ্যে সাদা কুয়াশা কোনো স্বপ্নরাজ্যের বিভ্রম রচনা করেছে। প্রশান্ত সুন্দর পরিবেশ।

দৃপ্ত ভাবেই তাকাল মেয়েটি। শিখ দু'জনকে উচ্চ গলায় বলল—মাঝিকে কিছু বোলো না। ওর কোনো দোষ নেই। ও আমাকে চেনে না। ঘাঘরার

প্রান্ত দুই হাতে একটু উঁচু করে ধরে স্বল্প জলে ছপছপ করে সে পাড়ের দিকে এল। পাড় দিয়ে উঠতে উঠতে ঝকঝকে দাঁতে ঝিলিক দিয়ে হাসল একটু। বলল—একটা মেয়েকে ধরতে এসেছে এতগুলো মরদ!

রূঢ় ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে তুলে নিল একজন। বলল—বন্ধ কর্, তোর দিল্‌-লাগি দেখতে কে চায়?

যখন তাকে ধরে আনা হল ক্যাম্পে, ধুলোমাখা ক্ষতবিক্ষত পা, হাতদুটো মুচড়ে পেছনে নিয়ে বাঁধা, এলোমেলো চুল। সাহেবদের মুখে কথা ফুটল না। তার দিকে তাকিয়ে অজ্ঞাতসারেই কোনো কোনো অনভিজ্ঞ সৈনিকের চোখে তারিফ ফুটে উঠল। হ্যাঁ, সাহস রাখে বটে। কিন্তু কেন? কেন এই নিষ্ঠুরতা। সুগঠিত শরীর, যৌবনের আশীর্বাদে লাবণ্যধন্য তনু এই মেয়ের মধ্যে কেন হিংসা আসে? কেন বর্বরের মতো হত্যার আদিম প্রবৃত্তি জাগে? রহস্যময় প্রাচ্য! দুর্জ্ঞেয় হিন্দুস্থান আর তার মানুষ!

তখনই সমাপ্ত হতে পারত বিচার, কিন্তু কোনোমতে যদি দলটার সন্ধান পাওয়া যায়, আর কে কে আছে যদি ধরা পড়ে? এই সব কথা বিবেচনা করলেন সবাই। তবে যা করবার তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। ক্যাম্প গুটিয়ে কানপুর ফিরবার তাড়া আছে। প্রত্যেকটি দিনের দাম আছে। সময় অযথা নষ্ট করা সম্ভব নয়।

জেরা শুরু হতে প্রকাশ পেল মেয়েটির অনমনীয় অবাধ্যতা। কেউ তার সঙ্গে ছিল না। মদ-চোলাইয়ের কোনো কারবার কাছাকাছি নেই। এ লুঠের মাল। পলায়নপর ভারতীয় ফৌজের গাড়ি থেকে সে পেয়েছিল। বিষ? সে নিজেই বানিয়েছে। কিছু কিনেছে, কিছু তৈরি করেছে। কেন?

—সঙ্গে বিষ না রাখলে কোন্ ভরসায় তোমাদের ছাউনিতে আসব?

গালাগালি করল সাহেব। বেলা বাড়ছে। রোদ চড়ছে আকাশে। সবাই তাঁবুতে বসে আছে। মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর সামনে রোদে। সকলের নজরবন্দী। নিজেকে একটা জানোয়ার মনে হচ্ছে তার। এতগুলো লোক, সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি তার উপরে।

—কিছু বলবে?

—শেষ করো সাহেব, জলদি করো।

—জরুর। এত জলদি করব যে সিধে পাঠিয়ে দেব জাহান্নামে। বলো, কেন বিষ এনেছিলে?

—শুনবে সাহেব ?

সওয়ালরত বিচারককে কী বললেন একজন।—এটা নাটক করবার সময় নয়। তাড়াতাড়ি শেষ করো।

—শেখাতে এসো না আমাকে—বিচারক চটে গেলেন—বলো…বলো…

—সাহেব, সত্যি কথা…কালকের গান গাওয়া গলা আজ ধুলো ও তৃষ্ণায় চিরে চিরে যাচ্ছে। মেয়েটি বলল—সাহেব, তোমরা বেইমানি করেছ।

—জবান্ রুখ্! সাহেবের অবমাননায় উত্তেজিত এক বৃদ্ধ শিখ চেঁচিয়ে বলল। মেয়েটি তার দিকে চেয়ে হাসল। বলল—সাহেব কোনোদিন যদি তালাশ করে জানতে পারো তো জানবে, কানপুরের বুড়ো শেরিডানের বিবি আমাকে কতকগুলো জিনিস দিয়েছিল ভালোবেসে। তাকে লুঠের মাল ব'লে জাহির করল সাহেব, শেরিডানের ভাতিজা।

স্তম্ভিত এভারেট এগিয়ে এল। তার দিকে চোখ তুলে মেয়েটা বলল—আমার বুড়ো দাদা আর আমার স্বামীকে ফাঁসিতে লটকে দিলে তোমরা। ফাঁসে মরল বলে তাদের চৌথাক্রিয়া কিছু হল না। বলো—বিবিঘরের খুনের জন্য কতজনকে মেরেছ তোমরা ?

এই জবানবন্দির জবাবে চোখে চোখে লেখা হয়ে যায় বিচার। উঠে দাঁড়ায় সবাই। গলা ভেঙে যায় তবু বলে চম্পা—আফশোস যে তোমাদের কারো জান নিতে পারলাম না।…

—চুপ করো, চুপ করো, **stop her mouth.**

—তোমাদের শাপ দিচ্ছি আমি…এর বিচার হবে…বিচার হবে—নয় তো মিথ্যে হয়ে যাবে জমানা।

ধাক্কা দিতে থাকে দুজন সিপাহী। বিস্রস্ত চুল বাতাসে উড়ে ঝাপটায় চোখে মুখে কপালে। প্রত্যেকের মুখ কিছুক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখে সমস্ত জমায়েতটার প্রতি থুথু ফেলে চম্পা বলে—সব বে-হিম্মত, কাপুরুষ।

মাঝরাতে পরিত্যক্ত গ্রামের পথ খুঁজে খুঁজে এল কয়েকজন সওয়ার। সকালে যেখানে তাঁবুর খুঁটি ছিল, সেখানে কাড়াকাড়ি করছিল শেয়াল। মানুষ দেখে পালিয়ে গেল শবদেহ ছেড়ে।

গভীর গর্ত খুড়ে নীরবে চম্পার দেহ সমাধিস্থ করল তারা। কাঁটা ঝোপ এনে ঢেকে দিল মাটি। একজন বলল—শেষ পর্যন্তও কিছু ফাঁস করেনি চম্পা। কপালে হাত ছুঁইয়ে সম্মান জানাল আর সবাই। তারপর পার হয়ে ওপারে

## পরম আত্মীয়

অফিস ঘরের কলগুঞ্জন কানে আসছে। টাইপ-রাইটার কাজ করে চলেছে খটাখট-খটাখট—খটাখট! ফ্যান ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। ক্লাইভ বিল্ডিংয়ে এই অফিসটা নতুন নেওয়া হয়েছে।

ড্যানিশ ফার্মটা উঠে গেল মিশন রো-এ। তার ফলেই সম্ভব হল এই জায়গা পাওয়া। এই যাওয়া আসার মাঝখানে যে-টাকাটা হাত বদল হল তার অঙ্কটা মনে করতেও ভয় হয় আমার। এত টাকা পৃথিবীতে আছে? অথচ কী সহজেই টাকাটার কথা বলেছিলেন অবিনাশবাবু আমার বোনের বিয়েতে। কাকিমার সেজ জামাইবাবু অবিনাশ মুখোটিকে নিয়ে যে রকম সরগরম পড়েছিল,—তাঁর কাছে বর আর বরপক্ষ তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। উনিশ হাজার টাকার গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেবার হাতে চারটি টাকা গুঁজে দিয়ে এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ খেয়ে আবার গাড়িতে উঠতে যেটুকু সময় লেগেছিল তার মধ্যেই অবিনাশবাবু সেই আশ্চর্য অঙ্কটার কথা শুনিয়ে বলেছিলেন—

—এত করে তবে অফিসটা পেলাম!

অত টাকা শুধু পাটিগণিতে-ই থাকে জানি। রাম অতি স্বচ্ছন্দে শ্যামকে সেই টাকা ধার দেয় আবার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ জুড়ে সেই টাকা গিয়ে ওঠে যদুর ঘরে। আমাদের সম্মিলিত ক্ষমতায় তিন হাজার টাকা ধার করে টেলারিং পাশ ছেলের সঙ্গে রেবার বিয়ে দিচ্ছি। অবিনাশ বাবু আমাদের সেদিন বিভ্রান্ত করে রেখে গিয়েছিলেন।

নতুন অফিসের রিসেপ্‌শন রুমের সবটুকু সবুজ। পালিশ ছাড়া স্বাভাবিক রঙের দামি ফার্নিচার সমুদ্র-সবুজ কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে আছে। সবুজ প্লাস্টিকের পর্দায় মনোরম, ম্যাগাজিন-বিক্ষিপ্ত সুন্দর ঘর। দশটা থেকে বসে আছি। এখন বাজল তিনটে। এর মধ্যে একবার মাত্র খেতে বেরোলেন উনি। একবার দেখা করলেন একটি ছোকরা সাহেবের সঙ্গে। এখন কী করছেন ভাবতে চেষ্টা করি। বিলিতি ম্যাগাজিনের মলাটের লোভনীয় খাবার-গুলোর ছবি থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। কারা খায় ও সব খাবার? উনি কী করছেন? হয় চিঠি লিখছেন, নয় চেয়ে আছেন টাইপিস্ট মেয়েটির দিকে।

ছিপছিপে সুন্দর বাঙালি মেয়েটি। পাঞ্জাবি স্টেনো মেয়েটির সঙ্গে খুটখুটে জুতোয় শব্দ তুলে যাওয়া-আসা করে দেখেছি। সম্ভবত তারই সঙ্গে কথা বলছেন অবিনাশবাবু। বাবু কী করছেন, ঐ বেয়ারাটাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছে থাকলেও জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। সেটা দস্তুর নয়। বে-দস্তুর কিছু আমি করতে পারি না। তাতে অফিসে মাথা হেঁট হবে কাকিমার সেজ জামাইবাবুর। আমি যে ওঁর আত্মীয়, সে কথা অবিশ্যি কেউ জানে না। তারা জানে আমি উমেদার মাত্র। সেই কত লাখ কত হাজারের একজন, যাদের নাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে লেখানো থাকে আর বারবার ঝালাই হয়। সকালে কী খেয়ে বেরিয়েছি? ভুলে গিয়েছি। ক্ষিদেয় পেট জ্বালা করছে। অবিনাশ বাবুর বাড়িতে কতো রকম অ্যালার্জির কথা শুনি। জয়ামাসির না কি মাছ দেখলেই অ্যালার্জি হয়। একটু সিদ্ধমাংস আর একটু সাদা সস্—কেমন করে যেন উচ্চারণ করেন জয়ামাসি? ভাবতে গিয়েও কষ্ট হল। মাংস আর সস্—সস্ আর মাংস—।

কিন্তু এমনি করেই কষ্ট করতে হয়। তাহলে বড়ো হওয়া যায় জীবনে। হওয়া যায় অবিনাশ মুখোটি।

চারটে বেজে সাতাশ মিনিটে বেরুলেন উনি। আমি শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াই। বললেন -

—আরে? মণি যে? কতক্ষণ?

—আজ্ঞে, এই দশটা থেকে—!

—তাই না কি? টু ব্যাড্—দুষ্টু মেয়ে আমাকে খবর দেয়নি।

দুষ্টু মেয়ে মানে রিসেপ্শনিস্ট ভায়োলেট দত্ত। চুলের পোনিটেইল নাচিয়ে সুন্দর করে হাসল। অবিনাশ বাবু তাড়া দিলেন আমাকে—

—চলো চলো মণি, বেরিয়ে পড়ি। গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে বললেন—

—মোকাম্বো।

ঢুকলাম মোকাম্বো তে।

তারপর বললেন—বেচারা, বারের লাইসেন্স পাচ্ছে না কিছুতে! ভাবতে পারো?

মোকাম্বোর চারপাশে তাকিয়ে মালিকের দুঃখে দুঃখী হবার সাহস হল না। উনি বললেন—

—কিছু আলু ভাজা দিতে বলো। আর চিজ-স্টিক। ককির সঙ্গে সর্বদা

হালকা কিছু খাবে জানলে? কী যে গ্রাম্যতা আমাদের। কাকে মানেই চপ কাটলেট, মোগলাই পরোটা।

নামগুলো শুনেছি। খাইনি কখনো। ছোট ভাইয়ের জুতোর মধ্যে পা দুটো টন্‌টন্‌ করছে। বিগলিত বিনয়ে কফিতে চুমুক দিই। অবিনাশ মেসো বলেন—

—মণি, প্রেমে পড়েছ কখনো? —জবাব জোগাল না মুখে। কান লাল হয়ে গেল। সবেমাত্র ধার-কর্জ করে আই-কম পাশ করেছি। বয়েস হয়ে গিয়েছে তেইশ। উনি ভরসা দিয়ে হাসলেন। বললেন—

—তুমি জানো না মণি। তোমাদের সঙ্গে এ সব কথা কইতে আমার কী রকম লাগে। মনে হয় যদি তোমাদের বয়সটা ফিরে পেতাম। একদিন—একঘণ্টার জন্যে—আহ্‌!

বলে চট্‌ করে নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন উনি। চারিদিকের নানারকম খাবারের গন্ধে আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। উনি কিন্তু তদ্‌গত হয়ে কাচের টেবিলে ফুলদানির ফুলের ছায়া দেখতে লাগলেন। ডুব দিয়ে যেন মুক্তো পেলেন এমনি ধারা হেসে বললেন—

—আমার চেহারা দেখে তুমি বুঝবে না মণি— কিন্তু বিশ্বাস করো, ঢাকার নাম করা মেয়ে শীলা সেন একদিন এই আমাকেই দেখে……!

তাঁর কৈশোর প্রেমের আখ্যানটি শেষ হলো রাত সাড়ে আটটায়। শেষ দেড়ঘণ্টা বসতে হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে। সেখানে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চট্‌করে উনি উঠে পড়লেন। ন-টায় না কি মেট্রোতে জয়ামাসি অপেক্ষা করবেন। বাসে চড়ে বাসায় ফিরতে রাত সোয়া ন-টা বাজল। ফিরে তারপর রাস্তার কলের জলে সাবান দিয়ে সার্ট কাচলাম। প্যান্ট ভাঁজ করে তোষকের নিচে রাখলাম। জুতোয় কালি লাগালাম। উদ্যমেই লক্ষ্মী লাভ। কাল সকালে আবার দেখা করতে হবে ওঁর সঙ্গে।

অবিনাশ মেসো আমাদের পরিবারের একটি আদর্শ। আজ নয় আমাদের এই অবস্থা। সেই সাতচল্লিশের আগে, যখন ঢাকায় আমার শৈশব কেটেছে, তখনো তাঁর নাম শুনেছি আমরা। তখন ক্রিমিনাল ওকালতি করে বাবা পাঁচ ছয়শো টাকা রোজগার করতেন। দাদা মেজদা কলেজে পড়তেন। পুজোতে নতুন কাপড়ের গাঁঠরি বেঁধে আমরা যেতাম স্টিমারে। আমার পৈতের সময় মা নতুন চুড়ি পরে এক দালান মানুষকে পরিবেশন করছেন, সে ছবিটা আমার

আজও মনে পড়ে। তখন অবিনাশমেসোর নাম করা হত অন্য সুরে। এখন সেই মা-র মুখের দিকে চাওয়া যায় না। দাদা স্টেট্‌বাসে জয়েন করেছেন। মেজদা আর তাঁর বন্ধু মিলে যা করেন, বাবা অবশ্য তাকে বলেন ব্যাবসা। আমরা সবাই জানি মেজদা শ্যামবাজারের দিকে রাস্তায় বসে গেঞ্জি বেচেন। রাত বাড়লে ধূপকাঠি—এক আনা করে! দু-আনা করে! এখন অবিনাশমেসোর নাম করা হয় অন্যভাবে। মানুষের জীবনের সমস্ত সার্থকতার মূর্ত প্রতীক যেন অবিনাশমেসো। তিনি আছেন বলে ভরসা আছে। স্বাবলম্বিতার মহৎ উদাহরণ। পরিশ্রমই যে সার্থকতার সোপান, তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন অবিনাশ মুখোটি।

ছোটো বেলা ভোরে উঠতেন। নিজের জামা নিজে কাচতেন। সাবান মাখেননি। বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। নিজের সব কিছুই নিজে করেছেন। মায় চাকুরিটি জোগাড় করা পর্যন্ত। সে চাকুরিতে চল্লিশ টাকা মাইনের ছুঁচ হয়ে ঢুকে, কোম্পানির একজন ডিরেক্টর অর্থাৎ ফাল হয়ে বেরিয়েছেন। সম্পূর্ণ নিজের কৃতিত্বে আজ তাঁর আলিপুরে বাড়ি, ক্লাইভ বিল্ডিংয়ে অফিস। গ্যারেজে স্টুডিবেকার, লা-মার্টি'নিয়েরে ছেলে-মেয়ে। আমরা চিরকাল শুনে আসছি মানুষ হতে হয় অবিনাশের মতন।

সেই মতোই চেষ্টা করছি। আগে উনি বলেছিলেন, মণিকে আমার অফিসেই নেবো। হালচাল শিখুক। ঘোরাঘুরি করুক। বাবাকে বলেছিলেন —আমি মার্টি'ন সায়েবের ওখানে স্রেফ চল্লিশটাকায় ঘসেছি কতোদিন! ভাই-বোনকে পড়াতাম, খোলার ঘরে থাকতাম, আপনি তো জানেন।

মহাজনের আচরিত পন্থাই তো ধরতে হবে। এক ঠিকে ঝি-এর ভরসায় উনিশজনের সংসার। জামা-প্যাণ্ট সাবান দিয়ে কেচে কেচে পোক্ত হলাম। নিজের খরচ টিউশনি করে নিজেই চালাই। জামা-প্যাণ্ট করিয়ে নিই। জুতো কিনি। তখন রেবার বিয়েতে এসে উনি বললেন—শুধু নিজের কথাই ভেবো না মণি। দুনিয়াতে এসেছ, পরের কথাও ভেবো। তুমি তো একা নও, মা, বাবা, ভাই, বোন। কার্নেগির জীবনী পড়েছ? রকফেলারের কথা জানো? ব্রিটিশ কাউন্সিলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করতে পারো না? —মাথা যেন কাটা গেল। এমন কথা তো উনিই বলতে পারেন। উনি কি সোজা মানুষ? এতখানি স্বার্থপরতা নিয়ে চলাফেরা করছি আমি? বিয়ের খাটা-খাটুনিতে পায়ের তলাটা খসে পড়ছে ব্যথায়। একহাতে জলের বালতি,

আর একহাতে কুমড়োর ছক্কার থালা ধরে আমি লজ্জায় মরে গেলাম। তখন উনি হাসলেন। এমন সুন্দর হাসি ওঁর! বললেন—

—মুষড়ে পড়লে তো? পাগল, পাগল তুমি মণি—এসো, যোগাযোগ রেখো। কাজের খোঁজ পেলেই দেব। জানো তো কী রকম কম্পিটিশান?

আসা-যাওয়া করছি আজ ছয়মাস ধরে। উত্তমে ভাঁটা পড়লে চলবে না। বাবা, মা, দাদা, মেজদা আমার দিকে খাবার সময়ে এমন করে তাকান যে আমার গায়ে বেঁধে। স্পষ্ট বুঝি, তাঁরা আমাকেই দোষ দিচ্ছেন পদে-পদে। অবিনাশমেসোর সঙ্গে আমার এত আলাপ। সকাল দশটা থেকে রাত ন'টা অবধি তাঁর সঙ্গেই কাটাই। তবু যে কিছু হচ্ছে না—সে জন্যে আমিই দায়ী। নিশ্চয় আমি পারছি না। হেরে যাচ্ছি। তাঁদের নীরব অভিযোগ হাজারটা শলা হয়ে আমাকে বেঁধে! সকাল বেলা মরিয়া হয়ে উঠি। মনকে বলি, আর নয়, আজ যা হয় একটা করবই।

সামনে গেলেই ভাষা হারায়। সেই চমৎকার হাসি! বলেন—

—মণি! তোমার জয়ামাসি ফোন করেছেন, বিকেলে চা খেতে বলেছেন কাদের। কেক চাই, আইসক্রীম-সন্দেশ, ফুল! যাও তো ভাই! এই তো চাই। গুড বয়!

রজনীগন্ধা, কেক আর সন্দেশের পেছনে দুপুর-ভোর ঘুরি। তাঁরই তিরিশটাকা পকেটে নিয়ে। তবু এক কাপ চা-এ শুকনো গলা ভিজিয়ে নিতে ভরসা হয় না। হলেই বা ছয়পয়সা বা দু'আনা! অসদাচরণ করা কি সম্ভব? অনেক পুরুষের উত্তরাধিকার আমাকে শাসন করে। পেটে খিদে চুঁয়ে চুঁয়ে মরে। ফুল দেখে জয়ামাসির বোন মিনি সরু গলায় বিলাপ করে ওঠে। জয়া-মাসি বলেন—আমার টি-সেট্, টেবিলের ম্যাটিং সবই যে হলদে রঙের। লক্ষীটি মণি, কিছু সূর্যমুখী আনো। ভ্যান গগের ছবিটার রিপ্রোডাকশনটার সঙ্গে এমন মানাবে।

আবার ছুটি নিউমার্কেটে। সূর্যমুখী আসে। অভ্যাগতরা আসেন। পেটকাটা জামা আর সোচ্চার যৌবনের ওপর পাতলা নাইলনের আঁচল ঝুলিয়ে মিনি চা ঢালে। আমি প্যান্ট্রিতে বসে চা কেক খেয়ে চলে আসি।

কোনোদিন উনি বলেন—চলো, দেখাই তোমাকে রাতের কলকাতা।

ধর্মতলা অঞ্চলের চোরা গলিতে গেলাম ওঁর সাথে। কর্মবীর অবিনাশ

মুখোটি আশ্চর্য নৈপুণ্যে হাউসি খেলে চারশো একচল্লিশ টাকা জিতলেন। বেরিয়ে এসে বললেন—

—তোমার পয়ে জিতলাম মণি। বলো কী চাও? চকোলেট খাবে? আচ্ছা চলো।

লোয়ার সার্কুলার রোডের চীনে রেস্তোঁরায় বসে প্রন্-ফ্রায়েড রাইস্ আর ফাউল খেতে খেতে আমার দিকে চেয়ে দুষ্টু হাসতে লাগলেন অবিনাশমেসো। বললেন—

—এখন থেকে আর তো ছাড়ছি না তোমায়। খুব লাকি তুমি!

কী জানি কেন, সেই মুহূর্তে-ই বললাম—আপনি আমাকে যা হয় একটা জুটিয়ে দিন মেসোমশায়। আমি কেনা হয়ে থাকব আপনার কাছে! বাড়ির অবস্থা জানেন তো?

উনি আহত হলেন—কী আশ্চর্য মণি, এই কথা তুমি বলছ আমায়? তুমি? আমি কি তোমার জন্য ভাবছি না? তোমরা অমনিই মণি, মানুষ এমনিই হয়। ভালবাসতে গেলে আঘাতই পেতে হয়! কেন সেবার আই. এস. সি. পড়তে বলিনি আমি? বলিনি, সায়েন্স ছাড়া ভবিষ্যৎ নেই? রেলওয়ে ওয়ার্কশপে হাতুড়ি ঠুকতে হলেও চাই আই. এস্-সি.; বলিনি?

আমারই দোষ! ওঁর কি দোষ থাকতে পারে? পাঁচবছর আগে তো উনি সত্যিই বলেছিলেন আই. এস্-সি. পড়তে। সে কথা না ভেবে চিন্তে হঠাৎ আমার বড়দার টি. বি. হল সে তো ওঁর দোষ নয়!

বাড়ি ফিরতে ফিরতে নিজেকেই ধিক্কার দিলাম। আজ অবিনাশমেসোর ওপর বিশ্বাস কমছে আমার? অবিনাশমেসোর আন্তরিকতায় সন্দেহ আসছে? শত শত ধিক!

আমার আত্মানুশোচনা দেখে উনি আমাকে ক্ষমা করলেন। আবার ঘনিষ্ঠ হতে দিলেন আমাকে। মিনির জন্যে এল. মল্লিক থেকে রঙ মিলিয়ে উল আনা, জয়ামাসির চিঠি বরানগরে পৌঁছে দিয়ে আসা, জয়ামাসির পিয়ানো-টিচার ললিতা সিন্‌হার আর ওঁর জন্যে সিনেমার টিকিট কেনা, এই সব কাজের ভার আবার দিলেন আমাকে। অর্থাৎ ওঁর জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেলাম এমনি করে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে কত দিনে কত কথাই যে শোনালেন। একদিন বাড়িতে বাগানে বেতের আসবাব ছিটিয়ে বসে এলসেশিয়ান কুকুরটাকে বল ছুঁড়ে দিতে দিতে বললেন—

—টেক্‌নিক্যাল কিছু না জানলে…এই দিনকাল! আচ্ছা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এই পরীক্ষাটা দেবার কথা ভাবছ? কী আশ্চর্য, ভুলেই যাই তুমি গ্র্যাজুয়েট নও! দেখ জয়া!

ঘাড় ফিরিয়ে শুনতে গিয়ে জয়ামাসির আঁচল বুক ছেড়ে মাটিতে লুটিয়ে গেল। অবিনাশমেসো একটুকরো কেক কুকুরটাকে দিয়ে বললেন—

—জয়া, গ্র্যাজুয়েট হওয়াটা যে কতো তুচ্ছ, এই মণিকে দেখলেই আমার মনে হয়! চব্বিশ বছর বয়েস আর মাথা উঁচু করে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা! কী যে ভালো লাগে ভাবলে!

কোনোদিন বললেন—

—এত শয়ে শয়ে প্ল্যান হচ্ছে, কলকাতার আশপাশ তো কলোনিতে ছেয়ে গেল। জমি নিয়ে চাষ করো না? কলকাতার কাছাকাছি কয়েক বিঘা জমির কিছু ধান, কিছু মুরগী—একখানা ঘর তুলে স্বাধীন ভাবে বাস করা। আর কিছু চায় না কি মানুষ? আমি তোমায় বলে দিচ্ছি মণি, এ সমস্যা আজ পশ্চিমেও উঠছে। টেলিভিশান আর স্কাইস্ক্রেপার দেখে দেখে আবার চাইছে মাটির স্পর্শ।

কোনোদিন বললেন—

—নেভিতে চলে যাও না! ট্রেনিং নিয়ে এসো। আর কিছু করো আর না-ই করো, শরীরটা তো বানাতে পারবে? স্বাস্থ্য থাকলে আর কী লাগে? কাগজ বেচেও তো দিন যায়।

এমনি করে এগারো মাস হাজিরা দিলাম। জুতো জোড়া ছিঁড়ে গিয়েছে। শার্ট দুটো সেলাই করেও আর টেঁকে না। সাবান কেচে যে স্বাবলম্বী হব সে পথ রাম-রাবণ একজোটে ঘায়েল করেছে। পুরোনো সার্টে সাবান ঘষা সইবে না। মেজদার ব্যাবসা বন্ধ। আমার তৃতীয় টিউশনিটার টাকাও সংসারেই লাগে। মাঝখান থেকে চা, চিনি, সাবান এগুলো বিলাসিতার পর্যায়ে চলে গিয়েছে। বাবার মেজাজ আরো চড়া। কিন্তু অবিনাশ মুখোটির সঙ্গে আমার পরিচয় আজও কোনো পরিণতিতে এল না।

আঁধার আকাশে তুবড়ির মতো একটা খবর সহসা দীপ্যমান হয়ে উঠল। চাকরি! দাদা যাদবপুর ডিপো থেকে হন্তদন্ত হয়ে এলেন। বললেন—

—অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক নেবে অবিনাশবাবু। একশো দশ মাইনে। তুই আর দেরি করিসনে মণি, দরখাস্তটা ঠুকে দে, এবার তোর হবেই।

অবিনাশবাবুর সম্মান আমাদের বাড়িতে এতখানি যে, সবাই ধরে নিল এবার চাকরিটা আমার হয়ে গেল। আর কোনো মতেই বিগড়ে যাবে না। অবিনাশবাবু কথা দিয়েছেন নিজ-মুখে।

দরখাস্ত পেশ করে দিলাম। তারপর থেকে দিনগুলো কাটতে লাগল এমন ভাবে। প্রত্যেকটি মুহূর্তও যেন আমার প্রতীক্ষায় ভারী হতে হতে যন্ত্রণায় ফেটে পড়বার মত হল। দিন কাটে তো রাত কাটে না। ডাক পিওনের আশায় চেয়ে চেয়ে চোখ ক্লান্ত। খবর আর আসে না।

দশদিন বাদে উনি ডাকলেন। গেলাম অবিনাশবাবুর অফিসে। চাকরিটা আমার হলই, এই আশ্বাস নিজের মন থেকে নিজেই গ্রহণ করে বলীয়ান হয়ে উঠলেন দাদা। আমাকে একটা সাদা সার্ট আর খাকি প্যাণ্ট কিনে দিলেন বিশ টাকা খরচ করে। অপ্রতিভ হেসে বললেন—এখন থেকে তো লাগবেই তোর।

মেজদার বন্ধু অনাদিদা বাটায় কাজ করে। তার মারফতে সস্তায় বাটার জুতো কিনে আনলেন মেজদা।

দাদার কেনা জামা আর মেজদার কেনা জুতো। পরে যখন বেরুলাম, মনে হল সমস্ত পরিবারটার আশাভরসা নিয়ে চলেছি আমি।

আমাকে ঢুকতে দেখে বেয়ারাটা অবধি হাসলো। হাসবেই তো। ওরাই তো খবর আগে পায়। কাল থেকে আমাকেই সেলাম ঠুকবে ও। কেরানি আর টাইপিস্ট, সকলেই এমনি ধারা সম্মান পেয়ে থাকে। এ হল কমার্শিয়াল ফার্মের বৈশিষ্ট্য। এ তো সরকারি অফিস নয়। সেখানে শ্রীক্ষেত্র। সম্মান শুধু গ্রহ-বিগ্রহের। অন্যদের বেলা সাম্যনীতি।

টাইপিস্ট মেয়েটি একতাড়া কাগজ হাতে বেরোয়। পাশের ঘরে যায়। আমি আজ দুঃসাহসী। তার দিকে চেয়েও একটু হাসি। আমার চব্বিশ বছরের বুকে হঠাৎ যেন একটা উত্তাপ অনুভব করি। বেশ লাগে। রক্তটা কেমন ঝিমিয়ে ছিল এতদিন। এখন কেমন তাজা হয়ে উঠেছে। নইলে এতদিনে একবারও কি ভাবতে সাহস করেছি মেয়েটি কত সুন্দর।

রুমালে হাত ঘষতে ঘষতে হাসতে হাসতে বেরোন অবিনাশবাবু। চটপট ভাবে, তাড়াহুড়ো করে। সুইং ডোরটা ধাক্কায় পেছনে সরে যায়। গানের মতো বলেন—

—চলো, চলো, চলো।

ঝড়ের বেগে আমায় উড়িয়ে নিয়ে আসেন ব্রড্‌ওয়ে-তে। বলেন—

তোমার ও সর্দি লেগেছে, দিনটাও চমৎকার। আজ সমস্ত নিয়মই অমান্য করা চলে।

ছোট্ট গেলাসে প্রায় বর্ণহীন টলটলে পানীয়। সামনে তাঁর গেলাসটা নিয়ে একটু ঠুকে দেন। হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই খেয়ে ফেলি। আবার ভরে দেন গেলাসটা। আমার মাথা কেমন মেতে ওঠে। উনি নীচু হয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বলেন—

—মণি, আমার অফিসের কাজটা তোমার হল না।···মানে একটু ভালো লোক পেলাম, ঐ তোমার মতো আই• কম-ই···তবে তোমার জয়ামাসির কথা ···যা হোক মণি···কিছু ভেব না···একটা কিছু আমি করে দেবোই তোমাকে···

চেয়ে থাকতে থাকতেই আমি গেলাসটা খালি করে ফেলেছি। উনিও খাচ্ছেন। সমস্ত স্বপ্নের মতো অবাস্তব। ওঁর কথাগুলো অসম্ভব জোরে আমার মগজে পিটতে থাকে। উনি বলেন—আমি যখন আছি তোমার ভয় কী? অ্যাঁ? বলি ভয়টা কী?

বলে ঝুঁকে পড়েন। জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন—এইতো আসছ! চল্লিশ টাকার মদ খাচ্ছ। উনিশ হাজারের গাড়িতে চড়ছ···একশো দশটাকার চাকরি? ছো ছো মণি···ও চাকরিতে তোমার হবে কী?

—মানে?

—মানে পরিষ্কার। যতদিন পারো ভোগ করো জীবনটাকে। মেয়েদের পেছনেই ঘোরো। তোমার বয়স থাকলে আমি···

আমার মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। খুব সাফ দেখি সব। দেখি রং ফর্সা, মোটা, আকাট মূর্খ একটা লোক পুরু লাল ঠোঁট জিব দিয়ে চাটছে আর কী বলছে। উঠে দাঁড়াই। আমার চেয়ে মাথায় এক হাত লম্বা অবিনাশ মুখোটিকে মনে হয় আমার চেয়ে অনেক ছোটো। একটা বে-পরোয়া সাহস আসে। দাঁড়িয়ে মনে হয় অনেক ওপর থেকে দেখছি আমি অবিনাশ মুখোটিকে। মনে হয় আমার সামনে বসে গবগবিয়ে মদ খাচ্ছে যে-লোকটা তার মতো কুৎসিত করুণার পাত্র আর দেখিনি। বলি—

—চুপ! আর একটা কথাও নয়!

—অ্যাঁ?

—তোমার ধাপ্পাবাজি আমি অনেক শুনেছি···তুমি একটি আস্ত বদমায়েশ··· মনিবের পা-চাটা চরিত্রহীন উল্লুক—তোমাকে আমি এই এমনি করে—

বলে গায়ের জোরে একটা চড় মারি। কাঁচের গেলাস বোতল একটা ঝট্‌কায় ফেলে দিই তাঁর মুখে। ফলাফল কী হল না দেখেই বেরিয়ে আসি নবাবের মতো।

এ হলো কালকের কথা। আজ সকালে ঘুম ভেঙে মাথা ব্যথা করছে। ভাবতে পারছি না কী করে অমন ধারা ব্যবহার করেছি কাকিমার সেজ জামাই-বাবুর সঙ্গে। এ কাজ না হোক অন্য কাজ, কেরানি না হোক চাপরাশির কাজ, এ বছর না হোক অন্য বছর, একটা-না-একটা জুটিয়ে দিতেন তিনি আমাকে। ওঁর মতো সদাশয়, কৃতী কর্মবীর কি ফেলতেন আমাকে? টিঁকে থাকলেই আখেরের ব্যবস্থা করতেন।

টিঁকতে আমি পারলাম না। নিঃসন্দেহে আমারই দোষ। তবু তো বসে থাকলে চলবে না। এবার ধরব বৌদির সেজো পিসেমশাইকে।

নতুন উদ্যমে জুতোয় কালি ঘষতে লাগলাম।

# চিন্তা

মেদিনীপুর জেলার দাঁতন ও কণ্টাই-এর সমীপস্থ অঞ্চল থেকে বছর বছর একদল নরনারী কলকাতায় আসে।

শুধু জান নয়, ভাতের নিরাপত্তাও মেদিনীপুরেরই দেওয়া উচিত। কিন্তু দাঁতন, ঘাটাল বা কাঁথি সে-প্রতিশ্রুতি কোনোবারই রাখতে পারে না। তাই, হয় বর্ষার মুখে, নয় শীতের ফসল তুলে দিয়ে এরা এসে পড়ে। একেবারে মাঠ-খামারের গন্ধ বেরোয় চেহারা থেকে। অনন্ত, উৎসব, চৈতন্য, অক্রুর এইসব সাউ-প্রধান-মহান্তিরা প্রথমে কর্পোরেশনের ফিটার-প্লাম্বার দাদাদের কাছে ঘোরে। কেউ কেউ সোজা এসে আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে অন্যান্য-দেশ-মুখো অনন্ত বা কৈলাসের বদলি স্বরূপ রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। এক সময় খাল-বিল জলা-জমি দশটাকা কাঠা হিসাবে কিনেছিলেন যাঁরা, সেই সব হিসেবি ঘোষ-বোস-সরকার-চাটুজ্যেদের অধস্তন বংশধরদের কারো কারো আজও রাঁধুনে বামুন রাখবার ক্ষমতা আছে। পিতৃপুরুষের রেখে যাওয়া বাস করবার মতো একখানা-দুখানা বাড়ি, ক্যানিং-এ খেনো জমি—এর কল্যাণে মোটা ভাত আর কুচো-ট্যাংরার গামলা ভাসানো ঝোলের প্রতিশ্রুতি আজও আছে। সেই প্রতিশ্রুতিই এইসব তথাকথিত একান্নবর্তী পরিবারের বনিয়াদ। এ সব পরিবারের ভাত-ঝোলটা একসঙ্গে চলে। এদিকে ঘরে ঘরে আলাদা মিটসেফে স্বামীর রোজগার-মাফিক চার পয়সার দানাদার থেকে চারটাকা সেরের আপেল পর্যন্ত হাজিরা দেয়। এমনিধারা বাড়িতেই ঢোকে এইসব রাঁধুনে বামুন। ঐ ভাতটা নামায়, ঝোলটা বসায়, ঝাল দিয়ে মাছ রেঁধেও খাওয়ায় সন্তান সম্ভাবিতা ননদদের কখনো। নিজেরা গিন্নির সঙ্গে পান-সুপুরি, সোডা-সাবানের পাওনা নিয়ে ঝগড়া করে। দুপুরে গাড়িবারান্দায় দেশের লোকগুলোর ওপর মুরুব্বিয়ানা চালায়।

তাদের মেয়েরা ঘর ভাড়া নিয়ে চাক বাঁধে। লোকের বাড়ি-বাড়ি কাজ নেয় - তোলাকাজ, দিনরাতের কাজ।

এদের মধ্যেই আমি চিন্তাকে প্রথম দেখি। মাথায় খাটো, রং ফরসা, হাতে রুপোর বালা, গলায় উল্কি দিয়ে হার আঁকা। একটা ছোটো মেয়েকে

কোমরে দড়ি বেঁধে বসিয়ে রেখে সে কাজ করছিল আমারই পাশের বাড়ি। গিন্নির ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার আছে। দুবছরের রোগা মেয়েটা মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরবে ঘরে-দোরে—সে তাঁর অসহ্য। চোখে দেখে প্রথমটা আমার গাও জ্বলে গিয়েছিল। একেবারে রোগা একটা মেয়ে। বসে আছে গাড়ি-বারান্দার ধুলোর ওপর। রোগে ভুগে চেহারাটা জ্ঞানবৃদ্ধের মতো। বড়ো বড়ো চোখদুটোতে কোনো কৌতূহল নেই। অনেক ক্লান্তি, ক্ষমা আর ধৈর্য নিয়ে সে বসে আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো কাছেই দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। একটা পাশব কৌতূহল আর দুর্বলকে খোঁচাবার একটা নিষ্ঠুর তাগিদে তাদের ছোটো ছোটো মুখগুলো কীরকম যেন হয়ে উঠেছে। তাদেরও দোষ দিতে পারি না। বহুদিন ধরে বাড়িভাড়ার টাকাটাই শুধু জমার ঘরে পড়ছে। স্নেহ-মমতা সুকুমার বৃত্তির ঘর বহুদিন দেউলে হয়েছে। এক সঙ্গে থাকবার অভিশাপ এই, যে কতকগুলি মানুষ পরস্পরকে চূড়ান্ত ঘৃণা করে। বড়োদের স্নেহহীন সম্পর্কের দায় বহন করে ছোটো ছেলেমেয়েরা। মরা সম্পর্কের শব বহন করে বেড়ে ওঠে বলে শৈশবেই তারা বুড়িয়ে যায়।

চিন্তার বাচ্চা মেয়েটাকে দেখে আর ছেলেমেয়েগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখে মনে একটা আঘাত লাগল। নিজের দেউলে স্বরূপ এমন নগ্ন করে আর কখনো দেখিনি। লজ্জা পেলাম বলেই নিষ্ঠুর হয়ে উঠলাম। দৈন্য ঢাকবার এমন পন্থা তো নেই। তাই বললাম—বেঁধে রেখেছ কেন? ওর লাগছে না?

—কাজ করিব। বলে চিন্তা জন্তুর মতো প্রতিবাদহীন দৃষ্টিতে তাকাল। পাঁজা-পাঁজা বাসন মাজল, তাল-তাল বাটনা বাটল। বেলা দুপুরে দেখলাম মেয়েটাকে কোলে নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। ভেজা কাপড়ে বেহারি পানওয়ালার অশ্লীল দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিন্তা আস্তে আস্তে যখন যাচ্ছে তখন দেখে বোঝা গেল কোলের আধমরা বাচ্চাটার দোসর হবার জন্যে আর একজন আসছে। পরে না বলে পারিনি—ঘরে কেউ নেই তোমার? মেয়েটাকে রেখে আসতে পারো না?

—মোর কেউ নাই।

ওর কেউ নেই। এই মেয়েটা আর অনাগতটির ভার বহন করে ওকেই বাসার কাজ ধরে চলতে ও চালাতে হবে। এই কথাটা ওর সমস্ত জীবনযাত্রাটা দিয়ে বেরোয়—ও যখন পৌষের হাড়কাঁপানো শীতে ভোরে চান করে ময়লা কাপড় পরে কাজে হাত দেয়, বেলা দশটায় দুটি বাসি ভাত গাড়ি-বারান্দায়

মেয়ের কাছে বসে খায়, অথবা মাসান্তে আটটাকা মাইনের জন্যে দশদিন হাঁটে। ওর অবস্থা নিঃসহায় দেখেই মাইনেটা জোরগলায় বারো টাকার রেট থেকে আটে নামিয়েছেন গিন্নি। সব অবস্থাতেই ওকে প্রতিবাদহীন জন্তুর মতো সহনশীল আর নীরব দেখি। সে-টাকা থেকেও কাটা যায়। ও বলে—মা ফাইন করিল। কখনো বলে—কাপড়ালুগা দিল না। ওর অবস্থা দেখে আমার নিজের লজ্জা করে। মধ্যবিত্ত বিবেককে ঘুষ দিই ওকে পুরোনো কাপড় দিয়ে, অথবা মেয়েটার হাতে এটা-সেটা দিয়ে। রাত বারোটায় কাজ সেরে ঘরে ফিরতে—মদ না খেয়ে ঠাণ্ডা মাথায়ই পানওয়ালাটা ওকে জাপ্‌টাতে গিয়ে কাপড়খানা ছিঁড়ে দিয়ে চটচটে হেসে চেঁচিয়ে গান ধরে। সকালে মেয়েটার হাত থেকে রুটিবিস্কুট বাড়িওয়ালার বৌয়ের নথ পরানো কাকটা ছিনিয়ে নেয়। বাচ্চাটার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে, সে অসহায়, এ সত্যটা কাকটা খুব জানে। এমনি করে বিবেককে জোড়াতালি মারবার চেষ্টাটা আমার মিছে হয়ে যায় - জোড়াতালি সংসারে চলে না।

এর মধ্যেই এল চিন্তার আর-একটা মেয়ে। চিন্তার দলের অন্যান্য ঝি-রা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে। তাদের কাছেই খবর মিলল। ইদানিং আটটাকার কাজটাও ছিল না। ঝিদের জটলা থেকে উদ্ধার করা গেল যে চিন্তার খুবই দুর্দিন চলেছে। হাতের খাড়ু বাঁধা পড়েছে দশটাকায়। আরো দেখলাম ঝিরা চিন্তাকে বাসন-বাঁধা নিয়ে টাকা ধার দিতে চাইছে। তারা বলল - ভালো কাঁসা-পিতলের যা বাটি-গেলাস আছে, তা তো ছাড়াতে পারবে না চিন্তা। বুঝলাম, লাভ করবার এও একটা সুযোগ।

ক-দিন বাদে আবার দেখি দুর্বলতায় কাঁপতে কাঁপতে কাজে বেরিয়েছে। বলে—বড়োটাকে ছোটোটার কাছে রেখে এলাম গো, মা। গরিব কি একভাবে মরে? —গরিব যে নানা ভাবে মরে, এ কথা বোঝবার জন্যে আমি চিন্তার কাছে যাব কেন? নিজেকে সাধারণ মানুষের দরদি মনে করবার একটা আত্মপ্রসাদ আছে। প্রায়শ তার অবস্থিতি অবচেতনে নয়। সম্ভবত তার তাগিদেই আমি ওর ফুটো কপালে জোড়াতালি লাগাবার চেষ্টা করি। কোনো ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার না করে, পরের উপকার করে পরোপকারী নাম কেনবার বাসনাটাও বোধহয় আমার শ্রেণীগতভাবে পাওয়া আর-একটা উত্তরাধিকার। সে উত্তরাধিকারের স্বরূপও পলা-পচা। তাই আমার ছেঁড়া জামা, পুরোনো কাপড়, বাসি রুটি অথবা বাড়তি কমলালেবুর আস্তরে চিন্তার ফাটা কপাল এতটুকু জোড়ে না। তেল-চিট্‌চিটে দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের ছবিতে ফুটো

ঢাকার মতোই অর্থহীন হয়ে যায়। চিন্তা অবশ্য সময় পেলে দুটো কথা বলে যায়। বলে—কারো দোষ নাই। মু পাতকী।

কোন পাপের কথা সে বলে জানি না। ব্যাখ্যা করবার উৎসাহও তার নেই। এ দিকে দিন কাটে। আমার গলিটা দিয়ে যে জীবন প্রবাহ-চলে তাই দেখতে দেখতে রায়দের পাঁচিলটার ফাটলটা বাড়তে থাকে। এ পাঁচিলটা বারোয়ারি ঘুঁটে দেবার জন্যে। পাড়ার বনেদি বুড়ো একজন চাকর দিয়ে হামলা করিয়ে ঘুঁটে ছাড়িয়ে আনেন। তাই নিয়ে লখিয়ার মা বাড়ির সামনে কুৎসিত কলহ করে যায়। এদিকে নিরুদ্বেগ প্রসন্নতায় কাঠ-চাঁপার গাছটা বারোমাস ফুল ফোটায়। সে ফুলের যে-কটা ঝরে পড়ে তাই স্পর্শ বাঁচিয়ে তুলে নিয়ে যান নিত্যবাবুর পিসি শিবপুজোর জন্যে। মানুষের অর্থহীন আচরণ দেখে গাছটার উপরের ডাল-পালাগুলো সোনারোদ মাখামাখি করে হেসে আকুল হয়। সকলে সে হাসি শোনে না, এই যা। এরই মধ্যে দেখি চিন্তার শরীরে মাংস লেগেছে। শহরের গাছপালাগুলোর মতো দুর্বার খিদেয় সে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে কেমন করে প্রাণরস আহরণ করেছে। স্বাস্থ্য ফিরেছে। গলার উলকিটা এখন ভালোই দেখায়। সে দিন দেখলাম নতুন কাপড় পরেছে। বলল—মা দিয়েছে। মাইনেও দশে প্রোমোশন পেয়েছে।

সেদিন সকালে খুব হৈ-চৈ পাড়ায়। চিন্তাকে কেন্দ্র করে বলেই মনে হল। সে এক অভিনব দৃশ্য। ফুটপাথের মাঝখানে নতমুখে দাঁড়িয়ে চিন্তা। ওদিকে দেশ থেকে সদ্য আগত দুজন পুরুষমানুষ একটা ঝুঁটিবাঁধা বছর-বারোর ছেলের নড়া ধরে চেঁচিয়ে কী বলছে। ন্যায় এবং ধর্ম যে তাদের পক্ষে এ বুঝতে অসুবিধে হল না। একজনের রং ফরসা, মুখে পান, চুলে সিঁথি—চেঁচাচ্ছে সেই বেশি। চেঁচিয়ে বলছে—তুই পাতকী করিবি তো, দাম দিবি না? চিন্তার দেশের মানুষরা তাকেই সমর্থন করছে। চিন্তার মুখে কোনো কথা নেই। সে শুধু বলছে—মোক ক্ষমতা নাই। মু অপারগ। ছোটো ছেলেটাকে বার-বারই ধরতে যাচ্ছে। তাকে ঝটকা মেরে পুরুষ-দুজন সরিয়ে নিচ্ছে।

দুপুরে চিন্তা এল দরবার করতে। বলল—মোকে গোটে টাকা ধার দিন। মু শোধ করিব।

না জেনে না চিনে টাকা ধার দেব, আবার সে টাকা ফেরত পাব, এত ভরসা নেই। তবু গোড়াতেই 'না' বলি না। ঘটনাটা জেনে নেবার সুযোগ একটা, হাজার হলেও। কৌতূহলে কি আমরা কারও চেয়ে কম?

উবু্ হয়ে বসে চিন্তা। কথা বলতে বলতে নাকের পাটিটা ফুলে ফুলে ওঠে। নাক ঝেড়ে আর চোখ মুছে নেয়। কথার মাঝখানে সম্ রেখে বা বার বলে—মু মহাপাতকী। মু হতভাগী।

চিন্তার কথাগুলোতে যে-সব কথা জানি তা আমার কানে নতুন ঠেকে চিন্তা বলে—যখন বিধবা হলাম, তখন আমার ঐ এক ছেলে গোপাল আমার চারবিঘা জমি গো মা। দুইখানা টিনের ঘর, ছাগল দুটো, গা একটা। আমার দুধের বাল্য ছেলে ও, চাষকাজের কী জানে গো মা, আমি আমার পাড়ার মানুষদের পায়ে ধরলাম। মামাশ্বশুর আদি আত্মমানুষরা বলে কী গো মা—তুই নাবালক বিধবা, জমি আমাদের জমা করে দে। আমি রাজি হলাম না। আত্মীয়রা রুখে উঠল। বড়ো অশান্তি। এদিকে মোক কাঁচ বয়স—সন্ধেবেলা মানুষ আমার আঙিনায় হাঁটতে লাগল। আমি গোপালকে নিয়ে দরজা গড়া দিয়ে রাখি আর ভগবানকে ডাকি। বড় দুঃখের দিন।

বলে আর অল্প-অল্প কাঁদে চিন্তা। এমনি সময় কলকাতা থেকে গেল উৎসব। উৎসবের চেহারা ভালো। সে যে কত প্রতিশ্রুতি দিল চিন্তাকে প্রথমে চিন্তায় মন টলেনি। দরজায় আগল দিয়ে বসে থাকত। তখন উৎসব গোপালকে হাত করল। তাকে মিঠাই কিনে দেয়। ভালো কথা বলে। দেখে দেখে চিন্তার মন নরম হল। এইখানে কাহিনী থামিয়ে চিন্তা বলল—যৌবন বড় দুষ্ট গো মা, শরীরের জ্বালা—মু পাতকী হলাম।

তখন দশজন রুখে উঠল। বড় ভয় চিন্তার। দশজনকে ভয়, ছেলেকে ভয়, উৎসবের হাতে পান-সুপারি দিতে ভয়—ভরসা দিল শুধু উৎসব। বলল, তার কোনো দুষ্টচিন্তা নেই। চিন্তাকে সে বিয়ে করবে। কানে কাঁটি, গলায় পলাকাটি, হাতে নতুন খাড়ু দেবে। প্রথমে দশজন অনেক কথা বলবে। তাই গোপালকে রেখে তারা কলকাতা যাবে। কলকাতায় বিয়ে করবে। ফিরে আসবে দেশে। ঘরে পুরুষ না থাকলে চিন্তার সংসার চলবে কী করে? চিন্তা বলে—বাহা বসিবে যখন নিশ্চয় বলিল, তখন আমি স্বীকার গেলাম গো মা। মু এমন পাতকী। তারপর উৎসব তাকে কলকাতা নিয়ে এল। দশজন চুরি করে নেবে বলে কাঁসা-পিতলের থালা-বাসন যা ছিল বেঁধে আনল চিন্তা। তারপর যা হল তা যে কতকালের পুরোনো কথা সে চিন্তা জানে না। তাই বার বার বলল—আমার সর্বনাশ করে পরধান পলাইল। না আমাকে বাহা

করল, না কোনো গহনা দিল, মারিল ধরিল, টাকাগুলা নিল, তারপর এই দুটা বাচ্চা দিয়া পলাইল।

আজ সে ফিরে যেতে পারে না?—বলতে, চিন্তা বলে—আমার নিজের জমিতে ধান, পুকুরে ল্যাটা বেলে জাওল গজাড় মাছ—আমার কোন্ দুঃখ?

তবু যায় না কেন? —সেখানেই গলদ। এখন তার পাতকীর জন্যে তাকে দুশো টাকা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গাঁয়ের দশজনকে ভাত-পিঠা খাওয়াতে হবে। তা ছাড়া এই মেয়ে-দুটোকে ত্যাগ করতে হবে। এত পরীক্ষা দিলে তবে তার সমাজ নেবে চিন্তাকে। —আমি কোথা থেকে টাকা পাব গো মা। টাকাও পাব না তাই দেশেও যাব না।

আজ যারা এসেছে তারা তার দেশের মুরুব্বি। তার মামাশ্বশুর আর মামাতো দেওর। এতদিন ধরে ছেলেকে দেখেছে তারা। এখন এই ছেলের বিয়ের সময় হয়েছে। আর কত দায়িত্ব টানবে তারা? মেয়ে দুটোর ব্যবস্থা করে দেশে চলুক চিন্তা। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা তবে জ্ঞাতিরা দেখবে। আমি বলি—তুমি তোমার ছেলে নিয়ে এখানে থাক না কেন? ছেলে কাজ করুক, তুমি কাজ কর। চলে যাবে।

মাথা নাড়ে চিন্তা। একে সে পাতকী। তাতে দশজনকে না মানলে তাকে কেউ মরলে কাঁধ দেবে না। ছেলেকে ত্যাগ করবে। সে চূড়ান্ত সর্বনাশের কথা কি ভাবতে পারে চিন্তা? পরলোক যে এর চেয়ে অন্ধকার হতে পারে না তা চিন্তাকে বোঝাবে কে? সে শুধু বলে—মেয়ে দুটোকে কী করিব? আমার গিরি-গৌরীকে কি করিব?

দুটো টাকা ধার নিয়ে উঠে যায় চিন্তা। দই-মিষ্টি-মুড়কি এনে তার মামাশ্বশুরকে খাওয়াবে। চিন্তার হাতে ভাত তারা খাবে না। যার কেউ নেই তার ভগবান আছে—এ কথা বলে যায় বটে চিন্তা, কিন্তু তার আপাত সমস্যার জট ছাড়াবে কোন্ ভগবান আমি ভেবে পাই না।

মিষ্টি-মুড়কি খেয়ে চিন্তার ইহলোকের কাণ্ডারীরা বাপব্যাটায় আমারই রকের ছায়ায় ঘুমোতে আসে। চিন্তার ছেলেটাও দেখি পান খেয়ে তাস খেলতে বসল বামুনদের সঙ্গে।

সমস্যার সমাধান ভগবান নয়, মানুষই করে। বিংশ শতাব্দীতে আমাদের চেনা রাস্তাগুলোর আশেপাশে অনেক কিছু চলে, যা পাপ। এবং তার বয়সও অনেক। চিন্তার ঘরে শুধুই বৈঠক বসে। দশজনে যুক্তি-পরামর্শ দেয়।

টাকা ধার করে দশজনকে পান চা খাইয়ে মরে চিন্তা। ধূর্ত হেসে পানওয়ালাটা অশ্লীলভাবে ঘনিষ্ঠ হতে চায় চিন্তার সঙ্গে। চিন্তা যে একান্তভাবেই নিঃসম্বল তা বুঝে তার মুখে পানের পিকের থুথুটা উথ্‌লে উথ্‌লে ওঠে। দুর্বার শরীর যৌবনের অভিশাপ নিয়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলে চিন্তা। পানওয়ালা আর চা-ওয়ালার দোকানে হেঁটে মরে। পানওয়ালার পয়সা আছে। বোকা এবং পাপের ভয়ে ভীত না হলে নিঃসন্দেহে চিন্তা এ সময়ে গুছিয়ে নিতে পারত। রিক্সাওয়ালাদের মধ্যে কেউ কেউ মজা পায়। থেকে-থেকেই চেঁচিয়ে গান করে ওঠে।

পরদিন আমার ঝি টিউবওয়েলে জল ধরতে গিয়ে খবর আনে। কোমরের গুঁতোয় কলসি থেকে জল ফেলতে ফেলতে আসে উত্তেজনায়। বলে—এমন পাপী মেয়েটা! বাচ্চা দুটোকে বিলিয়ে দিল? একটা জগুবাবুর বাজারের ওপারে—কীরকম মায়ের প্রাণ? ছি ছি ছি! চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ঝি-চাকররা নিজেদের যে কতখানি ন্যায়ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত বোধ করছে তা বেশ বোঝা যায়।

বিলিয়ে তো দিল। কিন্তু নিল কে? গিরি-গৌরীর ছালওঠা মুরগীর ছানার মতো চেহারার কথা মনে করি আর ঐ একটা প্রশ্নই মনে হয়। এত দয়া কার?

বিকেলে ইভ্‌নিং-ওয়াকে বেরিয়ে পাড়ার গার্জেনবুড়ো হনহন করে হেঁটে এসে পাশ ধরেন। বোঝা যায় কিছু একটা বলবার চাপা কৌতূহলে মুখচোখ তাঁর জ্বলজ্বল করছে। বলেন—শুনেছেন ব্যাপার? কিসের মধ্যে যে বাস করি!

এঁর মতো কৃতী ও বহুদর্শী লোককে এত মজা দিল কিসে, জানবার কৌতূহল আমার কম। কিন্তু তাঁর বলবার আগ্রহ দুর্দমনীয়। বলেন—কাল রাত্তে সে যা ব্যাপার! যাকে বলে কেচ্ছা। ঐ চিন্তা মেয়েটা, তার ব্যাপার সব জানেনই বোধ হয়—

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করেন না। বলেন—তার দুটো জ্ঞাতি না কে, কাল এসে বলে কিনা দশ, আট, আঠারো টাকায় দু-জায়গায় দুটো মেয়েকে বেচেছে। আমাকে সই করতে বলে। আমি তো ভাগিয়ে দিলুম। ব্যাপার দেখেছেন? এসব নেয় কারা তা জানেন তো? নিলে ঐ দালালগুলো—তাদের বড়ো ব্যাবসা এ সবের···তা আমি বলি—যা করেছ করেছ—এখান থেকে যদি না যাও তো পুলিশে খবর দিয়ে···তা সে পো-দৌড় দিলে পুলিশের নাম শুনে!

বলে তিনি সিরিয়াস হয়ে ওঠেন। বলেন—দেখেছেন আমাদের অবস্থা? আপনাদের কোনো চাড নেই—পাড়া-বেসিসে যদি আপনারা সব সোশ্যাল-ওয়ার্ক করেন। বলে হনহন করে হাঁটতে থাকেন কাস্টম্স-এর ভদ্রলোককে লক্ষ করে। ঘটনাটার মজা ও রগড়ের দিকটা তাঁকে সুড়সুড়ি দিয়েছে।

সকালে চিন্তা বিদায় নিতে আসে। এবার আর একা নয়। দুপাশে তার মুরুব্বিরা তার পোঁটলাটা নিয়ে চলেছে। ছেলেটাও যাচ্ছে টিনের স্যুটকেস হাতে। চিন্তার পরনে নতুন কাপড়, গায়ে জামা দেখি। কোন্ টাকায় কেনা, জিজ্ঞাসা করি না। ভয় হয়। বিদায় নিতে এসে চিন্তা আর কাঁদে না। একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটলে পরে, যা নাকি তার ধারণার বাইরে, মানুষ যেমন হতভম্ব ও হতবাক হয়ে থাকে—চিন্তার মুখও তেমনই। মাঝে মাঝে পশুর মতো তাকায়। বোধ হয় দেখে, আমিও ওকে দোষী মনে করছি কিনা।

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে চিন্তা। বলে—তুমি বড় ভালো লোক গো মা।

তার পরেই চলে যেতে পারত, কিন্তু হঠাৎ চলে যায় না চিন্তা। জানলা দিয়ে ভুরু কুঁচকে যেদিকে দেখে—তাকে আকাশ নয়, অনির্দেশ কোনো দিশা বলা চলে। এখন চোখে পড়ে চিন্তার চোখদুটো কালো, জোড়া ভুরুর মাঝেও উলকির টিপ আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে সেই চোখে জল আসে—নাক টানে চিন্তা—গরিবের ভগবান নাই গো, মা—গরিবের ভগবান নাই।

তার সঙ্গী দুটোর চোখে ধূর্তামি উঁকি দেয়। গলাটা মোলায়েম করে ছোকরাটা বলে—ওদিকে বাস পাবেনি গো।…চিন্তার ছেলেটা দেখি বুড়োটার সঙ্গে কথা কাটছে—বাস, ট্রেন, জলখাই দশটাকার মামলা—আমার টাকা-তিনের জামা কেনে কিনিলি?

—হব, হব—বলে ভরসা দেয় বুড়োটা। অর্থাৎ সেই আঠারো টাকা থেকেই হবে।

যার ভগবান নাই, তার কেউ নাই—এই শেষ কথা বলে চলে যায় চিন্তা। রাস্তাটা পেরোয়। দু পাশে দুটো লোক চলে। ছেলেটা বুড়োটার হাত ধরে চলে। এবার তার বিয়ে হবে। কন্যাপক্ষ যে টাকা দেবে, তার থেকেই প্রায়শ্চিত্ত, বা এ-টাকার থেকে ও-টাকা মিলেঝুলে জোড়া-তালি দিয়ে যা-হয় একটা হয়ে যাবে চিন্তার কপালে—এই নিয়ে চিন্তা ছাড়া আর তিনজন আলোচনা করে। চিন্তা আস্তে আস্তে হাঁটে। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে রাস্তা পেরোয়। প্রায় দৌড়ে ওই ফুটে ওঠে। তার পর আর তাকে দেখি না।

## ছায়াবাজি

মাঝরাতে দরজায় ঘা পড়ল। মধ্য প্রদেশের যে জায়গাটায় এসেছি সেখানে চেনা মানুষ নেই। স্টেশানের কাছে একটি ছোটো বাড়ি নিয়ে আছি। হাওয়া বদলের জন্যে এসে জায়গাটাকে ভালোবেসে ফেললাম। পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার একটি শিল্প-কেন্দ্রের উপান্ত অঞ্চল। অনতিদূরে, শহরের সব সুবিধেই অপেক্ষমাণ। এই নির্জনতায় স্বেচ্ছাকৃত আত্মনির্বাসনের পেছনে আছে শুধু একটু শান্তিতে থাকবার কামনা।

কেউ চেনে না জানে না। তাই আমার নাম ধরে ডাক শুনে অবাক হলাম। আধিভৌতিক কিছু নয়। কেন না বিপন্ন কণ্ঠে ডাকছে একজন। পেছনে সাত আটজন দাঁড়িয়ে।

দরজা খুলতে যে ঢুকল তাকে দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বিজয়ের ভাই কুমুদ। চুল উসকোখুসকো। বিভ্রান্ত, আতঙ্কিত চেহারা। দুবছর আগে শেষ দেখেছি তাকে ডালহৌসিতে। বিকেল পাঁচটার জনারণ্যে। কোথা থেকে ঠিকানা জানল কুমুদ, কী ব্যাপার—কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল কুমুদ। বলল—

—শীগ্‌গির স্টেশানে চলো বাদলদা, দাদা স্যুইসাইড করেছে।

স্যুইসাইড করেছে বিজয়? আমার কোনো প্রশ্নকে মুখর হতে দিল না কুমুদ। বলল—

—সব পরে শুনবে বাদলদা। এখন চলো।

গেলাম। ছোট্ট স্টেশান। এই সময় বম্বে-মেল পাস করে আর ফোরটিন-আপ স্লো করে মোশান। তাই চড়া আলোটা জ্বলেছে। সেই আলোর নিচে স্টেশান মাস্টার আর কয়জন কুলি দাঁড়িয়ে আছে। প্লাটফর্মে শুয়ে আছে বিজয়। ছয় ফিট তিন ইঞ্চি চমৎকার শরীরটা, যা নিয়ে বিজয় চিরদিন মাথা উঁচু করে চলে-ফিরে বেড়িয়েছে—আজ সেই দেহটাই অসহায় ভঙ্গিতে পড়ে আছে দেখে মনে ধাক্কা লাগল। কাঁচাপাকা চুল ভরা মাথাটা বিশ্রী একটা কোণ সৃষ্টি করে হেলে আছে। একখানা হাত কপালে ঢাকা দেওয়া। সেই হাতের আঙুলের মধ্যে এমন অসহায় কিছু একটা দেখলাম আমি, একটা মিনতির ভাব, অথবা

পরাজয়ের ভঙ্গি,—যা বিজয়ের সারাজীবনের বহু আশাভঙ্গের প্রতীক। দেখে পা কাঁপতে লাগল আমার। স্টেশন মাস্টারের বিবেচনা আছে। কম্বল ঢাকা দিয়ে রেখেছেন বাকিটুকু।

এমন রাত যেন কারো জীবনে না আসে। থানাপুলিশ ডাক্তারের হাঙ্গামা মিটিয়ে ছোটো ঝরনার ধারে নিয়ে বিজয়কে দাহ করবার ব্যবস্থা করতে পরদিনের সন্ধে গড়াল। কুমুদকে সান্ত্বনা দেবার ভার নিয়েছিল আমার স্ত্রী। তিনদিন বাদে কলকাতায় ফেরবার সময় হলে তাকে গাড়িতে তুলে দেবার কাজটুকুও আমিই সারলাম। অনেক দুঃখের মধ্যেও মনে হল কুমুদ যেন মুক্তি পেল এমনি একটা ভাব। গাড়ি ছাড়বার আগে করুণ হেসে কুমুদ বলল,

—কী জানো বাদলদা, শেষ অবধি দাদাও বেঁচে গেল। ও জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষে······

একটা মানুষ কেমন করে যে মুছে যায় পৃথিবী থেকে, ভাবলে অবাক লাগে। হয়তো জীবনের নিয়মই এই। অপ্রয়োজনীয় যা, তাকে নির্মম হয়েই পরিহার করতে হবে। তাই বিজয়ের মৃত্যুতে এতটুকু নাড়াচাড়া পড়ল না। পরিচিতজন মুখে বিস্ময় আর সহানুভূতি জানালেন। কোনো শোকসভা হল না, হৈ চৈ পড়ল না। কাগজে কালো লাইন টেনে কোনো সংবাদ জানানো হল না। দুর্ঘটনা শীর্ষক সংবাদ বেরুল—'ট্রেন হইতে লাফাইয়া জনৈক বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির······'

নিজেকে ছাড়িয়ে চাঁদসূর্যও চোখে দেখত না বিজয়। সে জানত এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তারই জন্যে। চমকপ্রদ মৃত্যু বরণ করে দুনিয়াটাকে চমকে দেবার একটা ইচ্ছে তার অন্তরের অন্তস্তলে খেলা করেছিল না কি সেই সময় তাও জানি না। সে দুনিয়াকে ছাড়বার অনেক আগেই দুনিয়া তাকে ছেড়েছিল। তাই কোনো ছাপই রেখে যেতে পারল না বিজয়। বাতাসের মুখে ছেঁড়া কাগজের মতোই বাতিল হয়ে গেল।

বিজয়ের ট্র্যাজেডি কিন্তু শুরু হয়েছিল সুদূর কৈশোরে। গরিব বাপের মেধাবী ছেলে বিজয়। ছোটো ভাইবোনদের বঞ্চিত করে সরটুকু, ঘি-টুকু বিজয়কে খাওয়াতেন মা। দুনিয়াটাই যে তার জন্য, এ ধারণার অঙ্কুরও সেদিনই তার মনে সৃষ্ট হয়। বিজয় ভালো জামা-কাপড় পরত, ভালো স্কুলে

পড়ত। গরিব বলে পরিচয় দিয়ে ফ্রি-শিপ অথবা বইপত্রের সাহায্য নিতে বাধত তার।

পনেরো বছর বয়সেই মাথায় সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা হল বিজয়। সব দিক থেকে তারিফ করবার মতো চেহারা। ইন্‌স্পেক্টর এলে তাকেই কবিতা বলবার জন্যে ঠেলে দেওয়া হয়। প্রাইজ দিতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট-গিন্নি তার সঙ্গেই কথা বলেন। বিসর্জন নাটকে সেই সাজে রাজা।

নিজের সম্পর্কে বিজয়ের আস্তে আস্তে উচ্চ ধারণা হল। সে প্রিয় ছিল তার মিষ্টি স্বভাবের জন্য। এখন তার মধ্যে এল উন্নাসিকতা। ব্যবহারে এল দম্ভ এবং তাচ্ছিল্য। মাস্টাররা তার এই পরিবর্তন দেখে তার সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হলেন। বিজয়ের বাবাকে যাঁরা জানতেন তাঁরা গোপালবাবুর ভবিষ্যৎ ভেবে দুঃখিত হলেন। যার ছেলে বাপের দুঃখ বোঝে না, সে বাপের জীবনে আর কী রইল!

আমরা প্রথমটা হাসাহাসি শুরু করলাম। ক্লাসে যেখানে নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার পাঠ্য, বিজয় সেখানে আই-এর ইতিহাস বই নিয়ে ক্লাসে বসে থাকে। মাস্টাররা পাঠ্য বিষয়ে জবাব চেয়ে পান না। অথচ যখন-তখন সে এমন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করে, যার জবাব তাঁদের মুখেও জোগায় না। ক্লাস টেন-এর ছেলে পাঠ্য বই না পড়ে এলিয়ট নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছে, এ প্রশ্ন তাঁদের মনে স্বতই উদিত হয়।

ছেলেরা তাকে চালিয়াৎ ডাকতে শুরু করল। আমি, প্রণব, অনাদি, অরুণ, দিলীপ—আমরা সত্যিই বিশ্বাস করেছি বিজয়কে। বিশ্বাস করেছি সে এতবড় একটা প্রতিভা, যা এদেশে দুর্লভ। সমসাময়িক কালে যে প্রতিভার সমাদর হয় না, সে সম্পর্কে বিজয়ই স্বদেশ-বিদেশের অনেক মানুষের উপমা টেনে এনে বুঝিয়েছে আমাদের।

আমাদের মর্মাহত করে বিজয় টেস্টে খারাপ রেজাল্ট করল। তার বাবা রাগারাগি করলেন। মা কাঁদলেন। তার পরেও বাবা পরীক্ষার ফি জোগাড়ের চেষ্টায় বেরুলেন। আমাদের বিজয় বললে,

—টেস্টটা দেখে ঘাবড়াস না। দেখিস—ফাইনালে টেনে বেরিয়ে যাবো।

কিন্তু যত সামান্য হোক, ম্যাট্রিক একটা পরীক্ষা। তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। বিজয়ের গগনবিহারী মন সুতো গুটিয়ে এসে আকবর, শেরশাহ, আর অস্ট্রেলিয়ার কৃষিসম্পদ নিয়ে ভাবতে চাইল না। পাটিগণিতে গজ ফুট

মেপে তেলমাখানো লাঠিতে যে-বাঁদরটা উঠছে আর নামছে তার গতিবিধি সম্পর্কে আগ্রহটা জাগাতে পারল না। ফলে দ্বিতীয় বিভাগে মোটামুটি পাশ করল বিজয়। রাতারাতি চলে এল কলকাতা।

কলকাতায় কলেজ-জীবন শেষ হতে না হতে বিজয়ের ধারণা হল সে সবরকমে অসাধারণ। কোন্ দিক দিয়ে স্ফুরিত হবে তার প্রতিভা? আমরা বারবার জানতে চেয়েছি। প্রণব বলেছে,

—একটা এমন কিছু কর বিজয়, যাতে—!

স্বল্প হেসে চুপ করেছে বিজয়। সবাইকে পেছনে রেখে এগিয়ে যাবে, চমকপ্রদ কিছু করবে সে, এই তার পণ। জীবন নিয়ে এ রকম পণ ফেলতে কেউ জোর করেনি তাকে। নিজের সঙ্গে নিজেই বাজি ফেলল বিজয়। ফলে তার অবস্থা দাঁড়াল কোনো হতভাগ্য রেসের ঘোড়ার মতো। রেস তার সারা জীবনেও শেষ হয়নি। এ রেসের আদি ছিল। কিন্তু বিজয়ের মৃত্যু পর্যন্ত তার অন্ত ছিল না।

সাধারণ ছেলে আমরা। সাধারণ রুচি আমাদের। কলেজে আমরা অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে সিনেমা দেখেছি। খেলাধুলা করেছি, মেয়েদের পেছনে লেগেছি, আবার ছাত্র আন্দোলন নিয়ে গলা ফাটিয়ে মাইকে বক্তৃতা দিয়ে ইউনিভার্সিটির দেয়ালে পোস্টার সেঁটেছি।

আমাদের মধ্যে পাব বিজয়কে? ইংরেজির ছাত্র বিজয়। কিন্তু সবিতা রায় দুষ্টুমি করে জানিয়ে গেল—ফিলজফির ছাত্র-ছাত্রীরা রেফারেন্সের বই পায় না। বিজয় সব বই নিয়ে বসে আছে।

প্রোফেসর লেকচারাররা বিজয়কে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। ছেলেরা যা বলল, তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা উপহাসাস্পদ হলাম। মেয়েদের মনে স্বতঃই জাগল কৌতূহল।

নরমসরম সুশ্রী একটি লাজুক মেয়ে। মাধবী নাম তার। বিজয়ের সমস্ত উন্নাসিকতাকে সে প্রতিভার স্বাভাবিক রূপ মনে করল। তার শ্রদ্ধা গিয়ে দাঁড়াল অনুরাগে। কলেজ সোশ্যালে গান করে নাম করেছে অরুণ—অরুণ মজুমদার নাম করা গাইয়ে। অরুণ মাধবীকে সত্যিই ভালবেসেছিল। আমি বিজয়কে বললাম,

—তুমি তো কোনো খবরই রাখ না। এদিকে মর্তলোকে যে বিপ্লব বাধল। অরুণের কথা ভেবে দেখেছ? মাধবীর সম্বন্ধে ঠিক করো একটা কিছু!

অরুণের প্রশ্ন নয়। মাধবী যে তাকে ভালবাসতে সাহস করেছে তাতেই বিরক্ত হল বিজয়। তাদের বাড়ির ছাদের ঘরের নিচু ল্যাম্পটার আলোতে বিজয়কে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। ফর্সা রঙ। সুশ্রী চেহারা। রুক্ষ চুল। চওড়া কপাল। ছয়ফিট তিন ইঞ্চি শরীরটা নিয়ে বসে থাকলেও অনেক উঁচু দেখায়। তবু সেদিন বিজয়কে ভালো লাগল না আমার। মনে বিদ্রোহ জাগল। আবার বাল্যের বিশ্বস্ততাই জয়ী হল। মাধবীর জন্যে কষ্ট হল। একেই বোধ হয় বলে 'পতঙ্গের ব্যর্থ প্রেম নক্ষত্রের লাগি।' অরুণকে পরদিন বলে এলাম—নির্ভয়ে এগিয়ে যা।

অরুণ মাধবীকে কিছু বলেছিল কিনা জানি না। অরুণের যা স্বভাব, হয়তো বা গুটিয়েই নিল নিজেকে। বিজয় মাধবীর সম্পর্কে রূঢ়ভাবে উদাসীন হয়ে উঠল। মাধবীর মনোযোগে সে নিঃসন্দেহে খুশি হয়েছিল মনে মনে। তাই উপেক্ষাও করল দশজনকে জানিয়ে।

এই ত্রিভুজের সম্পর্কে ইউনিভারসিটি মুখর হল। অরুণ মাধবীকে ভালবাসে, মাধবী চায় বিজয়ের প্রেম আর বিজয় নিজেকে ছাড়া কারুকে চায় না। 'নার্সিসাস ও মাধবিকা' নামে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কবিতা লিখে ফেলল একজন।

শেষ অবধি দো-টানায় পড়ে অনেক ভেবে মাধবী উপযাচিকা হয়ে গেল বিজয়ের কাছে। বলল—বিজয়, আজ এ কথা আমার বলবার নয়—তবু আমিই বলছি!

অরুণের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব শুনে বিজয় জানাল তার কোনো আগ্রহই নেই। কলকাতায় রোজ অজস্র বিয়ে হয়। সে সব কিছু খোঁজ রাখতে যায় না। তবু মাধবী মরিয়া হয়ে আরো নিলাজ হল। বলল,

—তবুও ত সব কথা বলা হল না বিজয়! আমি তো' এ বিয়ে চাই না। তোমার কথা পেলে—বিজয় অত্যন্ত বিস্মিত হল। বলল,

—তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে এই মাত্র। তার বাইরে তোমার সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহই নেই। জানাল তার মতে মেয়েরা হচ্ছে শুধুই জন্মদানের এক একটি সামাজিক প্রয়োজন। তার বাইরে মেয়েদের সত্তা আছে? হাস্যকর কথা!

—ভগবান করুন বিজয়, এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিদান তুমি পাও।

বলে ছাইমুখ করে ছুটে বেরিয়ে গেল মাধবী।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুবার পর বিজয় দাসকে ঘিরে একটি উন্নাসিক ভক্তমণ্ডলী গড়ে উঠল। তাদেরই একজনের বালিগঞ্জের বাড়িতে কাচঘরে বসল তাদের 'সিলেক্ট'-এর অধিবেশন। মাসে মাসে সেখানে সন্ধে বেলা জমতে লাগল কিছু বাছাই করা নরনারী। সেই উন্নাসিক মণ্ডলীর পুরুষ-মেয়েরা বিজয় দাসদের নাম শুনে থাকে। সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না। মধ্যবিত্ত সেখানে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়নি।

বিজয়ের দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, অতি সহজে সবাইকে উপেক্ষা করবার অভ্যাস, এই সব দেখে ঝুঁকলেন বিবলি বোস, বুলা রায়, পিক্‌পিক্ সোম প্রমুখ বিবাহিতা অবিবাহিতা মহিলারা। তাঁরা যে স্তর থেকে এসেছেন, সেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবনখানা সুবৃহৎ রুপোর চামচের বুকে নিরাপত্তার আবাসে অটল। সেখানে ভালো নামে ডাকবার রেওয়াজ নেই। তাই বাংলার শিল্পপতিদের অন্যতম মান্যবর অমুককে এইখানে দেখে প্রখ্যাত ডাক্তারের বৌ পিক্‌পিক্ সোম সচ্ছন্দে রুমালের টোকা মেরে—বুবলু, তুমি কী দুষ্টু হয়েছ! বলে আঁকা ভুরু কাঁপালেন। স্বামী অজয় রায়ের গাড়ি, বাড়ি, সুদর্শন কান্তি দেখে দেখে ক্লান্ত লতিকা রায় বিজয়ের পাশে গিয়ে বললেন—মনের দোসর পেলাম না।

বিজয়ের সম্পর্কে বান্ধবী রুমা তালুকদারকে বললেন—এমন রুখা ভুখা ইন্টারেস্টিং চেহারা! আমি ওকে আমাকে বুলা বলেই ডাকতে বলেছি।

ঐশ্বর্যের আফিসে জীবনে বাঁচবার আনন্দ যাদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত, সেই সব মানুষ সহসা বিজয়কে দেখে উৎসাহিত হল। সকলেই বলল, —পেয়েছি একটা প্রতিভা।

আশ্চর্য কী, যে অর্থকুলীন সমাজের এই সব বত্রিশ পুতুলের মুখে স্তুতিবাদ শুনে বিজয়ের ধারণা হল সত্যিই সে অসাধারণ?

এই সময় মারা গেলেন বিজয়ের বাবা। বিধবা মা ছোটো ভাইবোনদের মুখ চেয়ে বিজয়কে বললেন—তুই একটা চাকরি দেখে নে। সংসার তো আর চলে না।

ছোটোভাই কুমুদ আর সুজয় বলল—দাদা, অরুণ সোম এতবড়ো একটা লোক, খাস বিলাতি কোম্পানির ডিরেক্টর! ওঁকে বললেই তোমাকে একটা বড় চাকরি দেবেন।

পিক্‌পিক্ সোমকে সে এখন ক্যামাক্ স্ট্রীটের বাড়িতে বসে চীনে ছবি দেখতে

শেখাচ্ছে। ঠিক আলোতে ছবিটি রেখে, তারা দুজন কোলে হাত রেখে চীনে ধূপের ধোঁয়ায় বসে থাকে। পিক্‌পিকের দেওর অরুণ। অরুণকে সে চাকরির কথা বলবে? ছিঃ!

সোমের বাগানে রঙিন ছাতার তলে বসে সাদা খরগোশকে কাজুবাদাম খাওয়াতে খাওয়াতে বিজয় পিক্‌পিকের কাছে মধ্যবিত্ত মাদের ট্র্যাজেডির কথা সুন্দর ভাষায় বলল। আমাকে ওরা কাজ করতে বলে। আমি কাজ করছি ভাবতে পারো?

পিক্‌পিকের টানা টানা চোখ যেন মূর্ছা গেল। এম্‌নি করেই এলিয়ে পড়ল। বিজয় বলল—

—আমার ভাইরা কাজ করুক। আমি বিজয় দাস···আমার সঙ্গে বাস করে ওরা, তাই তো একটা ভাগ্যের কথা।

শেষ অবধি কুমুদ আর সুজয় চাকরি নিল। বিজয় নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের এক দুরূহ তত্ত্ব নিয়ে মস্তো বই লিখল রাতজেগে বসে। বিজয়কে দেখবার পর বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল লতিকা রায়, যে বিবাহিত জীবনে সে অসুখী। বিজয়ের মধ্যে সে নিজের প্রাণমনের একটা দোসর পেয়েছিল। লতিকাই টাকা দিয়ে বই ছাপাল বিজয়ের। 'সিলেক্ট'-এর স্তাবকবৃন্দের আর বুঝতে বাকি রইল না, সে এবার বিজয়ের পায়ের কাছে দেশবাসীর হৃদয়মন ঢেলে শ্রদ্ধাঞ্জলি পড়বে।

কার্যকালে তা মোটেও হল না। কেমন করে যেন টিপ ফস্কে গেল। সমালোচনার ভার স্বতই বিজ্ঞানীদের হাতে পড়ল। তাঁরা কড়া ভাষায় লিখলেন—কোনো বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান না রেখে···

স্তাবকরা কিন্তু সমালোচকদের কথাবার্তা উড়িয়ে দিল। সেই কাচের ঘরে বিজয়কে তারা অভিনন্দন জানাল। পার্টিতে যে খরচ হল- তাতে স্বচ্ছন্দে বিজয়কে বসিয়ে ও রকম আরো পাঁচখানা বই পাঁচবছর ধরে লেখানো চলতো।

তাতেই খুশি হবে বিজয়? অন্য একটা পথ খুঁজতে লাগল সে। মনে হল ভারতীয় সংগীতের উৎপত্তি নিয়ে অনেক কিছু করবার আছে। আমাদের বন্ধু অরুণ মজুমদার তখন বাইরে গাইতে শুরু করেছে। অরুণ বলল—বিজয়, গান তুই কোনোকালেও করিসনি। ও খেলা করবার জিনিস নয় বিজয়।

—গলায় গান গাইবার কথা কে বলছে? তোদের মতো মেয়ে-ভোলানো গানের কথা আমি বলছি না। গান এল কোথা থেকে? আর্য-অনার্য সভ্যতার মিশ্রণ আর আরব পারস্তের প্রভাব—

—এ বিষয়েও পশ্চিমের বহু পণ্ডিত, আমাদের দেশের বহু জন, গভীর গবেষণা করেছেন।

অপরে যা করেছে তার ওপর বিজয়ের অসীম অশ্রদ্ধা। অরুণের সঙ্গে নেমে আসছি যখন, দেখলাম বিজয়ের মা আগুন তাতে বসে রুটি ভাজছেন। তাব বোন বেলা বাটনা বাটছে। কুমুদ আর সুজয় খেতে বসেছে। খুব ভদ্রভাবে গরিব হয়ে যাচ্ছে পরিবারটি। বেলার সুন্দর চেহারাটা সতেবো বছবেই স্বাস্থ্যের অভাবে ফ্যাকাশে হয়েছে।

বেরিয়ে রাস্তায় এসে অরুণ আমার মনের কথাটা বলল। বলল— বিজয়টা একেবারে অমানুষ।

গান ছেড়ে সাহিত্যের বুড়ি ছুঁয়ে বিজয় ছবি আঁকতে ধরল কবে সে খবর ঠিক জানি না।

হঠাৎ একদিন প্রতীপ দত্তের সঙ্গে দেখা। বলল—আপনাদের সেই জিনিয়াসকে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছি। বিজয় দাসের মা, সম্পর্কে আমার পিসিমা। তাঁর অনুরোধে এতদিন বাদে একটা চাকরি করে দিতে পারলাম বিজয় দাসকে। পাবলিসিটি ফার্মের কাজ। কে লুফে নেবে না বলুন! তা সে দুদিন ধরে আসছে না। আজ ফোন করে জানিয়েছে চাকরি করবে সে নিজের শর্ত অনুযায়ী। তাকে সম্মান দিতে হবে!

অত্যন্ত রাগ হল। প্রতীপ দত্তের মোটা চৌকো মুখখানা দেখে বুঝতে বাকি রইল না বিজয় দাসের সম্মানের দাবিটা তার বোধের অতীত। বিজয়ের ওপর রাগ হল। কেন, সে কথা আর কী বলি।

বিজয়ের বাড়ির চেহারাটা আরো মলিন। কী ভাগ্য যে বেলার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দুই ভাই সংসার চালাচ্ছে। বিজয়ের মা ছেলের নাম করতে অভিশাপ দিয়ে উঠলেন।

ঘরের মেঝে ভরা সিগারেটের টুকরো। চায়ের পেয়ালায় সর। ইজেল পর্দা ঢাকা। প্যালেটে চাপ চাপ রঙ। তুলি গড়াগড়ি যাচ্ছে।

বিজয়ের চোখের চাহনি যেন কেমন দেখলাম। বসলাম। চোখ বুজে

নিজের কথাই বলে গেল বিজয়। কোন্ ক্রিটিক কী বলেছেন। কার কথার মূল্য কতখানি। শুনতে শুনতে অসহ্য বোধ হল। বললাম,

— বন্ধুবান্ধবের খবর রাখিস?

—না।

—প্রণবকে মনে পড়ে?—লণ্ডনের—লণ্ডনের ডক্টরেট পেল প্রণব। ওর পেপারের খুব প্রশংসা বেরিয়েছে। দেখিস্‌নি? বিজয় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বললাম—

— আর কারু খবর রাখো আর না রাখো, অরুণের খবর নিশ্চয় জানো? ডেলিগেশনে হরদম বাইরে যাচ্ছে। লণ্ডনে ক্লাসিকাল গানের প্রোগ্রাম করল। খুব নাম করেছে! এক ডাকে চেনে সবাই। ভালো কথা, অনাদি—

— অনাদি আবার কী করল?

বিজয়ের অসহিষ্ণু কণ্ঠ আমি যেন শুনেও শুনলাম না। বললাম,

—অনাদি সাউথে যাচ্ছে আর্ট কলেজে চাকরি নিয়ে। ওর তিনখানা ছবি সেণ্ট্রাল থেকে কিনল দিল্লিতে আর্ট গ্যালারির জন্যে। কেন, ওর ছবি নিয়ে এবারকার ক্যালেণ্ডার দেখিস্‌নি?

বিজয়ের গলার স্বরটা কেমন যেন হয়ে গেল। আমার মুখের দিকে চোখটা তুলে বলল,

—অনাদি ছবি আঁকত, তাই না?

—এই শোন্, অনাদিকে আমরা একটা রিসেপশন্ দিচ্ছি। কোথায় জানিস? তোদের সেই 'সিলেক্ট'-এর সেই কাচঘর। মনে আছে তো?

—সেখানে?

—দিলীপ যে ওবাড়ির মেয়ে রঞ্জনাকে বিয়ে করেছে। দিলীপই ব্যবস্থা করছে। কেন, অনাদির খবর তুই জানিস না?

—না।

—কাগজ পড়িস না?

—কোন্ শিক্ষিত লোক কাগজ পড়ে বলো? আমি হাসলাম। বিজয় চটে উঠল। অস্থির হয়ে উঠল তার লম্বা লম্বা ফর্সা আঙুলগুলো। বেতের চেয়ারের উপর লক্ষ্যহারা ভাবে চলাফেরা শুরু করল। বললাম,

—তুমি যাই বলো বিজয়। আমাদের মধ্যে তুমিই ছিলে সবচেয়ে গুণী।

অনাদি, অরুণ, প্রণব, এদের তুমি কী রকম তাচ্ছিল্য করতে। দ্যাখো, প্রমাণ হল তো প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হয়! পরিশ্রম করতে হয়।

কোন্ একটা নিষ্ঠুরতা পেয়ে বসেছিল আমাকে। বললাম,

—তুমি একটা কিছু করো বিজয়! প্রতিভা মানে এই নয় যে ঘরে বসে বসে তুমি সকলের ওপরে থাকবে, আর তোমাকে বুঝল না বলে দেশের মানুষ হচ্ছে বোকা।

তারপরই নিজের রূঢ় আচরণ লজ্জা দিল আমাকে। বেরিয়ে এলাম আমি। বিজয়ের মাকে দেখলাম তরকারি কাটছেন, রান্নাঘরে বসে বসে। বিড়বিড় করে কথা বলে চলেছেন। একটা বিশ্রী কৌতূহল থেকে দাঁড়ালাম এক মিনিট। তিনি শাপ দিচ্ছেন নিজের ভাগ্যকে। স্বামীকে দোষ দিচ্ছেন। বিজয়কে শাপ দিয়ে চলেছেন।

বিজয়ের বাবার কথা মনে পড়ল। মনে হল অনেক সুকৃতি তাঁর। মরে বেঁচেছেন!

আমি চলে আসবার পর আমার কথাগুলো নিশ্চয় ভেবেছিল বিজয়। অন্য সকলের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের জীবনের চূড়ান্ত বিফলতা তাকে আতঙ্কিত করেছিল কি? কে জানে?

তারও পরে চারটে বছর গেল। ছবি আঁকবার ক্যানভাস ছুরি দিয়ে ফালা-ফালা করে বিজয় থিয়েটারের দিকে ঝুঁকল। কিন্তু কঠিন হয়ে আসছে দিনকাল। যে প্রতিভার কোনো পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে না, তার পেছনে অনির্দিষ্ট কাল ধরে স্তুতিবাদ চালাতে নারাজ মানুষ। তাছাড়া চল্লিশ বছর বয়সেও যে মানুষ এটা ছেড়ে ওটা ঠুকে ঠুকে নিজের পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করছে, তাকে বোঝা কঠিন। তাকে ভালো লাগা কঠিনতর।

থিয়েটারের ট্রুপ ভেঙে কার যেন টাকা নিয়ে এক মাসিক-পত্রিকা খুলল বিজয়। প্রথম এবং সর্বাগ্রগণ্য হবার পাগলামিই তার শত্রু হল। নইলে এত জিনিস হাতড়িয়েছে বিজয় সারা জীবন ধরে যে, মাঝামাঝি একরকম দাঁড়িয়ে যেতে পারত যে কোনো একটায়। ঘষেমেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পৌঁছতে পারলে অর্থাগমও হত। তার কোনোটাই হল না। সেই দীর্ঘছন্দ দেহ পাকিয়ে উঠল। চোখের নিচে পড়ল কালি। বন্ধুবান্ধব তাকে দেখলেই সরে পড়ত! কথাবার্তায় সেই দম্ভ এবং আত্মম্ভরিতা তখনো তার অটুট। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

বিজয় দাসকে তখনো দেখা গিয়েছে, মাথা উঁচু করে চাদর লুটিয়ে কলেজ স্ট্রীটে হাঁটতে, অথবা বিদেশী ছবির এগ্‌জিবিশনে ডেনমার্কের প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করতে। তার বহির্জগৎ তখনই সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে। তার ভক্ত মহল অনেক দিন হল তাকে পরিহার করে নতুন প্রতিভার সন্ধানে ব্যস্ত। বিদ্বৎ সমাজ তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। কেননা সর্বঘটের কাঁঠালি কলার ওপর তাদের অনাস্থা অসীম।

ঘর তার কাছে অসহ্য। বাড়ির তাকভরা তার লেখা বইগুলো পোকায় কাটছে। দেওয়ালে অনাদৃত সব ছবি। মিউজিকের বইগুলোতে ধুলো পড়ছে। মা তাকে সহ্য করতে পারেন না। ভাইরা ভয় পায়। কেন-না তার সঙ্গে তাদের মানসিক দূরত্ব হাজার হাজার মাইলেরও বেশি। ঘরে-বাইরে নিজের দম্ভ আর অজস্র হতাশার বোঝা নিয়ে এই সঙ্গীহীন মানুষটি মাথা উঁচু করেই ফিরতে লাগল। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় একলা ছাদের ঘরে বসে থাকত যখন বিজয় তখন দেওয়াল থেকে পনেরো বছরের বিজয় দাসের সুখী, হাসিখুশি চেহারাটা তাকে ব্যঙ্গ করত।

শেষ অবধি ছোট্ট একটা ঘটনা তাকে চুরমার করে ভাঙল। তারই পরিচিত ছেলে তপন আর স্বাতী যখন প্রেম করে বিয়ে করল, কথা উঠল। স্বামীর ঘর ছেড়ে আসতে স্বাতীর মানসিক প্রস্তুতির অভাব ছিল না। কিন্তু জবরদস্ত পুরোনো সিভিলিয়ান জোয়ারদার সাহেব স্বাতীকে বেঁধেছিলেন আইনের মারপ্যাঁচে। বিয়ে করবার আগে আট বছর অপেক্ষা করতে হল তপনকে। স্বভাবসুলভ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজয় ধাক্কা খেল তপনেরই ছোটো ভাই-এর কাছ থেকে। শুনল—এখনো যদি বিয়ে না করো বিজয়দা, অ্যাসাইলামে যেতে হবে।

অনেক কথাই মনে হল বিজয়ের। মনে হল বয়স তার তেতাল্লিশ। বুঝল জীবনটা তার কাছে কত বড়ো ফাঁকি। একলা ঘরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের ছয়ফিট তিনইঞ্চি ছায়াটা দেখে ভয় হল তার। তার চেয়ে যেন তার ছায়াটা অনেক জীবন্ত। তার রক্তমাংসের শরীরটাকে হারিয়ে দিয়ে ঐ কালো নিরবয়ব ছায়াটা কেবলি লাফ দিয়ে উঠতে চায়। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল বিজয়। মনে হল অনেকদিন আগে, বোধ হয় দশবছর আগেও মা তাকে বিয়ের কথা বলতেন। ঘুরতে ঘুরতে বিজয় গেল লতিকা রায়ের বাড়ি। একদা বিবাহিত জীবনে অসুখী বলে বিজয়ের দিকে ঝুঁকেছিলেন লতিকা রায়। এখন তাঁর

জীবন পরিপূর্ণ। যে বিজয়কে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল ডাক্তার অজয় রায় মানুষ হিসেবে অনেক ফ্যাকাশে, আজকের বিজয়ের মধ্যে তাকে খুঁজে পেলেন না লতিকা। বিজয়ের আধাময়লা জামাকাপড়, চোখের অস্থির দৃষ্টি, ধুলোভরা চটি দেখে লতিকার ভ্রূ উঠে গেল বিরক্তিতে। হালকাবাদামি 'ডিসটেম্পার' করা ঘরে, যামিনী রায়ের ছবি আর নাগাদের বেতের টুপি, তীর-ধনুক সাজিয়ে যারা বাস করে, তাদের মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় না। তাই লতিকা রায় অল্প হাসলেন। বললেন,

—আপনাকে 'সিলেক্ট'-এ দেখতাম না? আপনি ত বিজয়বাবু? আপনার মুখে সেই 'আরাগঁ'র কবিতা! ডোডো—! বুব্‌লা—!

সি.এল. টি'র হালকা হলদে আর সবুজের পোশাকে দুটি সুন্দর মেয়ে নাচতে নাচতে এল স্কিপিং দড়ি হাতে। লতিকা বললেন,

—গাড়ি বের করেছে? আমার ব্যাগটা নামিয়ে আনো।

তারপর বিজয়ের দিকে চোখ তুললেন। বললেন,

—এখন কী করছেন?

বিজয়ের অসম্ভব হাসি পেল। সোডার মতো দুর্দম হয়ে হাসি উঠে এল। বলল,

—একদা আমাকে 'তুমি' বলতে লতিকা! ডোডোকে আয়ার কাছে রেখে একদিন আমার সঙ্গে—! মনে পড়ে!

বিজয় উঠে দাঁড়াল। লতিকা রায়ের মেক্‌আপের নিচে মুখখানা কতটা ফ্যাকাশে হল দেখতে বসে থাকল না সে!

গেল তার সাহিত্য-জীবনের অনুরাগিণী দীপান্বিতার কাছে। তার হাতে যে কলম কোদাল হয়ে উঠেছিল, দীপান্বিতার হাতে তার নতুন মর্যাদা হয়েছে। পুজোর মুখে পত্র-পত্রিকার চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত দীপান্বিতার কথা কওয়ার সময় হল না।

ঘুরতে ঘুরতে নিউ আলিপুরে অভিনেত্রী সুপ্রিয়াদেবীর কংক্রীটের সুন্দর ছবির মতো বাড়িটিতে কেন যে গেল বিজয়! আঠারো বছর বয়সের বাস্তুহারা মেয়ে কমলাবালা বিজয়ের কাছে এসেছিল বাপের সঙ্গে। বলেছিল,

—এক্সট্রা মেয়ের অভিনয় করি। আমার একটা ছবি যদি আপনাদের কাগজে ছাপিয়ে দেন!

—আর সেই সঙ্গে বেশ আলা দিয়ে এদের জীবনের কথাটা লিখে দেন।

মিনতি করেছিল তার বাবা। বিজয় সেদিন ঘুরিয়েছিল কমলাবালাকে। পুরো রাত ফ্লোরের মশার কামড খেয়ে, এক পেয়ালা কড়া চায়ের কামড়ে খালি পেট জ্বালা করত কমলার বিজয়ের অপেক্ষায় বসে বসে। ঘুমে ভেঙে আসত চোখ। বিজয় লেখাপড়া জানে, বিজয় শিক্ষিত, এই ভরসায় কমলা তার নিজের জীবনের দুঃখদুর্দশার প্রতি অধ্যায় খুলে ধরেছিল বিজয়ের সামনে। ভেবে-ছিল এ সব মানুষ সৎ। তাকে সাহায্য করবে। বিজয় সেদিন তার সঙ্গে যে-ব্যবহার করেছিল কমলার পক্ষে তা ভোলা সম্ভব নয়।

আজ কমলার নাম সুপ্রিয়া। পঁচিশ বছর বয়েস। মাসে পঁচিশ হাজার রোজগার। টনসিল দেখাতে জুরিখ যায়। গরম পড়লে আল্পস্‌-এ যাবে এবার। সুপ্রিয়াকে কে বিয়ে করবে সেই হিসেব করতে অনেকেই ব্যস্ত।

বিজয়ের নামের স্লিপ্‌ পেয়েও সে নামল তিনঘণ্টা বাদে। সাদা কাশ্মীরিতে লাল নীল হস্তীযূথ ছাপা। একপাল হাতির ভার ফ্যানের বাতাসে উড়িয়ে নেমে এল সুপ্রিয়া। সঙ্গে সঙ্গে নামল মস্তো একটি দল। বোঝা গেল ওপরে আর একটি ড্রয়িংরুম রয়েছে। অধৈর্য বিজয় বলল,

—এতক্ষণ বাদে সময় হল? কী করছিলে?

—এই যদি কথা হয় তবে আসুন আপনি। আমার শুটিং আছে।

—অথচ এই আমারই পা ধরে একদিন কেঁদেছিলে মনে নেই? বলেছিলে আপনার কাগজ দিয়ে একটু সুবিধে করে দিন।

—বলেছিলুম বুঝি?

বলে তাকাল সুপ্রিয়া। জ্বলে উঠল তার নীল চোখ। বলল,

—বিজয়বাবু, পা অমন আমি অনেকেরই রোজ ধরি। আবার হাত ধুয়ে ফেলি ডেটল দিয়ে। মনে থাকা কি সম্ভব?

এবার চোখ স্তিমিত হল আলস্যে। দুই হাত উৎক্ষিপ্ত করে বলল—

—সেদিনকার কমলাবালা সরকারকে আমার তো আর মনে পড়ে না। আপনি বেশ মনে রেখেছেন। আপনার স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতে হয় বিজয়বাবু।

বলে অ্যালসেশিয়ানটার মাথা পা দিয়ে নেড়ে, উঠে পড়ল সুপ্রিয়া।

অপমানিত মর্মাহত বিজয় বাড়ি ফিরল। যা কোনোকালেও ভাবেনি, কাগজ দেখে ভারতের বাইরের একটা চাকরির জন্যে দরখাস্ত করল। ভারতের

বাইরে সুদানে তেলের খনিতে কাজ। পায় যদি তো ভালো। চলে যাবে সেখানে। এই জীবনটাকে ফেলে যাবে। নতুন করে শুরু করবে।

ইন্‌টারভিউ-এ চাকরি হল। বাড়িতে সবাই খুশি হলেন। মা হেসে-কেঁদে আকুল হলেন। কালীঘাটে পুজো দিয়ে এলেন। সুজয়, কুমুদ দাদার যাবার অ য়োজনে তৎপর হল। ওপরওয়ালা বাঙালি। খুব ভদ্রলোক। বিজয়কে চা খেতে ডাকলেন ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনের বাড়িতে।

সুন্দর বাড়ি। কাচের মস্তো চৌবাচ্চায় হাঁস ছাড়া রয়েছে। বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে খরগোশ। ঘন সবুজ কার্পেট-মোড়া বারান্দায় বসে অফিসারটি টিন খুলে ধরলেন। বললেন—সিগারেট হোক! পারবেন কি সে দেশে টিকতে? মোটে তিন বছর। তারপরই ইণ্ডিয়াতে আনবে দেখবেন। দাঁড়ান স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই! সে বেশ শিক্ষিত, বুঝলেন না!

একটি সুশ্রী লক্ষ্মীর মতো মহিলা দুটি ছেলের হাত ধরে এলেন। বললেন—

—ডাকছ? আমি যে ওদের স্কুলের ফাংশানে যাচ্ছি।

তারপর বিজয়ের দিকে ফিরলেন। তাঁর মুখে বিস্ময়। চোখে করুণা। মেয়েটি মাধবী। বিজয়ের ঘর থেকে যে একদিন কেঁদে পালিয়েছিল। প্রত্যাখ্যাত হয়ে। বিজয়ের মুখে কথা ফুটল না। মাধবী বলল,

—তুমি!

বিজয় কোনো কথা না বলে বেরিয়ে এল। ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যেই মনে হল মাধবী তার ওপরওয়ালার স্ত্রী, সেই মাথা ঘুরে গেল তার। পুরোনো বাড়ি। খাড়া সিঁড়ি। একেবারে নিচে গড়িয়ে পড়ল বিজয়।

ডাক্তার এলেন। জ্ঞান ফিরল মাঝরাতে। চোখ খুলল বিজয়। চারিপাশে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ চোখে তাকিয়ে বলল,

—কুমুদ, দেওয়ালে ওটা কার ছায়া রে?

—তোমার, দাদা।

—আমার ছায়া!

করুণ বিস্ময়ে ছায়াটার দিকে তাকিয়ে বিজয় বলল—আমার চেয়ে আমার ছায়াটা লম্বা কেন রে? ওকে একটু ছোটো হতে বল্ না। শুনবে না?

মা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। আর ছায়াটার দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত আর্তনাদ করে উঠল বিজয়। সে পাগল হয়ে গেল।

অ্যাসাইলামে নিয়ে আসবার পথে পাশের চলমান ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে বিজয় কুমুদের হাত ধরে বলেছিল,

—কুমুদ, আবার যদি ফিরে আসি, তবে পা দুখানা আমার কেটে দিস্!

ভয়ে ও দুঃখে কুমুদ মিনতি করে—দাদা!

—কেটে সমান করে দিস্। এই ধর্, তাহলে আমি আর ছ ফুট তিন ইঞ্চি থাকব না, সকলের মতো পাঁচফুটের ওপর আট বা ছয় ইঞ্চি হয়ে যাব! বুঝলি কুমুদ?

—একটু ঘুমোও দাদা!

কিন্তু আবার উঠল বিজয়। বলল—পাশের গাড়িটা কী রে?

—বম্বে মেল।

—অত জোরে যাচ্ছে কেন?

—দাদা!

—আমার থেকে জোরে যাবে? কখ্খনো নয়! আমাকে ফেলে যাবে? জিতে যাবে? না!

বলে একটা চীৎকারে বিদীর্ণ হয়ে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল বিজয়।

# সোনালি মাছ

ছেলেটির উৎসাহে প্রোজ্জ্বল মুখখানির দিকে চেয়ে সস্নেহে হাসলেন তিনি। বললেন—কাল সকালেই যাব। তুমি আর আমি।

—শুধু আমরা দু-জন? আর কেউ থাকবে না?

—তুমি কি চাও, আরো কেউ থাকুক?

—আপনি পথ চেনেন?

—এক সময় এমনিধারা বনে-জঙ্গলেই দিন-রাত কেটেছে আমার। চাটগাঁয় হিল-ট্র্যাক্টস। বৃষ্টিতে ভেসে আসছে সাপ, জোঁক, ম্যালেরিয়া। পেছনে পুলিশ। তখন কিন্তু বিপদের ভয় করিনি।

এই বিখ্যাত মানুষটির মুখের কথা শুনতে শুনতে শ্রদ্ধায় বিগলিত হল তরুণ ছেলেটির হৃদয়। বলল—আজ তাহলে বিশ্রাম করি। কেমন?

ছেলেটি শুতে গেল পাশের ঘরে। তিনি শুনতে পেলেন সে গান করছে। তার গুন্‌গুন্ শুনতে শুনতে তিনি ঘুমের ওষুধ খেলেন। এমনি গান গলায় আসে কখন? যখন মানুষ তরুণ থাকে। তারুণ্যের আত্ম-বিশ্বাসই এই গানের উৎস।

চাকর মাসাজ করে গিয়েছে। সিলকের পাজামা পরে পালকের বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি। সম্মানিত অতিথি। সমাদরও তাই রাজসমারোহে। কোনো ত্রুটি রাখেননি চা-বাগানের মালিকটি। তবুও ঘুম আসতে দেরি হল।

ঘুম বড়ো মূল্যবান তাঁর কাছে। এবং দেশবাসীর কাছেও।

কাল দুপুরে যাবেন গ্রাম-মণ্ডলীর গ্রন্থাগার উদ্বোধন করতে। বিকেল তিনটের প্লেন ধরবেন। তারপর তিনঘণ্টা বাদেই পৌছবেন কলকাতা। ছটায় পৌছিয়ে সাড়ে সাতটার মধ্যে স্নান করে তৈরি হয়ে নিতে হবে। রাত আটটায় হোটেলে বিদেশী অতিথিদের সম্বর্ধনা সভা।

রাত দশটায়? শর্মিলা তালুকদারের ঝকঝকে হাসিটা মনে পড়ল। শর্মিলার সঙ্গে তাল দিতে দিতে রাত এগারোটা বাজবে। তাঁকে ভর করে সাংস্কৃতিক জগতে পা বাড়াবার ইচ্ছে হয়েছে শর্মিলার। দুটি ছেলে দেরাদুনে

পড়ে। স্বামী গিয়েছেন ফ্রান্সে। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে। তাঁর চেহারা দেখে, তাঁর সুন্দর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে শর্মিলা তালুকদার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

তবু তাঁর ঘুম এল না। তাঁর ঘুম চুরি করেছে ঐ তরুণ আদর্শবাদ ছেলেটি।

নিজেকে তিনি তরুণদের দলেই ফেলেছেন। তাই ছেলেটি যখন দেখা করতে এল, আশ্চর্য হননি। না হয় সোনামুড়া থেকেই আসছে। তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ করবার জন্যে, বা কথা কইবার জন্যে কলকাতায়ই কি মানুষ কম কষ্ট করে?

—ব্যক্তিপূজার দিন বিগত।—এ কথা বলে তিনি নিজেও কতবার বক্তৃতা দিয়েছেন। তবু, তিনি নিজের বিষয়ে ব্যক্তিপূজার উৎসাহী সমর্থক। সচেতন মনে ব্যাপারটাকে স্বীকার করতে বেধেছে। ওরা আসে, ওরা উৎসাহ চায়, ওরা শ্রদ্ধা করতে চায়—এই সব বলেছেন আশপাশের মানুষকে। প্রথমে মনে বিঁধতো। মনে হত প্রবঞ্চনা করছি। নিজেকে এবং পরকে। মনে হত সারাজীবন যে-সব কথা বলেছেন, যে-সব আদর্শ প্রচার করেছেন আজ তার বিরোধিতা করছেন। আজ আর বাধে না। ক্রমে ক্রমে কথাগুলোকে বিশ্বাস করতে শিখেছেন।

ছেলেটি কিন্তু এল সম্পূর্ণ অন্য বক্তব্য নিয়ে। বলল—কথা আছে আপনার সঙ্গে। অনেক প্রশ্নের জবাব চাই।

—রিপোর্টার? এখানেও?

—প্রতিনিধি বলতে পারেন।

—কাদের?

—অনেক মানুষের। যারা আপনাকে বিশ্বাস করেছে, সমর্থন করেছে,—আর আজকে যাদের আপনি বিভ্রান্ত করেছেন।

এ ধরনের কথা শুনতে তিনি অভ্যস্ত নন। দীর্ঘছন্দ দেহটি ঈষৎ ঝুঁকিয়ে, কপালের রুক্ষচুলটি সরিয়ে তিনি মোটা কাচের চশমার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ নজর করলেন। কে হতে পারে? কী নাম?

চা-বাগানের মালিক ভদ্রলোকটি বললেন,—কে তোমাকে আসতে দিল? আবার এসেছ তুমি?

তাঁর কথায় মনে হল ছেলেটি তাঁর খুব চেনা। একে তিনি জানেন।

—ওঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে আমার।

—উনি সামান্য বিশ্রামের জন্য এসেছেন। তোমার এই সব আবোল-তাবোল বকুনি শুনে এই সময়টুকু নষ্ট করবেন কেন? তোমরা বড় অবুঝ। একটু শান্তির যে ওঁর কত প্রয়োজন।

তিনি হাসলেন। বললেন—

—কী নাম ভাই তোমার?

—অমলচন্দ্র বসু।

সাধারণ নাম। সাধারণ ছেলে। তিনি জানেন এদের সঙ্গে কী ভাবে কথা কইতে হয়, কী ভাবে মেলামেশা করতে হয়। অন্যান্য নেতারা এইসব সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে মিশতে, এদের মুখোমুখি হতে ভয় পান। তিনি কোনোদিনও ভয় পান না।

তিনি আবার সুন্দর হাসলেন। বললেন—

—সান্যাল মশাই, আপনি ঘুরে আসুন। আমি আলাপ করি অমলের সঙ্গে। ঘাড় ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লেন সান্যাল। তাঁর চা-বাগানে গোলমাল হয়েছে। কমিশন আসছে তদন্ত করতে। তাঁদের আনতে এয়ারোড্রামে যেতে হবে। বলে গেলেন,

—পুরো দিনটা রইলো আপনার। বিশ্রাম করবেন কিন্তু। কাল আপনার অনেক কাজ।

বাংলো ছেড়ে বাগানে নেমে এলেন তিনি।

ঝাউগাছের নিচে বেতের চেয়ার ছড়ানো। কাচের চৌবাচ্চায় অনেকগুলো মাছ খেলা করছে না! বড় মাছটা বোধ হয় ছোটগুলোকে তাড়া করছে। মালীটা খাবার পোকা ছড়াচ্ছে। লাল, সোনালি, কালো-মিশমিশে পাৎলা ডানাওয়ালা মাছ। দেখে দেখে কে বলবে ওদের মধ্যে চলেছে অদ্ভুত একটা মারণনীতি। ছোট মাছগুলো প্রাণভয়ে ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আর দর্শকজনের মনে হচ্ছে বড়ো সুন্দর লীলায়িত এই সফরীখেলা।

কাচের বেড়া টপকে চলে এসেছে বড় মাছটা। তার রাক্ষুসে হাঁ-টা দেখেও নির্দোষ এক গতিছন্দ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

এই যে পরস্পরকে সংহার করে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে জীবজগৎ, এ সম্পর্কে ছেলেটিকে কিছু বলতে চাইলেন তিনি। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এমনি সব ছোট ছোট জিনিস নিয়ে এমন সুন্দর কথা কইতে পারেন! সে কথা শুনতেই বা কতো লোকের আগ্রহ।

কিন্তু ছেলেটি তো শুনতে চায় না। বলতে চায়। নিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট হাতে বেতের চেয়ারে ডুবে গেলেন তিনি ছেলেটি কথা কইতে সুরু করল। অনেকদিনের বক্তব্য জমেছিল বোধ হয়। সুন্দর সুন্দর সাজানো মন রাখা কথা নয়। আবেগে জড়িয়ে গেল গলা। উৎসাহে কেঁপে উঠল কখনো। আন্তরিকতায় উত্তপ্ত কথাগুলি তাঁর মনের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। শুনতে শুনতে মনে হল তাঁর মনের অনেক ভিতরে সে-ই যে একজন ঘুমিয়েছিল, সে-ই জেগে উঠেছে।

সে কি তিনি? সেই মানুষটার টাকাপয়সা ছিল না। ছিল নিষ্ঠা, প্রেম, আবেগ। দীপ্ত আদর্শবাদের বাণী হৃদয়ে বহন করে সেই মানুষটি কত দুর্গম ও বন্ধুর পথে বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছে। কারাবরণ করেছে। দশজনের দুঃখ ভাগ করে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে সংগ্রামের পথে। সেই মানুষ এমনই লম্বা ছিল। এমনই রোগা আর ফর্সা। আধময়লা জামাকাপড় পরে সে ফুটপাত আর বেঞ্চিতে শুয়েও কাটিয়েছে কতো রাত। সে কি তিনি? ছেলেটি বলে চলল,

—আপনাকে আমরা বিশ্বাস করেছি, ভালোবেসেছি। আপনি ছিলেন দল আর গোষ্ঠীর বাইরে। স্বার্থ-চিন্তাকে আপনি ঘেন্না করতেন। হুজুরীমল লেনের বাসায় যখন আপনি আর শঙ্কর দত্ত ছিলেন—শঙ্করের টি-বি হলো··· সেই যে কাগজে লিখলেন···লেখক নন, তবু প্রয়োজনে তো চিরকালই আপনি কলম ধরেছেন···

সব কথা তাঁর কানে যায় না। উনিশ-শো ত্রিশ না একত্রিশ সে-টা শঙ্কর···শঙ্কর···শঙ্কর! সেই মেয়েটির কী হল? শঙ্করের যাকে বিয়ে করবার কথা ছিল? বীণা। শঙ্কর-কে যে দেখতে আসত হাসপাতালে? শঙ্কর! মরল বলতে গেলে বিনা-চিকিৎসায়। চল্লিশ টাকা। চল্লিশটা টাকা সেদিন তাঁর কাছে ছিল স্বপ্ন। বড়ো সুন্দর দেখতে ছিল বীণা। আর মস্ত প্রতিভা ছিল শঙ্করের। মেধাবী ছাত্র ছিল! একটি সুন্দর মেয়ের প্রেম আর বন্ধুবান্ধবদের সেবা, কিছুতেই বাঁচানো গেল না শঙ্করকে। তারপর বীণা তাঁর কাছে কতবার এসেছে। শেষ অবধি বীণা-ও যে কোথায় হারিয়ে গেল—অনেক মানুষের ভীড়ে—অনেক জীবন সংগ্রামের মোহনায়। আর তার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি।

আজ তাঁর কাছে চল্লিশ টাকার কোনো দামই নেই। সেদিনই চল্লিশ

টাকার ফুল কিনে শর্মিলাকে দিলেন। অথচ একদিন চল্লিশ টাকা পেলে শঙ্কর নামে একটি ভালো ছেলেকে বাঁচানো যেত। বীণা নামে একটি সুন্দর মেয়ের স্বপ্ন সার্থক হত।

অমলের কথা শুনতে শুনতে তাঁরে মনে হয় বুকে যেন আবার ধাক্কা লাগল। শঙ্করের নাম মনে পড়তে তাঁর কেন মন খারাপ হল? না কি তিনি আর সে একই মানুষ?

অমল বলে······এমন করে আপনাকে বলবার কোনো মানে না কি হয় না। ওরা বলে আমি নাকি পাগল। মাথায় আমার ছিট আছে। হয়তো আছে। বুঝি না। তবু মনে হয়, একটা মানুষ, যে ছিল আমাদের মুখপাত্র, যাকে আমরা বিশ্বাস করতাম, তাকে কিছুতেই হারাতে পারবো না। আপনিও এর-ওর-তার মতো স্বার্থ ছাড়া কিছু ভাববেন না—নীতির বালাই রাখবেন না—সুবিধে মত দল বদলাবেন—তা কিছুতেই হতে পারে না। টাকা···অনেক টাকা তো করেছেন ···বলুন টাকাই কি সব?

মোটা কাচটা মুছে নিয়ে তাকান তিনি। ঘাড় নেড়ে জানান, না। টাকা সব নয়। অমল এগিয়ে আসে। বলে,

—আমাকে ওরা বলে পাগল। আপনাকে এসব কথা এমনভাবে বলবার কোনো মানেই হয় না। সত্যিই কি আমি পাগল? আমার মনে হয় আপনি যে ভুল করেছেন তা যেন আপনি নিজেও জানেন না। জানলে কি ভুল করতেন?

উস্কোখুস্কো চুল। ঘাম চিক্‌চিক্ করছে মুখে। অমল বলে,

—চারিদিকে শুধু বিশ্বাসঘাতকতা। এ ওকে ঠকাচ্ছে···ও তাকে ঠকাচ্ছে··· দেখে দেখে যে কী রকম লাগে। মনে হয় অন্যায়ের সঙ্গে এত আপোষ করে মানুষ বাঁচে কী করে?···

এখন, এই রাত দুটোয়, সিল্ক নেটের মশারির ভেতর শুয়ে শুয়ে ছেলেটির কথা মনে করতে করতে সামান্য ঘুম নামলো চোখের পাতায়। ওষুধের নেশায় চোখ বুঁজে আসছে। তবু মনটা কি ঘুমোচ্ছে? না তো। মনে যেন ভয়? কাকে ভয়? ঐ ছেলেটিকে। একটা আধাখ্যাপা ছেলেকে? হ্যাঁ তাকেই। কেন? কেন না তাঁকে দেখে যারা বিভ্রান্ত হয়, ও তাদের দলে নয়। ওর চোখে তিনি নিজের পরাজয় দেখতে পাচ্ছেন। এমনি অনেক মানুষ তাঁকে অবিশ্বাস করে; অশ্রদ্ধা করে। লোকের শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসই তার পুঁজি। সেখানেই যখন ফাকি ঢুকল তখন তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি অবহিত হতে হবে। সেই ছেলেটার মুখ

কী রকম যেন? তাঁর পঁচিশ বছর আগেকার চেহারাটার মতো। সেই মানুষটা তাঁর মন ছেড়ে যেন বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসেছে। বসে তাঁকে কী বলছে। সেই ছেলেটার মতো ঝুঁকে ঝুঁকে আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁকে বলছে...বাঁচবার উপায় হল মাথাঝাড়া দিয়ে ওঠা—মেরুদণ্ড তুলে দাঁড়ানো। চোরা কণ্ট্রাক্ট-গুলোর লোভ ত্যাগ করা। একটা অকৃতদার মানুষের পক্ষে যা দরকার তার অনেক বেশি তুমি পেয়েছ। শেষ ক'টা দিন সুন্দরভাবে বাঁচতে চেষ্টা কর! সমুদ্রের ধারে চলে যাও। পাহাড়ে যাও। দেশে দেশে ঘোরো। যা হয় কর।

সেই কথাগুলো তিনি শুনছেন কি? না তো! শুনতে শুনতে তাঁর চোখ চলে যাচ্ছে সেই মাছটার দিকে। যে কাচের দেয়াল পেরিয়ে ছোট মাছ-গুলোকে গিলে চলেছে। সুন্দর ও শোভনভাবে একটা হিংস্র কাজ করছে।

একটা ভয়াল মাছের মতোই হাঁ করে অশান্ত অন্ধকার এসে তাঁকে গ্রাস করল। ঘুমোলেন তিনি। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও অস্বস্তির অনেক কাঁটা বিঁধতে লাগলো তাঁকে। এই নিরবয়ব আঁধারটার মুখের মধ্যে যেন ঘুমোচ্ছেন তিনি, আর গায়ে বিঁধছে তারই অদৃশ্য সব দাঁত।

সকাল হয়েছে অনেকক্ষণ। ঘন সবুজ গাছের ছায়ায় ছায়ায় সুঁড়ি পথ ধরে তাঁরা দুজন চলেছেন। অনেক কথা হয়েছে। অমলের মন এখন খুব প্রসন্ন। তার কাছে কথা দিয়েছেন তিনি। আর এমন করে আলেয়ার পেছনে ছুটবেন না। ফিরে আসবেন। আগের মতো হবেন। কেমন করে যে হবেন, কোথা থেকে যে শুরু করবেন, সে সব কথা হয়নি। হয়েছে শুধু হৃদয়ের কথা। সেখানে আবেগটাই বড়ো। সত্য ভাষণই আসল কথা। অমলের মনে হচ্ছে মনটা তার হালকা হয়ে গেল। শেষ অবধি যে তার শুভবুদ্ধির জয় হল, সে জন্য নিজের ওপর বিশ্বাস তার ফিরে এসেছে।

তাঁকে খুব চিন্তাকুল দেখাচ্ছে। বুড়িয়ে গিয়েছেন যেন। এ সব পথ নেহাৎ খুব জানা তাই এগিয়ে চলেছেন নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে।

ছেলেটি বলে—আর কতদূর?

জবাব দেন না তিনি। পিপাসার সময়ে বন্য জন্তু যেমন জলের গন্ধ ঠাহর করে করে এক লক্ষ্যে চলে, তেমনই এগোচ্ছেন তিনি, যা খুঁজছেন, এখনো পাচ্ছেন না। আর কত দূর? মা কি পঁচিশ বছরের ব্যবধানে সব-ই বদলে গেল?

না। পাওয়া গেছে নদীটা। আজ সারা সকাল শুধু তাঁর যৌবনের দিনগুলির গল্প করেছেন অমলের সঙ্গে। সেই দিনগুলির সঙ্গে নদীর এই জায়গাটুকুর অনেক স্মৃতিই জড়ানো। এখন আবার সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নিঃশ্বাস নিলেন বুক ভরে।

ছোট নদী। এখানে এসে পাথরে পাথরে পাক খেয়ে ঢালুর দিকে নামছে গমগম শব্দ করে। নদীর ওপর ঝুঁকে পড়েছে জামগাছের ডালপালা। অমলের চোখে হয়তো একান্ত পরিচিত এ দৃশ্য। তবু আজকে আবার নতুন করে সে মুগ্ধ হল। তিনি যখন মুগ্ধ হচ্ছেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে অমল আবার দেখল। সেও বললে—চমৎকার!

এখন প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তাঁকে মেপে মেপে ফেলতে হবে। জলে নামলেন তিনি। অল্প জল। দুরন্ত স্রোত। জামগাছটার ডালটা হাতে ধরে অমলকে বললেন—ওপারে যাই চলো।—বলতে না বলতে তাঁর পা পিছলে গেল। অস্ফুট আর্তনাদ আর মুখের ভয়ার্ত ছবি দেখে আর কিছু ভাবল না অমল। সেও লাফিয়ে নামল জলে। আর এই শ্যাওলা-পেছল পাথরে লাফিয়ে নামাই বেয়াকুবি। সেই ভুলই করল অমল। চিৎকার করবার সময় হল না। বেকায়দায় পা পিছলে জলের সঙ্গে পাকাতে পাকাতে সে গিয়ে পড়ল একেবারে সাত ফিট নিচে আর ওরকম জায়গায় সাত ফিট উচ্চতাটাও মারাত্মক।

জলের চোরা পাকের গ্রাসে পড়ে, পাথরের ফাঁকে অমলের শরীরটা যখন স্থির হয়ে গেল, তলিয়ে গেল, তখন তিনি জামগাছের ডালটা ধরলেন। ওপর দিকে চেয়ে আকাশ দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন সবুজ পাতাগুলো আর মনে হল, আজকের এ ঘটনার সাক্ষী রইল একমাত্র এই গাছগুলো। আর কেউ নয়, আর কিছু নয়। কী ভাগ্য, যে গাছপালা কথা কয় না।

কিন্তু তাঁকে তো বাঁচতে হবে। আর সমস্ত ব্যাপারটার পরিসমাপ্তিও নিখুঁত অভিনয়ে সম্পূর্ণ করতে হবে।

জামগাছের ডাল ধরে কোনো মতে ওপরে এসে ঘাসের ওপর পড়ে গেলেন তিনি। সাঁতার জানে না, তবু যে অমল লাফাবেই তাকে বাঁচাতে, তা তিনি জানতেন এবং তাই জেনেই চেঁচিয়েছিলেন। তবু ঘামতে লাগলেন দরদর করে। ভেজা গা দিয়েই ঘাম বেরুতে লাগল। তারপর উঠে ছুটতে শুরু করলেন। গাড়ি ছিল অনতিদূরে। ড্রাইভার ছিল, টিফিন ক্যারিয়ার

নিয়ে চাকর ছিল। তারা ছুটে এল। আরো আরো মানুষ এল। তোলপাড় হল জল! পাথরের আঘাতের চেয়ে অনেক মারাত্মক জলের একটা চোরা পাক।

অমলকে যখন তোলা হল, তখন তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন—ও আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল, আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। এ কী করলাম? আমি ওকে হত্যা করলাম।

তাড়াতাড়ি সান্যালমশাই-এর কাছে খবর গেল। সমবেত মানুষগুলি নিজেদের মধ্যেই চাপা গলায় প্রশ্নের গুন্ গুন্ তুলল।

—এ অঞ্চলে ও চোরাপাক বিখ্যাত। তবু ছেলেটি নামল কেন।

—ওঁকে বাঁচাবে বলে।

—পাগল না বোকা?

—চিরকালই খ্যাপাটে।

তিনি এত ভেঙে পড়লেন যে তাকে সামলাতে সান্যালমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তবু তাঁকে আশ্বস্ত করা গেল না। কোথায় কে আছে ছেলেটির? আত্মীয়স্বজন? তাদের সাহায্যের জন্য মুঠো মুঠো টাকা দিলেন বের করে। যা কিছু একটা করা হোক। একটা সিমেন্টের ফলক। একটা কিছু।

অমলের মৃত্যুর দুই ঘণ্টার মধ্যেই এ সব ব্যবস্থার কথা শুনতেও খারাপ লাগল ডাক্তারের। তবু তিনি এঁর মহানুভবতায় অভিভূত হলেন। যিনি সন্ধ্যার আগে কলকাতা চলে যাবেন—তাঁর এ-রকম দূরদর্শিতা, সহৃদয়তা, মনে হল এর যেন তুলনা নেই। দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে একটি সামান্য ছেলে, তার জন্যে তিনি কী রকম অভিভূত হয়ে পড়েছেন। আবার মনে হল, এইসব গুণের জন্যেই তো তিনি বিখ্যাত! একটি মানুষের মধ্যে এতখানি মহত্ত্ব—কেমন করে যে সম্ভব হয়! অমলের জন্যে তাঁর শোকই বা কী গভীর! সাধারণ ছেলে অমল, তাঁর মুখের টুকরো টুকরো কথায় হয়ে উঠল অসামান্য! তার সম্পর্কে তিনি এমন আন্তরিক আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন! এই সাধারণ ছেলেটির মধ্যে যে কী অসাধারণ হৃদয়-সম্পদ ছিল, কেউ তা জানেনি। কেউ তা বোঝেনি।

শুনতে শুনতে সান্যালমশাই গলা ঝেড়ে বললেন—আমি ওর নামে শাদা পাথরের একটা স্মৃতিফলক করিয়ে দেব। দেখবেন!

—সত্যি?

বলে তিনি আবার অভিভূত হয়ে পড়লেন! বললেন,

—আজ ঐ ছেলেটির এই পরকে বাঁচাবার জন্ম নিজের জীবনটাকে তুচ্ছ করা দেখে আমার মনে হচ্ছে ওর কাছে আমি কত ছোট, কত তুচ্ছ, সত্যি, ওরাই হলো খাঁটি ইস্পাত। ওরাই যুগে যুগে ইতিহাস রচনা করে। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

আজ সকলেরই মনে হল ঐ ছেলেটি কী অসামান্য!

আর সামান্যকে অসামান্য করলেন যিনি, সেই তাঁর দিকে চেয়ে অভিভূত ডাক্তার দুদিকেই মাথা নাড়লেন।

অমল নেই। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আর তাঁর কোনো ভয় নেই। এবার আর কেউ এসে তাকে অস্থির করে তুলবে না। এখন তিনি আবার আগেকার মতোই নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চলেফিরে বেড়াতে পারবেন।

কলকাতায় কদিন বাদে এক ঝলমলে রাতে শর্মিলা তালুকদারের ছাদের ঘরে উঠতে উঠতে খুব ভালো লাগল তাঁর। ঘুমের কষ্টটা একেবারেই নেই। বেয়াড়া সব প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলেছিল অমল। তাই ঘুম হত না। বেচারা! দারিদ্র্য আর আদর্শবাদের ভূতে মানুষকে যে কী করে ফেলে! শর্মিলাকে সেই কথাই বললেন।

শর্মিলা আজ কী রকম সেজেছে। হলদে কালো পোষাক, কটা চুলে উদ্ধত খোঁপা। বাঘিনীর মতো।

ঘরে বসে শর্মিলা তালুকদার মাথা হেলিয়ে রাখল সোফায়। বলল—এবার সেই হতভাগ্য ছেলেটির কথা বলো।

—ব্যক্তিপূজার কেস আর কি।

—বলো। তোমার অপূর্ব ভাষায় বলো। জানোনা তোমার জন্যে আমি নতুন করে বাংলা শিখছি।

—বলছি।

বলে থামলেন তিনি। সামনের জানালায় একটা ক্যাকটাস। ঘন সবুজ। আঁকাবাঁকা। সতেজ। মুগ্ধ ও ঈষৎ ভয়ার্তভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন,

—ঐ কুৎসিত জিনিসটা সরাও!

বেয়ারা সরিয়ে নিল টবটা। এবার মুখ নিচু করে খোঁপা ঠিক করলেন শর্মিলা। তিনি বললেন,—

—কী বলছিলাম?

—কী বলছিলেন?

মানুষের মন জটিল। দুর্গম অরণ্যের মতোই দুর্ভেদ্য তার প্রবেশপথ। ঐ গাছটা দেখে ক্ষণিকের জন্য তাঁর বিভ্রম হয়েছিল। মনে হয়েছিল বুঝি-বা গাছটা অরণ্যের সাক্ষী, আর তাঁর মিথ্যাভাষণ সে ধরে ফেলল।

সে আত্মবিভ্রমকে তিরস্কার করলেন তিনি। স্পন্দিত হৃদয়কে শাসন করলেন। বললেন,

—বলছি। সেই দুর্ঘটনার কথা।

সত্যিটুকু ঢেকে সুন্দর ভাষায়, অননুকরণীয় ভঙ্গিতে চমৎকার করে তিনি বলতে শুরু করলেন।

শুনতে শুনতে শর্মিলা কাছে এলেন। শর্মিলার উদ্ধত বুকের লোভনীয় হাতছানি দেখতে দেখতে তাঁর গল্প বলাটা আরো সুন্দর হয়ে উঠল। তাঁর অসমান দাঁতের সারিতে হাসি ঝিলিক দিতে লাগল।

সে গল্পে অমল রইল না, তিনি রইলেন না—রইল শুধু সাজানো কেয়ারি করা ফুলের বাগানের মতো, গোছা গোছা কথার ফুলঝুরি। আবেগে রঙিন, উত্তাপে মোহনীয়।

প্রতিভার অন্ধ ভক্ত একটি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হতভাগ্য তরুণের শোচনীয় মৃত্যুর কথা তাঁর মুখে হয়ে দাঁড়াল চমৎকার একটা গল্প। সে গল্প শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে শর্মিলা আরো কাছে এলেন। বললেন,

—বলো, আরও বলো...

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তিনি, আর শর্মিলা শুনতে লাগল তাঁর কথা। এ ঘর নিরাপদ। এখানে কোনো ভয় নেই। এখানে সেই দিনটার কোনো সাক্ষী নেই—আকাশ, বাতাস, অরণ্য ও নদী—সব কিছুর উদারতা এ ঘর থেকে নির্বাসিত। এ ঘর মানুষের সৃষ্টি এক কৃত্রিম অরণ্য—এখানে মানুষ সভ্য পোষাক পরে বসে জানোয়ারের হৃদয় বুদ্ধি নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে লোভ ও কামনার সংঘাতে মাতে

এই নিরাপদ পরিবেশে নিজের গল্পটা নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করলেন তিনি। তাঁর চমৎকার গল্পটি সত্যি হয়ে উঠতে লাগল, আর এতদিনে যেন সত্যি সত্যি মরল অমল।

# দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুরবটের কাহিনী

১.

কাহিনীর প্রথম প্রস্তাবেই নায়ক দেওয়ানা।

আশ্চর্য ফকিরের মুখে এ কাহিনী খইমালা যখন প্রথম শোনে, তখন সে বালিকা মাত্র। গঙ্গাতীরে সোমবারের হাটে অনেক মানুষ আসে, অনেক বেসাতি। আনাজ ফলফলারি, দরজার কবাট, গোরুর গাড়ির চাকা। বারুইপুরের বেগুন বেচা মেয়েছেলেরা কোঁদল করে ও 'যে আমের ঝুড়ি ভরা বেগুন কেনে তারে আমি পান খেতে দিই' বলে হাতের বাউটি নাচায়।

গড়িয়ার এ হাটে মেলে না এমন জিনিস নেই। রাজপুরের আনারস, বাঁশদ্রোণীর গামছা কাপড়, এমন কি কুঁদঘাট থেকে মুসলমান ব্যাপারীরা বাঁশের ছাতা আনে। মগরাখালের বাওলী বেদেনীরা সুন্দরবনের গোলপাতা, মধু, হরিণের মাংস এনে বেচে যায়। কামডহরীর ব্যাপারীরা ছাগল, গাই, মহিষ বেচতে আসে। সোমে হাট, শুক্রে হাট, তবু ঠেলাঠেলির শেষ থাকে না। এমন জাঁকের হাট আর কোথাও নেই। অধিক কথা কি, দূর দূর বোড়াল, জগদ্দল, নিমসন্দী থেকে ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা নৌকো চড়ে আসেন ও নসীরাম কাগজীর কাছ হতে উৎকৃষ্ট তালপত্রের আঁটি, লোহার বালা, হুগলীর কলম কেনেন, সে কারণে নসীরামের বড় জাঁক। অবসর সময়ে সে চৌকিতে হেলান দিয়ে 'বঁধু সাধ রৈল মনে', বারুইপুরের কেতন ঘোষের বাঁধা গান গায়, আর ছেলেরা 'ও নসী দাদা' বলে যতই ঘিরে বেড়ে ধরুক, কখনও একখানি কাগজ তাদের দেয় না। নসীরামের দোকানে হুগলীর তুলোট কাগজ, ত্রিবেণীর বালি কাগজ ও হারেকষ কালি, বঁড়িশার কলম থাকে। 'আমীন গোমস্তা ভিন্ন কারে বেচি না হে', এই নসীরামের আর একটি জাঁক।

এ জাঁকের হাট সোমে শুক্রে বসে। তবু দেখে মনে হয় মেলা বসেছে, স্নানপর্বের মেলা। চাষী, ব্যাপারী, তাঁতি, কামার, কুমার, জেলে, মুচি, শাঁখারি, মনোহার-পসারি সবাই হাটতলায় ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে।

সর্বদা মানুষের হই চই-এ হট্টগোল ওঠে, যেন মাহেশের স্নানযাত্রা

অথবা কালিকাক্ষেত্রে দীপান্বিতার মেলা বসেছে, নয়ত বড় গঙ্গায় পিতৃপক্ষে শত সহস্র পৈতেধারী পুরুত, তর্পণেচ্ছু যুবক, বালক, বৃদ্ধদের মন্তর পড়াচ্ছে। হ্যাদে তালেব মিঞা কোথায় গেলে গো—নদী পেরোলে কড়ি দিলে না? —ও পণ্ডিত মশাই আপনার ছাতা পড়ে রৈল—ওগো তোমরা আমার মাসীকে দেখেছ? সাবি মুখপুড়ী গেলি কোতা, তোর পান ছাগলে খায় ইত্যাদি চিৎকার। ছেলের কান্না, তালপাতার ভেঁপুর পোঁ পোঁ শব্দ, গোরুর হাম্বা হাম্বা, ছাগলের ম্যা রব, মুড়ি-ভাজনীর সঙ্গে বাগানের মালীর ঝগড়া, হাট পেয়াদার সদম্ভ আস্ফালন 'ওগো আমার নাম দামু পেয়াদা, এ হাতে কোঁৎকার বাড়ি খেয়ে যে জেলের পো' বাপ না বলেছে সে জন মায়ের পেটে আছে' শোনা যাচ্ছে। জেলের ছেলে হাট-পেয়াদার হাতে বাবুদের তোলা হিসেবে বাটা মাছ দিচ্ছে বটে, কিন্তু দামু পেয়াদার পেছনে তাকে অতি মিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করছে।

কোন একজন জেলের ছেলে চেঁচিয়ে বলছে, 'সাঁঝের বেলা জেলে পাড়া দিয়ে হেঁটে সুমুন্দির বাড়ি যায় খ'ন, দেখে নেব।'

মেছুনীরা গলা তুলে দামু পেয়াদার চরিত্র যেমন, সে শালাজের হাতের পান-জল খাবার জন্যে ঘন ঘন ও-পাড়ায় হাঁটে, সেই জন্যেই মনের দুঃখে আজকাল পেয়াদার পরিবার রাতের বেলা ভাত রাঁধে না, মাটিতে পড়ে কাঁদে, এই সব দরকারি খবর হাটে ছড়াচ্ছে। এরই মাঝে মাঝে 'একগণ্ডা কড়িতে মাছ হয় না বাছা, গুগলি খাও গে', বলে কোন চাষী বউকে আপ্যায়িত করছে।

এরই মাঝে সদগোপ গিন্নিরা, যারা হাটের সন্নিধানে, গঙ্গার ঘাটে বাস ক'রে, নানাজাতের মানুষের নিয়ত আনাগোনা দেখে দেখে কালিকা-ক্ষেত্র, কালীঘাটের ঘাটপুরুতদের ঘরের ব্রাহ্মণীদের মত লজ্জা শরম হারিয়েছে, যাদের দেখে সনাতন দীঘড়ি নিঃশ্বাস ফেলে বলেন 'শওর নয়, শওরের বাতাস গায়ে লাগলেই মেয়েজাতের লজ্জা যায় গো।' তারা ধামায় মুড়ি মুড়কি ও পানখিলি নিয়ে হাটুরেদের বেচে বেড়াচ্ছে।

তাদের দেখে জোয়ান ব্যাপারীরা 'ভুবন মাসী, সঙ্গে জলপান থাকে, তবু তোমার দুটো কথা শোনবার জন্যে তোমার কাছ থেকে মুড়কি কিনে খাই। মুড়কিতে কি দাও গা, এমন মিষ্টি লাগে?' বলে ঠাট্টা করে।

অদূরে, গঙ্গাতীরে পবিত্র শ্মশান। শ্মশান থেকে হরিধ্বনি ওঠে, চিতার কাঠ ফট্‌ফট্‌ শব্দে ফাটে। শ্মশানের ভীষণ দৃশ্য দেখলে মন নিমেষে উদাস হয়। সনাতন দীঘড়ির কথায় বিশ্বাস আসে 'কিসের দাপে ভুবন কাঁপাও বাপ? ঐশ্বর্য? প্রতিপত্তি? কোম্পানীর পেস্কারি.পেয়ে ধরাকে সরা দেখছ? একমুটি খড় মুখে দিয়ে চিলুতে চড়িয়ে দিয়ে দেখলে বুঝবে শেষ শয্যেয় সবাই সমান। কি হেস্টিংসের মুন্সী, কি কুকুর ফেলা মুদ্দোফরাস ভিখিরীচরণ ডোম। দুজনকেই পুড়তে দেখেছি, সব জানি রে বাপ, নবকান্ত মিত্তির আর ভিখিরী ডোম। চিলুর ওপর দুজনই সমান। তাই বলি দাপ করো না।'

এ কথা বলে সনাতন দীঘড়ি গলা তুলে কর্কশ, অথচ তদ্‌গত কণ্ঠে 'কে হে কামিনী নীরদবরণী' গাইতে গাইতে কালীতলার মাঠ দিয়ে চলে যান। তাঁর গানে সর্বদা হাহাকার বাজে, যেমন হাহাকার পরিত্যক্ত দেবালয়ের দরজা ঝড়ের ঝাপটায় ধড়াস ধড়াস করে। সনাতম দীঘড়ির জীবন এক কর্কশ, নিঃসঙ্গ ক্রন্দন মাত্র।

গঙ্গার ও তীরে শ্মশান রইলে কি হয়, এদিকে হাটে বড় জাঁক। এ হাটে বাউল মন ভ্রমরার গান গায়, হাট-পেয়াদারা ঢোল-ডগর বাজিয়ে 'বেদে এসেছে, ধরে নে' যাবে, ছেলের মায়েরা সাবোধানে থেক হে!' বলে শোহরৎ দেয়। কালীঘাট, বঁড়িশা ও সুতোনুটির কুটনীরা নৌকো চড়ে এসে পান-সুপারি কিনবার ছলে কোন মেয়েটা সুন্দরী, কেমন করে চুরি করি, তার সন্ধানে থাকে।

এই হাটে প্রতিদিন আশ্চর্য ফকির তার পুথি পড়ে। আশ্চর্য ফকিরের চোখে পরকলা, গায়ে মলিন জামা, পায়ে নারকেল দড়ি বাঁধা চটি। সে হাটের অদূরে তেঁতুল গাছের নিচে বসে। তার পুঁথি পাঠের স্বর অতি মধুর, বাগমারীর লোনাজলার মাছের ব্যাপারী সাধু সাউ, দক্ষিণের বন-বাদার বেদেনীরা, এই সব দেশ-দেশের লোক মোহিত হয়। সাধু সাউ-এর চরণাশ্রিতা গোলাপী আশ্চর্য ফকিরের কাছে প্রেম ও পরিণয়ের বিবিধ কিচ্ছা শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে খোঁপা খুলে ফেলে, আবার বাঁধে, আবার খোলে ও ঘন ঘন গরম নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'তোমার পাঠ শুনে আমার কলজের ভেতরটা যেন আছাড়ি-পিছাড়ি করে। কেন করে বলতে পার?'

আশ্চর্য চুপ করে থাকে। সহসা উত্তর দেয় 'না। বাগমারীর লোনা-জলের কোনো নির্লজ্জ যুবতীর প্রশ্নের জবাব দিতে এখনো সে দুবার চিন্তা

করে। যদিও আশ্চর্য এখন বৃদ্ধ, লোলদেহ, গলার স্বরের লাবণ্য ছাড়া তার দেহের সর্বত্রই জরা এসে জেঁকে বসেছে।

তবু আশ্চর্য চুপ করে থাকে। যৌবনে তার চেহারা বড় সুন্দর ছিল, রোদ লাগলে ডালিম ফেটে পড়ত। বাগমারীর লোনাজলার এক যুবতীর রূপ দেখে আশ্চর্য ফকির সাজানো সংসারে লাথি মেরে চুঁচুড়া পালিয়েছিল। ফিরে এসে তার নিকার বিবি, সাধের সন্তান ও ঘরদোর কিছুই দেখতে পায়নি। আজ পঞ্চাশ বছর বাদেও সে কথা মনে করলে তার দুঃখ হয়, কেন না এই খোদাতালার সংসারে এসে সে কিছুই হাতে পেল না, সুখ শান্তি, জোয়ান বেটার রোজগারের অন্ন। হা খোদাতালা, তুমি সামান্য পিঁপড়াটাকেও দোসর জুটিয়ে দেছ, শুধু আশ্চর্যরে একলা আখলে—এ তোমার কেমন বিচার?

আশ্চর্যের বুকের ভেতর এই বিলাপ আছাড়ি-পিছাড়ি করে। কেননা আশ্চর্যের পেছনে শুধু আফসোস আর হা-হুতাশ, সামনের পথ বড় অন্ধকার, মহীশুরের নবাবের বেটাদের মসজিদের চত্বরের এক কোণে পড়ে পড়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যু। সে মৃত্যুর কথা ভবলেই আশ্চর্য ভয় পায়। কেননা সে জানে অন্তিমে কারো খোদার দোয়া টোয়া মেলে না।

যেমন জন্মকালে তেমন অন্তিমে, মানুষ বড় একলা, অসহায়, যে দেহ নিয়ে এত জাঁক, সে দেহ অবধি মাটির নিচে পড়ে থাকলে সত্বর মাটি হয়।

এসব ভাবনায় মাঝে মাঝে আশ্চর্য অস্থির হয়, তখন সে দানী মোড়লের ফকির-পাটে বাঁধা শৈলী গয়লানীর মত হো হো শব্দে কাঁদে। তার কান্না শুনে কুকুর চমকায়। দানী মোড়লের ফকির-পাটে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, লোহার শলা ছেঁকা দিয়ে পাগল সারানো হয়। শৈলীর পাগলামি বারো মেসে। তাকে চৈত্র বৈশাখে ফকির পাটে আনা হয়।

এই আশ্চর্যের কাছে, এক বর্ষার হাটবারে ব্রাহ্মণের মেয়ে খইমালা ও পাটনীর ছেলে গোলক সেই আশ্চর্য 'কিচ্ছা' শুনেছিল।

সেদিন ঘনঘোর বর্ষা। গঙ্গার কানায় কানায় জল। বাঁশদ্রোণী ও নাকতলার ঘাট জনশূন্য। হাটে ব্যাপারী সামান্যই। শ্মশানে মড়া ফেলে রেখে শবযাত্রীরা ছাতা মাথায় গাছতলায়। ঘাটে যাত্রী নেই, নৌকো কেউ চড়ে নি। খইমালা তার মায়ের হয়ে ভুবন মাসীর কাছে মুড়ির কড়ি

চাইতে এসেছিল। তার মা লুকিয়ে মুড়ি ভাজে, লুকিয়ে ভুবন মাসীকে যোগান দেয়। নতুবা মা-মেয়ের দিনান্তে অন্ন জোটে না।

অন্ন না জুটলে কী হবে? খইমালার অঙ্গে অঙ্গে রূপ। তাই তার মা খইমালাকে কড়ির তাগাদায় হাটে আসতে দেয় না। তার একটি কারণ বেদেনীর ভয়। ওরা মেয়েসন্তান দেখলে নিমিষে চুরি করে, বাঁদী হাটে বেচে আসে।

আর একটি কারণ সমাজের ভয়। সমাজ মেয়েছেলেকে জেয়াদা শাস্তি দেয় মা, শিশু বলে দুর্নাম দিতে রেয়াৎ করে না। খইমালার মা সনিঃশ্বাসে বলে, 'দুখের মেয়েগুলোকে জ্যান্ত পোড়ায় মা, দয়া করে না।'

আজ বড়ো বিপদের দিন।

খইমালার মা আজ কতদিন ধরে জ্বরে কাতর। ব্যামোয় অস্থির, ঢলে পড়ছে। অথচ কড়ি কয়টি না পেলে নিজে কী খায়, সন্তানকে কী দেয়। সাত পাঁচ ভেবে সে খইমালাকে হাটে পাঠিয়ে দিল। কাতরে বলল, 'ত্বরায় আসিস মাগো, হাটে বেদেনীর ভয়।'

কিন্তু আজ ঘনঘোর বর্ষা। দুপুর না গড়াতেই মেঘে রাতের মত আঁধার করল। আকাশে বিজলি চড়াৎ করে। যতদূর চোখে পড়ে শুধু আঁধার আর বৃষ্টি। এমন দিনে হাটই বা কই, ভুবন মাসী কোথা? এমন দিনে অতি বড় দুঃখীও ঘরের বার হয় না, তাই পথঘাট জনশূন্য।

সভয়ে খইমালা ত্বরায় তেঁতুল গাছের তলায় গেল। নিয়ত বলে বলে আশ্চর্যকে অন্য কেউ না, সাধু সাউ-এর চরণাশ্রিতা গোলাপী, একটি গোরুর গাড়ির ছই এনে খুঁটির ওপর বসিয়ে মাচা বেঁধে দিয়েছে।

খইমালা দেখল সেই মাচার ওপর আশ্চর্য ফকির, গোলাপী, সনাতন দীঘড়ি ও দানী মোড়ল ঠেসাঠেসি করে বসে। নিচে, মাচার নিচে পাটনীর ছেলে গোলক। খইমালাকে দেখে গোলকের চোখমুখে স্বস্তি।

'কৈতরী, তোরে দেবার জন্যে ভুবন মাসী কড়ি গুনে দিয়েছে আমার কাছে।'

এখন গোলকের 'কৈতরী' সম্বোধনে খইমালার বড়ো রাগ হল। বৈষ্ণব ঘাটের কাছে বৈষ্ণব পাটে, ঠাকুরদালানে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা দেখতে সে বড়ো ভালবাসে তাই গোলক তাকে আড়ালে বলে 'কৈতরী', কিন্তু এ নাম প্রচার দেবার নয়, মা বলে, 'মেয়েছেলের দুর্নাম নিমেষে হয়,' খইমালা গোলকের দিকে

না তাকিয়ে মাচার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও দু'হাত তুলে বলল, 'আশ্চর্য, আমাকে মাচায় নেও।'

মাচায় বসে খইমালা পা দুলিয়ে মল থেকে জলকাদা ঝরাল। তারপর বলল, 'আশ্চর্য, আজ তুমি পুথি পড় না?'

'না বাছা, আজ বড় আন্ধার, আমার চোখ চলে না।'

'পুথি না পড়লে তুমি মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার খাবে কী?'

'খোদা যা মাপায় দিদি।'

এতক্ষণে গোলাপী মুখ খুলল। সে চুপ করে বসেছিল, আলগোছে, ছোঁয়া বাঁচিয়ে। সনাতন দীঘড়ি ও দানী মণ্ডল, এদের সান্নিধ্যে বসে সে বড় লজ্জা পাচ্ছিল। তার নাকে ফাঁদি নথ ও হাতে জশম। গোলাপী 'কড়ে রাঁড়' অবস্থা থেকে খানিক পেটের দায়ে, খানিক অভ্যাসক্রমে বহুবল্লভা হয়েছিল, এখন যদিও সাধু সাউ, বাগমারীর লোনা ভেড়ির উৎকল দেশীয় মাছের ব্যাপারীর কৃপায় তার অন্য কোনো অভাব নেই, এবং অন্যেরা তাকে ধিক্কার দিলেও নিজেকে সে পাপী মনে করে না, তবু, মাঝে মাঝে, নির্জনে, সাধু সন্নিধানে, অথবা শ্মশান সামীপ্যে এলে তার মন কাতর হয়। 'কত ভাল জেতের ছেলের জাত খেয়েছি গা, এমন কি বামনী সেজে বাউটির লোভে বামুনের পোর জাত মেরেছি। ধর্মে কি সৈবে?' মনে মনে সে নিজের কাছেই জানতে চায়!

'দুটো কথা জানতে চাইব, এমন একটা মানুষ নেই,' গোলাপী নিজেকেই বলে ও মাঝে মাঝে নিজের দুঃখে নিজেই কাঁদে। পাপজীবনের ফলে সে কোথায় যাবে, স্বর্গে না নরকে, অগ্নিকুণ্ডে, না যমদূতেরা ডাঙশ মারতে মারতে তার কোমল শরীর কাঁটার ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে, এ কথা বলে দেয় কে? এসব সৎ কথা একমাত্র তারাই বলতে পারে যাদের কোনো স্বার্থ নেই।...বেশ্যার কাছে বিনাস্বার্থে কেউ আসে না।

সকলেই, দুষ্ট, শান্ত, গৃহী, বেনে, মুদী, রাজকর্মচারী, কসাই। কোম্পানির ফিরিঙ্গি, সৎ, ক্রূর, স্নেহশীল, খল, সব রকম মানুষই, বেশ্যার চৌকাঠ পেরোলেই সব ভুলে গিয়ে মজা লুটতে চায়। তারপর তারাই বেশ্যাকে দোষারোপ করে। তাহলে গোলাপীকে দুটো সৎ কথা কে বলে দেবে?

এখন, এই নির্জন বর্ষার মধ্যাহ্নে, আশ্চর্য ফকিরের ছাউনিতে কিসের আশায় এসেছিল গোলাপী কে বলবে! কিন্তু দানী মোড়ল ও সনাতন দীঘড়ি,

এই দুই জনের সামীপ্যে বসে, ওপারে শ্মশানে শায়িত মৃতদেহের অসহায় পড়ে থাকা দেখে দেখে তার ভেতরে অস্বস্তি হল। এরা সবাই চলে যাক, তার আশ্চর্যকে অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু, এরা সকলেই অন্য পৃথিবীর মানুষ। দানী মোড়ল স্বপ্নাদ্য নির্দেশ পেয়ে এক মুষ্টি চাল ও পাঁচটি সুপারীর বিনিময়ে পাগল সারায়। যুবতী স্ত্রীলোককে লোহার বালা পুড়িয়ে ছেঁকা দিতে সে এতটুকু দয়ামায়া অনুভব করে না। ওষুধ দেয়, যে কারণে সংযমী। গোলাপীর মায়া তার উপর খাটে না।

সনাতন দীঘড়ি সাধারণের বাইরে, অন্য জগতের মানুষ। পথে কলুর ছেলের সহসা অর্থাগমে মদবৃদ্ধি হওয়া, দম্ভিত চলাফেরা দেখে তিনি যখন বলেন 'কিসের দাপে ভুবন কাঁপাও বাপ ? চিলুতে যখন আমকাঠের তক্তায় শোবে, মুখে প্যাকাটি গুঁজে আগুনের তাতে দেহ ফুলে ফুলে ফাটবে তখন এ দাপ কারে দিয়ে যাবে'।

তখনও যেমন, আবার 'মা গো, দেখ যেয়ে বাবা আবার শ্মশানে লোটে কেমন,' গাইতে গাইতে যখন বাঁশদ্রোণীর পেছনের ভীষণ জঙ্গলের পথে চলে যান তখনও তেমনিই বোঝা যায়, এ বিশ্বসংসারে সনাতন বড় নিঃসঙ্গ। এমন মানুষের ওপর গোলাপীর মায়া খাটে না।

আশ্চর্য সংসারের বাইরে। এক জরাজীর্ণ দুঃখী বৃদ্ধ, মহীশূরের নবাবের বেটাদের মসজিদের চত্বরে ও যে একদিন মরবে, এ ছাড়া তার দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ নেই।

আর মাচার নিচে গোলক, পাটনীর ছেলে। নিয়ত নদী ও জলের সান্নিধ্যে থাকে বলে তার কিশোর চাহনি বড় নিষ্পাপ ও উদাস। বৃদ্ধ ফকির আর দরিদ্র বালক, এরাও তার মোহিনী মায়ার আওতার বাইরে।

চারজন পুরুষ, চারজনের কেউই তার মায়ায় বশীভূত হবার নয়, এই জন্যে গোলাপীর ভেতরে উষ্মা জমছিল, বেশ্যা স্বভাব মাথা নাড়া দিচ্ছিল।

এখন খইমালার নিষ্পাপ প্রশ্ন, 'পুথি না পড়লে তুমি খাবে কি ?' শুনে সে ফোঁস করে উঠল।

'আলো আমার ফকিরসোয়াগী। পুথি পড়লে তোর কী রে ? তুই উয়াকে খেতে দিবি ?'

গোলাপীর কথা শুনে খইমালা বড়ই সঙ্কুচিত হল। কড়া কথা সে কচিৎ শোনে। যখন শোনে, তখনই পালায়। এখন সে চুপ করে রইল।

গোলাপী ভাবল এই……দুঃখী বালিকাও তাকে ঘেন্না করে।

'জবাব দিস না, বড় দাপ যে!'

'গোলাপী, ও তোমায় কিছু বলেনি।'

আশ্চর্য ফকীরের এই ভীরু, বিনীত মিনতি শুনে সহসা গোলাপীর কী মনে হল কে জানে। সে বলল, 'আমি শুনব, তুমি পুথি পড়।'

এখন আশ্চর্য লজ্জা পেল, 'আমার এ পুথি গোলাপী, এদের সামনে পড়তে পারি না।

'কেন?' দানী মণ্ডলের গলা অতি কর্কশ।

'আজ ভাল পুথি নাই।'

'কেন?'

'দীঘড়ি মহাশয়, ভাল পুথি জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমার চোখ চলে না। এখন কে আমায় পুথিটুকু নকল করে দেয়?'

খইমালার বলতে ইচ্ছে হল লিখতে জানলে সে নকল করে দিত। কিন্তু মুখ খুলতে ভয় হল।

'বিষ্টি কম। চলেন দীঘড়ি ঠাকুর।'

দানী মণ্ডল ছাতা খুলে ধরল ও মাচা থেকে সনাতন দীঘড়িকে পাশে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

'আশ্চর্য, পুথি পড়।' গোলাপী এতক্ষণে পা মেলে বসল, 'তোমায় দেব বলে ঘরে সিধা সাজিয়ে রেখেছি, এখন চল, আমার গোহালে বসে ভাত রাঁধবে।'

কৃতজ্ঞ আশ্চর্য পুথি খুলে ধরল ও পড়ল 'কাহিনীর প্রথম প্রস্তাবে নায়ক দেওয়ানা।'

'দেওয়ানা মানে কি?'

'দেওয়ানা মানে পাগল।'

খইমালা এ কথা শুনে বড়ই আশ্চর্য হল। সে আরো কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কিন্তু গোলাপী বড়ই বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'এত কথা শুধাস কেন, খইমালা? ঘরে যা না। ঘরে গিয়ে দেখ্‌গা তোর মা কত রাগ করে বসে আছে।'

এতক্ষণে বালিকার মায় কথা মনে পড়ল। মা তাকে আসতে মানা

করেছিল। তারপর সত্বর যেতে বলেছিল, এ হাটে বেদেনী'র ভয়।

দূরে কারা ডুগডুগি বাজায়। সুন্দরবনের সাপুড়িয়া অথবা কালিকা-ক্ষেত্রের বাজীকর। খইমালা সাপের খেলা, বাঁদর নাচ দেখতে কত ভালবাসে, কিন্তু এখন তার সহসা মনে হল এ নিশ্চয় বেদেনীদের ডুগডুগি। বেদেনীরা জাদু জানে, তারা একা, অসহায় খইমালার সন্ধান পেলে সত্বর আসবে। মা বলে, 'ওরা বা'য়ের আগে বাতাসের মুখে ছুটতে জানে। মন্ত্রবলে পৃথিবী ওদের বশ।' আজ হাট পেয়াদা নেই, কে ঢোল-ডগর-শোহরৎ জানিয়ে বলবে 'ছেলের মা সাবোধান!'

খইমালা বলল, 'আশ্চর্য, আমি যাই।'

সে নেমে এসে ছুটতে লাগল। কাদায় পা চলে না। বৃষ্টির জল এখনো কলকল শব্দে নালা দিয়ে বয়ে যায়। ঐ জলে, খইমালা জানে, পুঁটি, ময়া, শোল মাছ ভাসে। সে-ও মাছ ধরতে পারে। তবে, মাছ ধরা ছোটলোকের খেলা, ব্রাহ্মণের মেয়ে, হলে বা দুঃস্থ, অনাথ, হতদরিদ্র, কখনও মাছ ধরে না। সময় থাকলে খইমালা দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে মাছের খেলা দেখত।

সময় নেই, সময় কোথায়? এতক্ষণ মেঘে মেঘে বেলা চলে গিয়েছে। সূর্যের দাঁড়াবার সময় নেই, এখন সূর্য পশ্চিমে। সহসা, মেঘ ভেঙে আকাশের কোণে কোণে গলগল করে লাল আলো উছলে পড়ল। সন্ধ্যার সূর্যের দৃষ্টি ঘোলাটে, দেখলে ভয় হয়। মতি শেখের ঘোড়ার কথা খইমালার মনে পড়ল। মতি শেখের ঘোড়া গাড়িসুদ্ধ খানায় পড়ে জখম হলে, আর বাঁচবে না জেনে, মুচিরা এসে জীয়ন্তে চামড়া টানবে জেনে, 'ওরে, এমন নিদয় কাজ কত্তে আমার কলজা ফাট্টে যায়' বলে কাঁদতে কাঁদতে মতি শেখ সে ঘোড়াকে জবাই করেছিল। মানুষ সেজন্য তাকে আজও নির্দয় বলে, কিন্তু পোষা জীবের অমন কষ্ট কে দেখতে পারে? ঘোড়ার চোখের দৃষ্টি নিমেষে ঘোলাটে হয়েছিল, গলার সফেন রক্ত অমনি গলগলিয়ে চতুর্দিকে বয়ে গিয়েছিল।

এখন আকাশে যেন গ্রহণের সন্ধ্যা। খইমালা তাড়াতাড়ি ছুটে চলল। কিন্তু পেছনে কে আসে?

'মা গো!' আর্তস্বরে বলে খইমালা ছুটে যায়। নির্জন পথ। আবার বিষ্টি নামে। খইমালার পায়ে মল বাজে। আর কোনো শব্দ নেই।

'খইমালা, ভয় কিসের ?'

গোলক নিমেষে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। 'কৈতরী, তুই এমন ছুটিস ?'

তারা দুজনেই এখন ঠাকুরবটের তলে।

ঠাকুরবটের সামনে প্রশস্ত দিঘি। এ ঠাকুরদিঘির জলের এমনিতে কূলকিনারা নেই। এখন ভরা বর্ষায়, দিঘির বুকে ঢেউ।

'কৈতরী, তুই ছুটলি কেন ?'

'তোমার তাতে কি ?' খইমালার রাগ হয়েছে।

'বাপো রে! ফোঁস কেউটে যে।'

'গোলক, গাল দিয়ে কথা বলো না।'

গোলক গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছে বলল, 'এই যে তোর কড়ি।'

সিঁদুরবর্ণ সুন্দর কড়ি। আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে খইমালা বলল, 'আর দেয়নি ?'

'না।'

'এখন সন্ধে। কড়ি নিয়ে গেলে আমাকে চাল দেবে কে ?'

গোলক হাসল। বলল, 'চাল দেবে কে! আশ্চর্যের কাছে পুঁথি শোনবার সময়ে মনে ছিল না ?'

'তুই শুনিসনি ?'

'শুনলাম তো কী হল। আমরা শরীর খাটিয়ে খাই, আমাদের ঘরে চাল থাকে। যখন যাব পান্তাভাত পাব। তোদের বামনাই যত, দৈন্য তত!'

এ কথা সত্যি। এখন হেস্টিংস সাহেব কোম্পানির লাট। ওদিকে, কোথায় কলকাতায় শহর দিনে দিনে বড়ো হচ্ছে। তাই মানুষ জন, আসা যাওয়া, কেনা বেচা, লেন দেন, কোনো কিছুর অন্ত নেই। ঘন ঘন মানুষ এখন এই গঙ্গা দিয়ে, বড়ো গঙ্গা বেয়ে ওদিকে যায়। পয়সা এখন গোলকদের হাতে। পাটনীরা বামুনদের চেয়ে ভাল খায় পরে। দক্ষিণের লোনাবাদা থেকে মাছ, ডিম, হরিণের মাংস, মধু, বাড়ি করবার গোলপাতা, নৌকোয় এরা বাইছে আর বাইছে। শহরে সব দরকার হয়। সনাতন দীঘড়ি বলেন, 'এই তাঁতি, তামলী, পাটনীরা কালে জুতো পায়ে হাঁটবে, কিসের দাপে ভুবন কাঁপাও বাপ ?'

তবু, গোলকের কথায় খইমালার মনে কষ্ট হল, ভাতের কথায়। কতদিন সে গরম ভাতে কাঁঠালবীচি পোড়া খায় না।

গোলকের সেদিকে লক্ষ নেই।

'তুই শুনলি না কৈতরী, আমি আশ্চর্যের পুঁথি আরো শুনলাম।'

খইমালা পায়ে পায়ে ঠাকুরবটের ঝুরি ধরে ধরে পথে নামল।

'প্রথমে দেওয়ানা, পরে মহাসুখ। তখন রাজপুত্র সোনার পাটে বসল।'

'আর কী শুনলে?'

'আর শুনিনি। গোলাপী মাসী আশ্চর্যের কাছে ঘোমটা টেনে বসে কত কথা বলছে, আমাকে তাড়িয়ে দিল।'

'এবার আমি যাই।'

এখন খইমালার আঁচলে কড়ি বাঁধা। মা যদি তাকে মারতে কোনোমতে মুড়ি নাড়বার ছোটো খুন্তে ঝাঁটাখানা তোলে, সে নিমেষে মার হাত চেপে ধরতে পারে। বলতে পারে, 'মার কেন? আমার আঁচলে তোমার কড়ি আছে মা! আমি কি খালি হাতে এসেছি?'

এমনি সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে খইমালা বাড়িতে পৌঁছল।

কিন্তু কী আশ্চর্য। আজ তাদের ঘরে পিদিম, মার মুখে হাসি, পরনে তোলা কাপড়খানা, মাথায় কাপড়। আজ তাদের ঘরে অতিথি কুটুম্ব। খইমালা ত্রস্ত হয়ে দাঁড়াল।

'এই মেয়ে?' বৃদ্ধের গলা কী ভীষণ, শুনলে বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ে কেন?

'এই মেয়ে।'

'সামনে আয়।'

'সামনে আয়। গুরুবাবাকে পেন্নাম কর্।'

মায়ের গুরুবাবার চেহারা অতি ভয়ানক। ঘন কৃষ্ণ রঙ। চুলগুলো শণের নুড়ি, ঠোঁটে খেতী। চকমকি ঠুকে তিনি তামাক ধরালেন, মুখ তুললেন। চোখের চাহনি বড় উজ্জ্বল। এমন চোখ দেখলে অতি বড় দর্পীও থতমত খায়। খইমালা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল, যেন বলির পশু।

'শুক্রবারই শুভদিন। সকালে মেয়েকে উপোস করিয়ে রেখো। ঐ যা বললাম, একখানা কোরা কাপড়, ক'টি এয়োডালা, ভিক্ষে-সিক্ষের বিয়ে, বলতে আমি বাকি রাখিনি কিছু। তবে হ্যাঁ, পাঁচজনকে সাক্ষী রেখে দলিলটি দিতে হবে।'

'বাবা, তুমি দেবতা, সব জানছ। দলিল করে দিলে জামাই আমায় ঝাঁটা মেরে তাড়াবে না তো?'

'এ কথার অর্থ কী মেয়ে?'

গুরুবাবা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর মাথার দু'ধারে শণের নুড়ি নড়তে লাগল।

'সে কি তোমার এই তিনখানা নারকেল গাছ, এই ছোনের ঘর আর জমিটুকুর পরোয়া করে? অ্যাঁ? সে দখল নিতে যাবে?'

'দো'ই বাবা!' খইমালার মা গলায় আঁচল দিল।

'সে আমার কাছে ঋণবদ্ধ। ভিটের পাকা ঘর তুলবে এই জন্য এবার বিয়ে করতে বেরুচ্ছে। তার যা টাকার দরকার তা বোড়াল থেকেই পাবে। আমি বলেছি, তাই তোমার মেয়েকে উদ্ধার করতে রাজি হয়েছে। আমাকে অবিশ্বাস, কেমন? এই জন্যেই বলে ভিখিরির ভালো করতে নেই।'

'না বাবা গো, তুমি যা বলেছ তা আমার দিকে চেয়ে। কিন্তু ও আমার দুধের মেয়ে, দুধদাঁত এখনো সব পড়েনি, ছ'বছুরে মেয়ে, তাই ডরাই। নইলে যা বলছ তা তো ভালো।'

'তাই ডরাই! কেন ডরাই?'

গুরুবাবার মুখ থেকে গালাগালি বেরুতে লাগল। 'মেয়ে জন্মাল যখন, নকুড় অকালে মো'ল, তখন মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলনি কেন? মেয়ে সোয়াগী? আমার ছ'বছুরে মেয়েছেলেতে কী করে? সগ্‌গে সলতে দেয়? ছ'বছুরে গাই হলে দুধ দেয়, ঘোড়া হলে গাড়ি টানে। মেয়েতে কী করে?'

এখন, খইমালার মা দেখল, গুরুবাবাটি বিরূপ হলে তার সকল দিক যায়। মেয়েছেলের মা হয়েছে, সেই মেয়েকে বড় করেছে। এ পৃথিবীতে সে মহাপাপী। এখন পথের বেঙ-বেঙানী লাথি মারলে সইতে হবে, মেয়ের মা হওয়ার মতো মহাপাপ এ সংসারে নেই।

তাই সে 'বাবা গো!' বলে গুরুবাবার পা চেপে ধরল। ঘরের মেঝের একটি জায়গায় গজাল পোঁতা, স্বামী নকুড়দাস মরলে প্রতিবেশীরা পুঁতেছিল। সেটির ওপর মাথা ঠুকে, রক্ত বের করে সে ডুকরে কেঁদে বলল, 'তুমি বিরূপ হলে আমি মাথা ছেঁচে আত্মঘাতী হব গো!'

খইমালার মার চোখের জলে পা দুখানি ভিজলে তবে গুরুবাবা সন্তুষ্ট হলেন।

নকুড়দাসের বিধবা উনোন ধরাতে গেল। গুরুবাবাটি ক্রোধী হলেও সেবা করেন বিস্তর। মেয়েকে বলল, তুই কাপড় ছেড়ে জল চাপা, আমি দেখি কী জোগাড় করতে পারি।'

এই গুরুবাবার সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক অতি বিচিত্র।

ইনি মায়ের গুরুও বটেন, জন্মদাতা পিতাও বটেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর বিয়োগের পর তাঁর বড়ই চিত্তবিকার হয়েছিল। তখনই গিয়ে সন্নেসী ধরেছিলেন ও চেলা হতে চেষ্টা করেছিলেন। সন্ন্যাসী যখন প্রয়াগে কল্পবাস করবেন বলে রওনা হচ্ছেন তখন কেঁদে বলেছিলেন, 'বাবা গো, আমার আর সংসারে ঢুকতে ইচ্ছে যাচ্ছে না। আমি আর ও গোয়ালে ঢুকব না।'

সন্ন্যাসী স্বল্পদিনেই ওঁর সংসারে ঘোর আসক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, সন্ন্যাসী হতে হবে না, সংসারে সকলকে মন্তর দে।'

'আমি মন্তর দিলে ওরা নেবে কেন!'

'নেবে, নেবে। আজকাল ত সত্যযুগ নেই রে বাপ, যে সাধু-সন্নেসী হাওয়া খেয়ে থাকবে? এখন সন্নেসী সাধু ধরে মন্তর নিতে গেলে গেরস্তের জেয়াদা খরচ। অথচ গুরুমন্তরটি না নিলে চলে না, উটি অবশ্য কাজ। তাই বলি, তুই নিজের মেয়েদের মন্তর দিয়ে কাজ শুরু কর্। ক্রমে সবাই তোকে মানবে। তবে হ্যাঁ এরপর থেকে আর সংসারের আঠা তেমন করে গায়ে মাখবি না। মেয়ে হোক, নাতি হোক, কেউ যেন বাপ বলে, দাদু বলে না ডাকে।'

পূর্বপ্রেমের সম্পর্ক গুরুবাবা এমন করে তুলে দিলেন যে এখন মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদের সংসারজ্বালায় দগ্ধাতে দেখলেও কখনো 'আহা' কথাটি অপব্যয় করেন না। বরঞ্চ বুকে হাত ঠুকে বলেন, 'এ কবুতর কা কলিজা নয় হে, পাষাণে বুক বেঁধে তবে গেরুয়া ধরেছি। এইত তারা—আমার মেজমেয়ের বুক থেকে হাসতে হাসতে মরা ছেলে নিয়ে দাহ করতে দিলাম। সামান্যে কাতর হলে কি আমার চলে?'

এখন, খইমালার মা রান্নার জোগাড়ে যায় দেখে তিনি চিৎকার করে বললেন, 'অন্ন আমি সেবা করি না। মিষ্টান্ন আর দুধ হলেই চলবে।'

এই বর্ষার দুর্যোগ রাতে, রোগশীর্ণ শরীরে হতভাগিনী, পরান্ন পালিতা বিধবা দুধ মিষ্টান্ন কোথায় পাবে তা ভেবে তাঁর মন কিছুমাত্র বিচলিত হল না।

দুঃখের বালিকা খইমালাকে অকূলে ভাসাতে এসেছেন বলে তাঁর মনে

এতটুকু দয়া হল না। তাঁর সন্ন্যাসধর্মে তবে কি দয়া নেই, মায়া নেই? শুধু রুক্ষ, ভয়াল উদাসীনতা?

২.

বর্ষার ভয়ঙ্কর রাতে দুঃখিনী নকুড়দাসের বিধবা 'জোগাড় করে আনি' বলে ঘর থেকে ফাঁক করে বেরুল বটে, কিন্তু পথে দাঁড়িয়ে নিমেষে বুঝল সে কত নিরুপায়।

আকাশের মুখে মেঘের ঝাঁপ। ঐ মেঘ সব অলৌকিক, অশরীরী প্রাণীর মতো ভয়ানক আকার ধারণ করে ধেয়ে যাচ্ছে। কোতোয়ালি মাহুত যেমন করে হাতির মাথায় ডাঙশ মারে তেমনি ভীমবেগে মারতে মারতে পুবে বাতাস মেঘশরীর অতিকায় জন্তুদের কোথায় যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের নীরব ও ভয়ঙ্কর হাসিতে পথঘাট উদ্ভাসিত।

এমন রাতে আকাশের মুখে মেঘের ঝাঁপ। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ। বৈষ্ণবঘাট অতি বর্ধিষ্ণু পল্লী, কিন্তু দুর্যোগের রাতে দরজা খুলে রাখে কে? ওদিকে হাটতলার কাছে কিছু দোকানপাট আছে বটে, কিন্তু সুন্দরবনের বেদেনী, কালিকাক্ষেত্রের তীর্থযাত্রীদের ধনসম্পদ লুণ্ঠক মলঙ্গী যাযাবররা এমন সময়ে মদ খেয়ে বড়ই হল্লা করে ও 'আমরা কোম্পানির কুটুম। কোম্পানি মালের পয়সা দিবেক।' বলে দোকান থেকে মাল লুটে লোফালুফি করে।

সেই ভয়ে দোকানিরা সত্বর ঝাঁপ টানে ও নেহাৎ শ্মশানযাত্রীরা এসে যখন ঝাঁপ ঠেলাঠেলি করে, তখন খোলে। রাতেবিরেতে শ্মশান-যাত্রীরা মড়া পোড়ানোর কাজকে ছেঁড়া ঝামেলা মনে করে ও খানিক প্রেতভয়ে, খানিক বিরক্তি চাপবার জন্যে ঘন ঘন গাঁজায় দম মারে। তারপর তারা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-রহিত হয় ও দোকানিদের ঝাঁপ ঠেলে বলে, শীগগির জলপান দাও। তামাক চকমকি দাও, নইলে তোমার ঝাঁপে আগুন দিয়ে তোমায় বেগুনপোড়া করব।'

সেই ভয়ে দোকানিরা তাদের ঝাঁপ খোলে। আজ শ্মশানযাত্রী নেই, শ্মশানে পুবালি বাতাসে তীব্র হাহাকারে মড়ার মাথা নিয়ে বাতাস গেণ্ডুয়া খেলে, কোন্ দোকানি এখন নকুড়দাসের বিধবার জন্যে ঝাঁপ খুলে বসে থাকবে?

কিন্তু শীঘ্র আহার নিয়ে যেতে না পারলে গুরুবাবা অভিশাপ দেবে, খইমালার মা এতক্ষণে বুঝল সে যদি কোনো প্রত্যাশায় পথে বার হয়ে থাকে, সে প্রত্যাশা পূরণ অসম্ভব। দেবের দানবের সাধ্য নয়। এ ঘোর কলিকাল। কলিদেবতার যুগ, কোম্পানির বড় রব্‌রবা। এ যুগে হেস্টিংস কোম্পানির লাট, বিলেত থেকে ময়দানব এসে অট্টালিকা তৈরি করছে। এ যুগে দেবতাদের শক্তি খর্ব।

দেবতাদের শক্তি নেই, মানুষের মনে দয়ামায়া নেই, ঘোর কলি, তার ওপরে বর্ষার দাপ বড় বেশি। খইমালার মা, আপনা থেকেই বুঝল, বিপদে তার পাশে কেউ নেই। সে একলা। নিজেকে একলা জেনে যে ভীমবলে অবস্থার সঙ্গে যুঝবে তার সে শক্তি কোথায়? সে অনাথা, বিধবা, তার খইমালা তার এক সন্তান, তাই দেহ টসকায়নি। সেও আর এক ভয়। 'মেয়ে কোথায় থাকবে মনে করে তখন অস্থির হলেম, এখন দেখছি দেহখানা চিতায় দিলেই ভাল করতেম'—সে বিড় বিড় করে বলল, 'ও মা গো!' আর্তনাদে সহসা চমকাল। অদূরে চলমান মূর্তি, তাকে দেখে হাত তোলে কেন?

খইমালার মার কপালে ঢেলা লাগল। 'ও মা, মলেম!' বলে দুঃখিনী মাটিতে বসল। আর তার জ্ঞান নেই।

'এ কে, খইমালার মা? হা ভগবান, নারীরক্ত ফেললাম!' সনাতন দীঘড়ি দুঃখিনীর হাত ধরে তুললেন।

'বাছা! আমি তুমি বলে বুঝতে পারিনি, আমি ভেবেছিলাম।'

'জানি বাবা! অপদেবতা ছাড়া কে এমন দুর্যোগে পথে বেরোবে? আপনার কোনো দোষ নেই।'

'এ মাঠে অপদেবতার ভয় বিস্তর, মানুষও যে অপদেবতার চেয়ে সময়ে মন্দ হয়। সে যাক্‌গে! এমন সময়ে তুমি পথে কেন বল!'

খইমালার মা ধীরে সব বলল।

'এমন রাতে তোমাকে দুধ-মিষ্টান্নের সন্ধানে পাঠায় সে কেমন গুরু, অ্যাঁ? দশ হাতে অন্ন তুলে নিজের পেট ভরায় তুষ্টুপদর সে স্বভাব গেল না দেখছি অ্যাঁ?'

খইমালার মা নিরুত্তর।

'তুষ্টুপদ গুরু হয়েছে। সে আবার বিয়ে দেবে, কেমন? কেমন বিয়ে

হবে তা জানতেই পারছি। যাকগে, চল, দেখি তোমার গুরুসেবার কিছু করতে পারি কিনা।'

ঠাকুর পাটবাড়িতে নিত্য সন্দেশ বাতাসের শীতল হয়। এখন সনাতন দীঘড়ি সেইখানে গেলেন।

ঠাকুর পাটবাড়ি ওঁদেরই। তিনি যদিও সন্ন্যাসীর মতো থাকেন মন্দিরের আয়ব্যয়ের খোঁজ নেন না, তবু সেবাইত, চাকর সবাই জানে তিনি একজন মালিক। মন্দিরে তিনি কদাচিৎ আসেন। বলেন, 'যেদিন থেকে দেখলাম সেজকর্তা ভোগের আতপ চাল শ্বশুরালয় পাঠাচ্ছেন, আর ঘরপোরাকির, মোটা আতপ ঠাকুরভোগে দিচ্ছেন সেদিনই বুঝলাম এবার দীঘড়ি বাড়ির সত্বর উন্নতি ঠেকায় কে! এ ঘোর কলিতে উন্নতি করতে হলে প্রথমে ঠাকুরকে বঞ্চিত করবে, উনি পেতলের পুতুল মাত্র। তারপর অতিথি কাঙাল, বুড়ো মা, আশ্রিত পরিজন, তাহলেই ক্রমে লাটের মুন্সী হবে।'

এখন শোনা যায় সেদিন থেকেই তিনি সেজদাদার সঙ্গে কথাবার্তা কমই বলেন। নিত্য সকালে একবার করে মার পাদোদক খেতে অন্দরে যেতেন, কিন্তু যেদিন থেকে দেখলেন মায়ের পায়ের আঙুলে হাজা-ঘা, সেদিন বললেন, 'মা গো আমার মনে প্রবৃত্তি হচ্ছে না, আর আমি পাদোদক খাব না মা, আমি তোমার অধম ছেলে।'

শোনা যায় সেই থেকে তাঁর মা মনস্তাপে কাঁদেন ও বলেন, 'ওকে ওর বাপ, দাদা, ভাই, কেউ বোঝে না। বউটা হতভাগী, কাছে ঘেঁষে না। আমি একা ওকে লয়ে থাকতাম, কিন্তু পেটের সন্তান কী ভাষায় কথা বলে তা আমিও বুঝি না মা!'

এখন সনাতন দীঘড়ি ঝটিতি খইমালার মাকে নিয়ে ঠাকুর পাটবাড়িতে এলেন ও শেকল নেড়ে বললেন, 'বাঁড়ুজ্জা দরজা খোলো।'

'কে, ন'কর্তা?'

বাঁড়ুজ্জে-পুরোহিত দরজা খুলে দিলেন ও সনাতনকে দেখে তাঁর মুখ শুকনো হল। সনাতনকে তিনি বড়োই ডরান, কেননা আকাচা কাপড়ে ফুল তুলেছিলেন বলে একদিন সনাতন তাঁকে খড়ম ছুঁড়ে মেরেছিলেন। এখন তাঁর মনে হল নিশ্চয় কোনো দোষ হয়েছে তাই এই রাতে সনাতন তাঁকে শাস্তি দিতে এসেছেন। পুরোহিত মনে করেন সনাতন নিশ্চয় অলৌকিক মন্ত্রতন্ত্র জানেন, নইলে এমন নির্ভয়ে বনে প্রান্তরে কোন্ সাহসে বেড়ান?

'আজকের সান্ধ্য শীতলের ফলমিষ্টান্ন কোথায় ?

'আজ্ঞা ?'

সনাতনের প্রশ্ন শুনে পুরোহিতের মুখ হাঁ হল, ক্রমে আলজিভ দেখা গেল। এমন দুর্যোগের রাতে ফল-মিষ্টান্নের খোঁজ কেন ? তিনি চকিতে ঘাড় উলটে দেওয়ালের দিকে চাইলেন, স্বগত ভাবলেন, 'বাপো রে, ছেঁয়া না পড়লে জানব অপদেবতা।' কেননা এ মন্দির বিশাল বাগানের বুকে, অদূরে বাঁশবন, সমুদ্রতীর হতে প্রবাহিত ঝড়ে ও ঘূর্ণিবাত্যায় বাঁশে বাঁশে ঘষে অতি ভীষণ শীৎকারের শব্দ ওঠে, তার ওপর বাঁড়ুজ্জে জ্বরে ভুগে ভুগে দুর্বলমস্তিষ্ক। তাঁর মন সকল প্রকার সংস্কারের আড়ত।

'ফল-মিষ্টান্ন চাই, দুধ চাই।'

'আজ্ঞা।'

বাঁড়ুজ্জে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে পেতলের গামলা বের করলেন। সন্ধ্যার শীতলের ফলমিষ্টান্ন মন্দিরেই বেঁটে দেবার কথা। কিন্তু বাঁড়ুজ্জে রোজ অতি ভক্তিভরে 'গোবিন্দো গোবিন্দো' বলে গান করতে করতে বাতাসা ও মুড়কি মাত্র ভিখিরি, কাঙালি, গ্রামবাসীদের বেঁটে দেন। তাঁরা তিনজন সেবায়েত, চাকর, মিলে ভালো ভালো ফলমিষ্টান্ন বেটে নেন। আজ, যেন ভগবান তাঁকে বাঁচাবেন বলেই ঘরে এ গামলা নিয়ে আসবার সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন।

'আজ্ঞা, এখানে বসে কি খাবেন ?' সহসা পুরোহিত এ প্রশ্ন করে বসলেন। মতিভ্রম। মনে যে আশাটি ছিল, তাঁরা প্রত্যহ যে কারবার করেন তা ন'কর্তা ধরতে পারেননি। সনাতনের জবাব শুনে তা ধূলিসাৎ হল, তিনি প্রমাদ গণলেন।

'তাতে তোমার দরকার কি হে সুমুন্দি ?' সনাতন হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'নিজে বারো মাস খাচ্ছ আর পেটের ব্যাধিতে ভুগে বাঁশবন অপবিত্র করছ। ঠাকুরকে আস্তাকুঁড়ে রেখেছ। আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাচ্ছ কেন, অ্যাঁ ?'

'ন' কর্তা!' পুরোহিত কাঁপতে লাগলেন।

'তোমার মতো আর এক পিশাচের ভোগের জন্যে লয়ে যাচ্ছি।'

পুরোহিতের দরজায় লাথি মেরে সনাতন গামলা হাতে বেরুলেন। খইমালার মা অদূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখতে দেখতে এতক্ষণ

কাঁপছিল, এখন সে পায়ে পায়ে সনাতন দীঘড়ির পেছন পেছন এগোতে থাকে।

'চল, আমি লয়ে যাই। এ বাসনের ভার আছে।'

যেতে যেতে সনাতন দীঘড়ি কী মনে করে বললেন, 'তুই রাম খইমালার কার্য কোথায় স্থির করেছে? সে পাত্র কোথায় কার্য করতে আসবে?'

'বোড়ালে আসবে বাবা। রামরাম চক্রবর্তীর বাড়ি।'

'ও, বুঝেছি।'

'বাবা, আপনি পাত্রকে চেনেন?'

খইমালার মা, যদিও হীন-দীন, এবং অবস্থা তার আয়ত্তে নয়, সেই অবস্থায় জাতে দাস; পাত্র অতি মন্দ হলেও সে বিয়ে দিতে বাধ্য; তার গত্যন্তর নেই, তবু এখন কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হল। কার হাতে মেয়ে দিচ্ছি, এ ভাবনাটি তার মনে সত্বর এল। রোগের জ্বালা দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা, এ সংসারে তার অবস্থা বলির উদ্দেশ্যে পালা পাঁঠার থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। তবু, কৌতূহল সম্ভবত রক্তে রক্তে থাকে, অস্তিমেও যায় না। বলির পশু যেমন কৌতূহলে যূপকাঠের আশপাশের কোদলানো মাটি শোঁকে ও বুঝতে চেষ্টা করে কোথায় যাচ্ছি, খইমালার মাও তেমনই কৌতূহলে জানতে চাইল পাত্রকে সনাতন চেনেন কিনা। এ কৌতূহল যেমন করুণ অন্যদিকে তেমনই হাস্যকর। খইমালার মার প্রশ্ন শুনে সনাতন দীঘড়ি দুঃখ পেলেন। এ পৃথিবীতে কোনো কোনো জিনিস, যেমন মানুষের সহজাত অনুভূতি, প্রবৃত্তি, কৌতূহল, দেখতে জানলে দেখা যায় তা একধারে বুকফাটা কান্না জাগায়, অন্যদিকে অট্টহাস্য আনে।

'হ্যাঁ গো, আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি।'

'বাবা, পাত্রটি কেমন, আমার ঐ একটি গুঁড়ো'

'আর এক পিশাচ।'

খইমালার মা নীরব। কৌতূহলটি যেমন চকিতে জেগেছিল তেমনই ত্বরিতে নিভে গেল। তার ঘর ঐ দূরে দেখা যায়। বিদ্যুৎ চমকে গলিত হোগলার ছাউনি, পচা খড় খোঁচা খোঁচা বাঁশের আড়া চোখে পড়ল। এমন ঘর দেখলে শিয়ালও মূত্র ত্যাগ করতে আসে না, ঘেন্না করে, তা আমার ঘরটি যেমন, জামাইভাগ্য তা হতে আর কী ভালো হবে, দুঃখিনী ভাবল।

সনাতন দীঘড়ি সংসারী মানুষের দুঃখকষ্ট বুঝবেন না বলে বহুদিন ধরে পাষাণে বুক বেঁধেছেন। ক্রমে উদাসীন হয়েছেন। তাঁর কথায় খইমালার মা-র বুকে ব্যথা লাগল কিনা, সেটি খেয়াল করলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর হৃদয় করুণাশূন্য নয় কিন্তু খেয়াল কম, উদাসীন, আপন ভাবের ঘোরে উন্মত্ত, যেন ঝড়ের মুখে ছেলেদের তালপত্র বাঁশী, কখনো বাতাসে ওড়ে, কখনো মাটিতে লোটে।

'এ গামলাটি নাও।'

গামলা হাতে নিয়ে খইমালার মা দেখল সনাতন চলে যাচ্ছেন। সহসা মনে হল সে বড়ো অসহায়। এ সংসারে তাকে দেখবার একমাত্র লোক ঐ চলে যাচ্ছেন। উনি তার বিপদে ফল মিষ্টান্নের গামলা বয়ে আনলেন। ঘরে প্রবেশ করে এখন তার নিজের পিতা, জন্মদাতাকেও হীন মনে হতে লাগল। মনে ঘৃণা এল, নীরবে গামলা নামিয়ে রেখে সে কাপড় ছাড়তে গেল।

খইমালা রান্নাঘরে ঘুমে অচেতন। খইমালার মা এখন বুঝল তার অঙ্গে অঙ্গে ক্লান্তি। তা ছাড়া মাথা দপ দপ করছে। দাঁতে দাঁতে বাজি হচ্ছে, বুঝি আবার জ্বর আসে।

কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে সে গুরুবাবার হাত মুখ ধোওয়ার জল রাখল ও অন্য দিকে চেয়ে ভাবল খইমালার জন্যে উনি স্ব-বিবেচনায় কিছু রাখবেন না। এমন ফল-মিষ্টি তার খইমালা জীবনেও খায় না। কিন্তু ওঁকে বলতে ঘৃণা হল। জ্বরের তাপে মাথায় অসম্ভব সব কল্পনা, পিদীমের সামনে বাদুলে পোকা যেমন তেমনই চক্রাকারে উড়তে শুরু করল। আজ সনাতন দিয়েছেন, কালও যেন তিনিই খইমালাকে দেবেন। ভারে ভারে মিষ্টান্ন, আরো কত কী, তাঁর অপার দয়া।

সে মেয়ের কাছে গেল ও দরজায় শেকল টেনে শুতে গিয়ে ভাবল যদি এই রাতে মরে যাই, তা হলে অশৌচের অবস্থায় কেউ খইমালাকে বিয়ে করে না, কিন্তু ভগবান কি সদয় হয়ে এমন রাতে মরণ পাঠাবেন, গরিবের কি পুণ্যফল থাকে, যে ইচ্ছামৃত্যু হবে? তা হলে ত সকলেই, কানা, খোঁড়া, আতুর, মরে রেহাই পেত।

বাইরে আবার বৃষ্টি, বাতাসের তর্জন। খইমালার মা মেয়ের কাছে গিয়ে তাকে কোলের কাছে টেনে ঘুমোতে চেষ্টা করল। দুঃখের রাত সহজে কাটে

না, সেই জন্যেই বোধ হয় তার নিদ্রা চমকে দিয়ে মাঝে মাঝে শেয়াল কাঁদতে লাগল। এমন রাতে আশ্রয়হারা হয়ে সকল প্রাণীই কাঁদে।

৩.

সেই যে বাদল শুরু হল, পরদিন তার বিরাম নেই, তার পরদিনও না। প্রমাদ গনে গঙ্গা থেকে মাঝিরা নৌকো সরিয়ে নিয়ে বাঁশদ্রোণীর ঘাটে বেঁধে রাখল। 'বাব্বা নাও দেখি মোচার খোলার মত আছাড়ি পিছাড়ি করে, অ্যাঁ?' গোলকের বাবা ঈশ্বর পাটনীর বন্ধু করাইতি আবিদ মিঞা অবাক হয়ে বলল। আবিদ মিঞা করাইতি, সে কাঠের তক্তা চেরাই করে বিক্রি করে তাই নৌকোর মাঝি-মাল্লার সঙ্গে আদান-প্রদান বেশি। তা ছাড়া সুন্দরবনের গরান কাঠের চালান আনতে যায় বলে, সমুদ্র দিয়ে খুলনা, বরিশাল, দিকে দিকে চলাফেরা করে। তার কথার টানে বোঝা যায় সে নানা নদীতে নৌকো বেয়েছে।

এ ঘোর বর্ষায় মানুষের ঘরে ঘরে খর বান। উনোনে জল, বোড়াল, বাঁশদ্রোণী, জগদ্দল, বৈষ্ণবঘাটা, গড়িয়া, গ্রামে গ্রামে মানুষের কষ্টের অবধি রইল না। ঠাকুরদিঘির জল কল কল শব্দ পাড় ছাপিয়ে বেয়ে চলল। শুধু ছোটো ছেলেরা আমোদ করে, 'কই যায় মাগুর যায় খলসে বলেন আমিও যাই,' বলে মাছ ধরতে লাগল।

মাছ ধরলে কী হবে, রেঁধে দেন মা-দের উনোনে এমন আগুন নেই। যেসব বউরা বাপের বাড়ির দিকে সর্বদা হেলে থাকে, তারা ঘোমটার আড়ালে বলতে লাগল, 'এমন দিনে বাপের বাড়ি থাকলে চালছোলা ভেজে খেতাম, কই মাছের তপ্ত ঝোল হত।' বৌ-কাঁটকী শাশুড়ী ননদ বললেন, 'মা মাগীর কাছ থেকে আগুন নিয়ে' সো বাছা, আমরাও তপ্ত ঝোল রাঁধতে জানি।'

এমন বর্ষায় নতুন প্রসূতির আঁতুড়ঘর, মরণাপন্ন রোগীর ঘরের মালসা, আর শ্মশানের চিতা ভিন্ন কোথাও আগুন দেখা গেল না। বাসি চালভাজা চিড়েমুড়ি খেয়ে খেয়ে লোকের ব্যামো ধরে গেল। কবিরাজ বাসায় নাইতে খেতে সময় পান না, শুধু এ-বাড়ি ও-বাড়ি যান। যে সব বুড়ি গিন্নি, প্রবীণা দাসী বা বুনো জাতের মেয়েছেলে টোটকা ওষুধ জানেন তাঁদের কাছে অনবরত মানুষ ধর্না দিতে থাকল। তা ছাড়াও, কতজনের ঘর পড়ে গেল।

প্রথমে বর্ষা দেখে চাষীরা 'আর যে যা বলে বলুক, এবার আউশ আমন জেয়াদা ফলন হবে। মুনিবমশায় গো, বউয়ের কাঁকালে রুপোর গোট চাই', বলে আনন্দ করেছিল। কিন্তু অতিবৃষ্টিতে ধানের সর্বনাশ হল, আখ, তিসি, সরষে, মসনে, সবই যায় যায় দেখে তারা হাহাকার করতে লাগল।

অবস্থা দেখে সবাই প্রমাদ গনলেন। বড়শের সাবর্ণ চৌধুরী, ওদিকে গোবিন্দরাম মিত্তির, যাঁদের দয়াবান বলে নাম আছে তাঁরা ভাবতে লাগলেন আবার কি অন্নসত্র খুলে দিতে হবে? এখন তাঁদের অবস্থা তেমন নেই, প্রকৃতপক্ষে পয়সা কোম্পানির হাতে, কিন্তু প্রজাদের সে-কথা বোঝানো বড়ো কঠিন, তারা তাঁদেরই বটগাছের ছায়া বলে এতদিন জেনে এসেছে। ক্রমে, কিছু কিছু হেলো চাষী, যারা ফসলের সুদিনেও উপোস থাকে, তারা এসে কালিকাক্ষেত্রে মন্দিরের চারপাশে ভিড় করতে লাগল। ভিখিরির সংখ্যা বাড়ল।

এরই মধ্যে, ঘোর বর্ষণে, শুক্রবার খইমালার বিয়ে হয়ে গেল। তাকে উদ্ধার করে নীলমণি ঘোষাল লাঠি ঠুকে দেখলেন বাড়ির ভিত পোক্ত কিনা। জিজ্ঞেস করলেন নারকেল গাছে ফলন কেমন, তারপর ডুলি চেপে রওনা হয়ে গেলেন। নীলমণি ঘোষালের বয়স অনেক। শরীরে লোভ ছাড়া অন্য জিনিস নেই।

বর্ষা থেমে যাবার পরও ঘোর অজন্মা হল। দক্ষিণাঞ্চলে বড়োই হাহাকার। বৈষ্ণবঘাটা, গড়িয়া, এখানে গৃহস্থদের জমির উপরেই নির্ভর। কিন্তু ফসলের দুরবস্থা দেখে সংসার চালাবার ভাবনায় কর্তাদের মাথায় চুল রইল না। যাঁদের মেয়েদের এই নতুন বিয়ের বছর, বছরে আটটি দশটি তত্ত্ব করতে হয়, তাঁরা নাপতেনী পাঠিয়ে বেয়ানদের কাছে এবারকার মত মাপ চাইতে লাগলেন। যে বেয়ানরা সমদুঃখে দুখী, তাঁরা বললেন, 'জানি বাছা, এ বছর না পারলে কিছু বলবার নেই।' যাঁরা নির্মায়া, তাঁরা হম্বিতম্বি করতে লাগলেন।

সবলেই যে যার ভাগ্য নিয়ে ব্যস্ত, খইমালার বিয়ের কথাতে কেউ আমল দিলেন না। যে সব মুড়িবেচনী, ধানভানারী, চালভাননীর সঙ্গে খইমালার মায়ের লেনদেন, তারা শুধু বললে, 'এ যে ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে সে-রকম হল গা'?

খইমালা বিয়ের কিছুই বুঝল না। শুধু মেটে সিঁদুর আর লাল রুলি পরে তার আমোদ হল। আর একটি উন্নতি। এখন একাদশীর দিন মা চুনরি বাড়ি

থেকে তাকে মাছ এনে রেঁধে দেয়। চুনরিরা বিল সেঁচে ঝিনুক এনে চুন পোড়ায়। তাদের বাড়ির সবাই বিল থেকে মাছ ধরতে ওস্তাদ। বোধ হয় হেঁসেলের বেড়ালটাও পারলে মাছ ধরে আনে। এ মাছের জন্যে তারা কিছু নিল না। বামুনের সধবা মেয়েকে একাদশীতে মাছ খাওয়ালে তাদের পুণ্য হয়। তাছাড়া দুঃখিনীর মেয়ে খইমালাকে সুন্দর মুখের গুণে সবাই স্নেহ করে।

এইভাবে আরো অনেক দিন গেল।

খইমালা এখন কিশোরী। পনেরো বছরে তার রূপ এখনো বালিকার মতো। আধপেটা খায় বলে শরীর একহারা, মাথার চুলে তেল পড়ে না, তা ছাড়া সর্বদা মেটে সিঁদুর, লালরুলি জোটে না। তাই খইমালা কপাল থেকে চুল উলটে সিঁথি ঢেকে খোঁপা বাঁধে। হাতে লাল সুতো বেঁধে রাখে।

শৈশবে সে একলা ছিল, এখনও একলা। তার মার রোগের শেষ নেই, পরিশ্রমের শেষ নেই, আয়ুরও বুঝি শেষ নেই, এত কষ্ট, তবু সে আজও মরেনি।

আজও খইমালা ভুবনমাসীর কাছে খইমুড়ি যোগান দেয়। আজও গোলক তার জন্যে কড়ি আনে। বালক বয়সে যদিবা গোলক মনের ভাব বুঝত না, কিন্তু যৌবনে পা দিতে সে এমন হল, যে 'কৈতরী' ছাড়া তার চোখে কিছু রইল না।

গোলক পাটনীর ছেলে। ঈশ্বর পাটনী বুড়ো হয়েছে। গোলক এখনও গঙ্গায় খেয়া দেয়, মানুষকে এদিক-ওদিকে নিয়ে যায়। পাটনীর কাজই এমন, বিশেষ করে গোলকের মত মাল বওয়া পাটনীর কাজ, যে অনেক সময়েই তাকে একলা থাকতে হয়। একেবারে একা, গড়িয়া থেকে এদিকে কালিকাক্ষেত্র, নৌকোয় খড় থাকে, কাঠের তক্তা, সুপুরি, চিটেগুড়, পান, তামাক, মাটির বাসন, রকম রকম পণ্য।

গড়িয়াতে যে হাট বসে তার জাঁক ক্রমে বেড়ে উঠছে। এখানে একদা মহাপ্রভু অথবা তাঁর পার্ষদরা ঠাকুরবটের ছায়ায় বসেছিলেন, সেটি স্মরণে রথের সময়ে বৃক্ষরোপণ, গাছের পুজো হয় ও নানারকম গাছ আমদানি হয়, গোলক তাও বয়।

গোলকের নৌকোয় বেদে-বেদেনী, বাজিকর, সাপুড়ে, যারা নদীপথে মেলা খুঁজে খুঁজে ফেরে তারাও আসে। তাছাড়া বর্ষার সময়ে মলঙ্গী, দুলিয়া,

তারা উড়িষ্যা থেকে মেদিনীপুর হয়ে গেঁওখালির পথে গোলকের নৌকোয় এদিকে আসে, ও বড়গঙ্গার ঘাটে যেসব শতশত চট্টগ্রামী, বরিশালী মাল্লারা থাকে তাদের জন্যে শুঁটকি মাছ নিয়ে এসে বেচে।

একাজে গোলককে অগত্যা অনেক সময়েই একা থাকতে হয়। গোলকের নবীন বয়স, আঠারো অথবা উনিশ হবে, সমস্ত শরীরে সুন্দর যৌবন, চোখের দৃষ্টি কোমল, দেখে দেখে যুবতী বেদেনীরা অনেক সময়েই চঞ্চল হয়। পাটনীদের সমাজে অনেকেই ভাবে, 'গোলক যাকে বিয়ে করবে, সে মেয়ে না জানি কত তপস্যা করেছে।' সবাই জানে গোলকের বাবাকে পাটনী সমাজের সেরা রূপসী কুসুমের বাবা অধর দাস অনেক টাকা আগাম দিয়ে রেখেছে। টাকার মধ্যে অধর দাসের প্রাণ, তবু সে কখনো ঈশ্বরকে তাগাদা করে না। ঐ গোলককে জামাই করবার লোভে।

কিন্তু গোলক কিছুই জানে না।

একদিন সুন্দরবনের বিহারী খালে, আবিদ মিঞাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরবার পথে সে গড়িয়ার কিছু আগে থেকেই মন্থর গতিতে আসছিল। দুপাশে গাছপালা, জলে বাঁশবনের ছায়া। গোলক অলস চোখে কাকচক্ষু জলের বুকে শ্যাওলার সাঁতার দেখছিল। সেই সময়ে, চারদিক স্থির, বাতাস মন্থর, গোলক সহসা জানতে পারল খইমালাকে দেখতে না পেলে তার জগৎ আঁধার হবে।

'হাঃ! কৈতরী!' সে অস্ফুটে বলল। তার বিশ্বাস হতে চায়নি। এখন বুঝল তা যদি না হবে, তাহলে সর্বদা সে খইমালার কথা চিন্তা করে কেন?

আরো কিছুদিন গেল।

মনের যন্ত্রণা গোলক সইতে পারে না, রাখতেও পারে না, খইমালা দুঃখী তাপী যাই হোক, তাকে ভালবাসাটি গোলকের পক্ষে পাপ। কী করি, কোথায় যাই ভেবে সে কয়েকদিন বড়োই অস্থির হয়ে থাকল। আশ্চর্য ফকির এখন আরো বুড়ো হয়েছে। সে কচিৎ পুঁথি পড়ে। এখন বেশির ভাগ সময়টা গোলাপীর বাড়ির গোয়াল-ঘরের সংলগ্ন ঢেঁকিঘরেই থাকে। গোলাপী আজও সাধু সাউ-এর চরণাশ্রিতা। আশ্চর্য ফকির থাকে বলে সাধু সাউও হিংসেবিবাদ করে না। বরঞ্চ বাইরে বলে 'ফকির সাধু মানুষকে থাকতে দিতে হয়।'

আশ্চর্য ফকিরের কাছে একদিন গেল গোলক। পুথি শুনলে যদি মন ঠাণ্ডা হয়।

কিন্তু এখন আশ্চর্য দুবেলা সিধা পায়ে। এখন সে পুথি পড়বে কেন? পুথি তার কাছে আর রাখে না।

'পুথি না পড়, মুখে বল।'

'প্রথম প্রস্তাবে নায়ক দেওয়ানা,' এ ছাড়া আজও আশ্চর্যর কিছু মনে নেই। পুথি হাতে থাকলে সে বলতে পারত প্রস্তাবের পর প্রস্তাবে কাহিনীর বিস্তার কেমন করা হয়েছে।

গো'লাপীও রাগ করল। বলল, ফকির এখন আমাদের। উয়াকে বেরক্ত কর কেন পাটনীর পো?'

আশ্চর্য ফকিরের কাছ থেকে আসতে আসতে হঠাৎ গোলকের বড়ো ভয় হল। এই যে রাত নেই, দিন নেই, শুধু খইমালার ভাবনা, তাহলে কি সে এমনি করেই পাগল হবে? দেওয়ানা হয়ে দেশে দেশে ঘুরবে?

কাতর হয়ে গোলক একদিন ঠাকুরবটের কাছে গেল। মনে মনে বলতে লাগল, হে ঠাকুরবট, তোমাকে ছোটবেলা থেকে দেবতা বলে জানি। রথের দিনে তোমার ডালে চাঁপার মালা ঝুলিয়ে দিতাম, শীতে আকন্দমালা দিয়ে গড় করতাম, তুমিই ঠাকুর। সনাতন ঠাকুর বলেন তোমার ছায়ায় পুণ্যবানরা বসেছিলেন, এই ঠাকুরদিঘি সেই থেকে গঙ্গার সমান হয়েছে, তুমি দেবতা হয়েছ, তোমার ছায়া যতদূর যায় ততদূর কাশীধাম, আমাদের বৈষ্ণবঘাট বড়ো পবিত্র জায়গা। এ সব তুমিই করেছ, হে ঠাকুরবট, তুমি আমাকে কৈতরীর কথাটি ভুলিয়ে দাও।'

এ কথাটি মনে মনে বলে গোলক কতই চোখের জল ফেলল। তার পর দণ্ডবৎ করতে গিয়ে তার কোমরে কী ঠেকল। গেঁজে ভরা কড়ি।

এখন কড়ির ছোঁয়া তার গায়ে ছেঁকা দিতে লাগল। ভুবন মাসীর দেওয়া কড়ি সে কেমন করে দিতে যাবে? দিতে গেলে খইমালার সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু দেখা না হলেই ভালো।

অনেক চিন্তা করে সে হাটে গেল। পাটনীর ছেলে, শরীরে শক্তি ধরে। গোলক ভাবতে লাগল, 'এখন মনেও শক্তি রাখতে হবে। এখন আমি বেড়াপাকে পড়েছি। ধামা করে চাল নিয়ে যাব, বামুনমাসীর সামনে ঢেলে দিয়ে বলব আর আমি তোমাদের সওদা পৌছতে আসতে পারব না মাসী।

এবার একটা দূরের পাল্লার কাজ ধরতে হবে। নইলে বড় অনর্থ হবে। কৈতরী বামুনের মেয়ে, বাপ রে! বামুন যত মড়ি-পোড়া হোক, জাতে গোখরো সাপ! আমার চৌদ্দপুরুষ ডুববে নাকি?

সে বড়ো ধামা কাঁধে নিল। যেমন ধামায় বেদেরা ময়াল সাপ আনে। ধামায় চাল কিনল, গামছায় বেঁধে ডাল, লবণ, মশলা, সব নিল। কলুর ঘর থেকে তেলের ভাঁড় নিয়ে এক হাত ধরল, ও ঝটিতে সব মালপত্র নিয়ে খইমালার ঘরে গেল।

যেখানে বাঘের ভয়। এখন অপরাহ্ণ। দাওয়ায় খইমালা। টেকোয় পইতে কাটছে।

'এ কি গোলক, এত সওদা কেন?' সে হাসিমুখে এগিয়ে এসে তেলের ভাঁড়টি নিল।

ধামা নামিয়ে দিয়ে, কড়ির গেঁজে ফেলে দিয়ে গোলক পুরুষকণ্ঠে বলল, 'কৈতরী! এর পরে সওদা আনবার অন্য ব্যবস্থা কোরো। আমার এখন অনেক কাজ। ঘড়ি ঘড়ি আসতে পারব না।'

খইমালা কী বলে তা শুনবার জন্যে গোলক দাঁড়াল না।

'এমন অজগর জঙ্গলে থাক, কেউ আসে না, তাই আসি, নইলে আমার কাজ নষ্ট হয়।' বলতে বলতে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আরো কত দিন এই ভাবেই গেল।

খইমালা জানল গোলক এখানেই আছে, কিন্তু সে এখানে আর আসে না। তার মনেও বড়োই ভাবান্তর হতে লাগল। হাজার হলেও তারা মা-মেয়ে নির্বাসনেই থাকে। মায়ের গুরুবাবা, তার মাতামহ যতদিন ছিলেন ততদিন মাঝে মাঝে এসে উপদ্রব করতেন।

এখন তিনি নেই। এখন তাদের বাড়িতে শেয়াল ভিন্ন মানুষ হাঁটে না। কাক-পক্ষী ভিন্ন, মানুষ খবর নেয় না! এ নির্জন বনবাসে গোলকই এতদিন মাঝে মধ্যে 'কৈতরী!' বলে এসে দাঁড়াত। এখন সে ভরসাটিও গেল।

খইমালার মনে হল সবই আলুন লাগছে, বিস্বাদ। 'কেন গোলক আমার কে? খইমালা নিজের মনকে প্রশ্ন করল। তারপর ভাবল গোলক ভিন্ন কেউ আমাদের দয়া করেনি, সেই জন্যেই তার কথা এমন করে নিয়ত মনে হয়। মা বলেন কাজ নিয়ে থাকলে মন ভুলে থাকে, তা হলে আমি কাজে যাই।

একবোঝা নারকেল পাতা নিয়ে সে চাঁছতে বসল। এতগুলি নারকেল

শলা হলে তবে ঝাঁটা হয়। সেই ঝাঁটায় দীঘড়িদের ঠাকুরপাট বাড়ির উঠোন, গোলাবাড়িতে ঝাঁট পড়ে। রথতলার রথ বেরুবার আগে এখনো নতুন ঝাঁটায় ঝাঁট দিয়ে জল ছেটানো হয়। দীঘড়িদের দয়া হলে খইমালার মা'র কাছ থেকে ঝাঁটা নেন, যদিও তাঁদের নিজেদের কম-বেশি চারকুড়ি পাঁচটি নারকেল গাছ, রাজার সম্পত্তি।

কিন্তু, ক্রমে, গোলকের অদর্শনে খইমালার মন এমন হল যে, কাজে মন বসে না। সে কাতর হয়ে একদিন ঠাকুরপাট বাড়ির দাসীর বালক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হাটে গেল। ঘরে চাল নেই। ভুবনকে খোঁজ করা দরকার। তা ছাড়া গোলককে হয়ত দেখতে পাবে। এ কথাটি মনের নিচে রইল। ছেলেটিকে সঙ্গে নিতে হল, নইলে সে যেতে পারে না। আজ আর সেদিন নেই, খইমালা আশ্চর্য ফকিরের মাচায় একলা যাবে। সেদিন ছেঁড়া কাপড় পরত, আজও ছেঁড়া কাপড় পরে। গরিবের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে কেউই ব্যস্ত নয়, কিন্তু দুর্নামটি নিমেষে দেবে।

হাট এখন আরো বড় হয়েছে। গঙ্গার ওপর খেয়া দিয়ে অনবরত মানুষ এদিকে আসছে। এ হাটে ভুবনের সন্ধান করা বৃথা। অনেকক্ষণ এদিকে ওদিকে বৃথা আশায় ঘুরে খইমালা দানীমণ্ডলকে দেখতে পেল। দানীমণ্ডলের সঙ্গে ঈশ্বরপাটনী কথা বলতে বলতে আসছে। প্রতিদিন গরম ভাত খাওয়ার গুণ আলাদা, ঈশ্বরের গায়ে খইমালা দেখল বেশ মাংস, চামড়া তেলে স্নিগ্ধ, ঈশ্বর দানীমণ্ডলকে কী বলতে বলতে আসছে।

'আমি চিকিৎসা করি, বাইরোগ সারাই না।' দানীমণ্ডল ঈশ্বর-পাটনীর হাত ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেল। ঈশ্বর রাস্তায় দাঁড়িয়ে, 'ও দানীদাদা!' ডেকেও সাড়া পেল না। তখন সে খইমালার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বলল, 'কে ও, খইমালা?'

'কাকা, আমি।'

'তা, এমন সময়ে পথে কেন মা? সন্‌ঝে হয় হয়। ঝিঙে ফুল ফুটবে এখন।'

'হাটে গিয়েছিলাম, তা ভুবনমাসীকে দেখতে পেলাম না। তাকে না পেলে বড়ো মুশকিল।'

'আচ্ছা, দেখলে পরে যেতে বলব।

'সে কড়ি না দিলে বড়ো মুশকিল।'

'খ্যাংরা মারো তোমার বামুনের কপালে! নকুড়ঠাকুর মরেছে আর তোমাদের খোয়ার শুরু হয়েছে। এর চেয়ে মা-বেটিতে ভিক্ষে করলে সুখে থাকতে। চলো, আবার হাটে যাই।'

'আবার হাটে যাবে?'

'যাব না? তুমি উপোসী হয়ে পথে পথে ঘুরতেছ, সে মেয়েছেলেকে তালাশ করে আনে। হা দেখ দিদি, তুমি ঘরে যাও। আমি তার গলায় গামছা দিয়ে তোমাদের ঘরে পাঠিয়ে দেব 'খন।'

ঈশ্বরের চোখে মুখে যেন কিসের উদ্বেগ ছিল। কিন্তু খইমালার মুখ দেখে ভুবনের ওপর রাগে সে নিজের দুঃখ ভুলল। যেতে যেতে বলল, 'ছোটো জেতের পয়সা হলে এমন চামারই হয় বটে! বামুনের মেয়ে উপোসী রইল তুই গিয়ে হাটের তামুলীদের সঙ্গে রসের কথায় মেতে রইলি।'

'গোলক আসে না তাই ভুবনমাসীর খবরও পাই না।' এই নির্দোষ কথাটি বলতে খইমালার মুখ লাল হল।

'তার কথা আর বল কেন, আমায় না জানিয়ে সাগরে যাবে, সেই কর্ণফুলীর মোহনায়, সেই মতলব আটতেছে। কারো সঙ্গে কথা কয় না। আপনভাবের ঘোরে থাকে, এখন ত হাটতলাতেই বাস। ঘরে যেতে চায় না।'

খইমালা শুধুমাত্র শুনল গোলক সাগরে যাবে। এ কথা শুনতেই তার মনে হল অপার সমুদ্র, তাতে গোলকের নৌকো মোচার খোলা, ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে।

ঝি-এর ছেলেটিকে বাড়ি রওনা করে দিয়ে খইমালা ধীরে ধীরে ঠাকুর-বটের দিকে গেল। ঠাকুরদিঘির পাড়ে এই ঠাকুরবটকে সে জাগ্রত দেবতা বলে জানে। সে শুনেছে অনেক আগে, যখন মানুষের ভক্তি ছিল, তখন এই পুকুরের দেবতা মানুষকে যজ্ঞিকাজের বাসন দিয়ে সাহায্য করতেন। চড়ক গাছের কাঠটি, তিনি ত মা দুর্গা। এ দিঘিতে ডুবিয়ে রাখলে, তুলবার সময়ে নাকি দেখা যেত, সে কাঠের চুড়োয় মাথা ভরা চুল, দগদগে সিঁদুর।

এখন ঘোর কলি। কিন্তু দেবতা বলে যে গাছকে এতদিন জেনেছে এখন তার কাছে এসেই খইমালা গড় করল। জায়গাটির মাহাত্ম্য এই যে অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও এখানে থাকলে ভয় করে না।

গড় করে উঠে সে আঁচলের ফালি ছিঁড়ে একটি ঝুরির গায়ে গেরো দিল ও মনে মনে বলতে লাগল, 'হে ঠাকুর, আমার মনটি ভাল করে দাও। আমার মাকে বাঁচিয়ে রেখ। মা মরলে আমার দাঁড়াবার জায়গা রইবে না। আর দেখ গোলক যেন সাগরে না যায়, তাহলে আমার কষ্ট হবে।'

এমন সময়ে খইমালা চমকাল। কেননা সামনে, অদূরে, শরবনের মধ্যে ঢাকা ঘাটের রানায় বসে মানুষ। গালে হাত, চিন্তামগ্ন। এমন সন্ধ্যায়, এমন নির্জনে, ঠাকুরদিঘির রানায় বসে গোলক কী ভাবে? এ সন্ধ্যা কী নিঃশব্দ, কী নির্জন। ক্রমে বটগাছের পাতায় পাতায় যেমন, খইমালার মনের ওপর দিয়ে, সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে গেল। জগৎ চরাচর শান্ত। এদিকে ওদিকে জলের উপর গুটিকয় জোনাকি ছাড়া আর সর্বত্র সন্ধ্যার অন্ধকার। এমন জায়গায়, এমন সময়ে গোলক!

'কৈতরী'!

গোলকের ডাকে যন্ত্রণা, হতাশা, বিস্ময়। হতভাগ্য গোলক এ নামটি ছাড়া আর কিছু যেন জানে না, যা বলে তার অন্তরের বোঝা হালকা হয়। এই একটি ক্ষতমুখেই যেন তার শোণিতপ্রবাহ উছলে বেরিয়ে এল, এমন মর্মান্তিক সে ডাক।

'আমি দেওয়ানা হব না ঠাকুর। আমায় পাগল করে দিয়ো না!'

এ কাতর, করুণ মিনতি খইমালার বুকে শেল বিঁধল। 'মা গো!' মনে মনে ডেকে, সে পিছন ফিরতে যাবে এমন সময়ে গোলক, 'কে ও?' বলে পেছন ফিরল।

খইমালার আর যাওয়া হল না।

'কে ও, কৈতরী?'

খইমালা অস্ফুটে বলল, 'হ্যাঁ। গোলক, তুমি এমন সময়ে এখানে?'

'আমি নিত্য আসি।'

'কেন?'

'ঠাকুরবটে আমি ঢেলা বেঁধেছি। আমার নিত্য মানসিক।'

'কেন?' না বলে খইমালা অসাবধানে বলে ফেলল, 'কিসের আশায়?'

'আশায় নয় কৈতরী। ঠাকুরকে ডাকি, কেননা, আজকাল বড় ভয় হয় বুঝি বা পাগল হয়ে যাব।'

'ও কথা বোলো না গোলক।'

'পাগল হতে আমার ভয় করে কৈতরী। তখন তো কেউ দয়া করবে না। সবাই বেঁধেছেঁদে দানীমণ্ডলের কাছে নিয়ে যাবে। যদি, যদি তখন মনের কথা বলে ফেলি ?'

'মনের কী কথা গোলক ?'

খইমালার কথা যেন সন্ধ্যেবেলার ফুল। তারাই যেন জোনাকি হয়ে একটি ছুটি করে অন্ধকারের গায়ে ফুটে উঠছে। দূরে কারা মসজিদে আজান দিল। আহা, খইমালা আর গোলক যখন ছোট ছিল তখন তারা দুজনে এই আজানের শব্দ শুনতে কত ভালবাসত।

'ছোটবেলার কথা মনে পড়ে কৈতরী ?'

'মনে পড়ে।'

আরো অনেক কথা মনে পড়ে খইমালার। কিন্তু সে কথা যে মানুষকে বলবার নয় !

'সেই তুমি পুকুরে ভেসে গিয়েছিলে !'

'তুমি আমায় তুললে গোলক।'

'সেদিন যদি আমি আর তুমি দুজনে ভেসে যেতাম ?'

খইমালার চোখ ভিজে উঠল। গোলক তুমি কি আমার মনের কথা জান ?

'আমার মনে বড় কষ্ট কৈতরী। মানুষ যদি জানে তাহলে কলঙ্কের শেষ থাকবে না।'

'গোলক তুমি ঠাকুরবটকে কী কথা জানাও ?'

'তুমি কী বল ?'

'গোলক, তুমি সাগরে যেয়ো না।' কথাটি বলতে খইমালার বুক ফেটে গেল। কিন্তু কেন যেন তার মনে হল এমন করে গোলকের সঙ্গে সে কোনোদিন কথা বলতে পাবে না। গোলক, কেন তুমি আশ্চর্য ফকিরের গল্প শুনেছিলে ?

'আমি সাগরে গেলে তোমার কষ্ট হবে কৈতরী ?'

খইমালা মাথা নাড়ল। এখন আর লজ্জা কাকে ? ঠাকুরবট, তুমি আমার লজ্জা রাখ। গোলককে এ কথাটি আজ না বললে নয়।

'না কৈতরী, তা হয় না। অমন কথা বলতে নেই। আমি, আমি যে পাটনীর ছেলে কৈতরী।'

'গোলক, আমার বুক যে ফাটে।'

'তা হয় না কৈতরী, তা যে হতে নেই।' গোলক খইমালার হাতটি ধরল। বলল, 'এ জন্মে যে তা হয় না কৈতরী।'

দুজনেই স্তব্ধ, নিশ্চুপ। অন্ধকারে জোনাকি উড়ছে।

'মা গো!' গোলকের বুক যেন ফেটে গেল। সে দৌড়ে চলে গেল। খইমালার শরীর এখন চঞ্চল, হাত যেন পুড়ে যায়। গোলক, তোমার জন্যে আমি পথে বুক পেতে দিতে পারতাম, তোমার সব দুঃখ আমি চোখের জলে ধুয়ে দিতাম, কিন্তু সে তো এ জন্মে হবার নয়।

ভাবতে ভাবতে, ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে খইমালা ঠাকুরবটের পাড় থেকে নামল, ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলল।

সামনের কালীতলার মাঠ দিয়ে সনাতন দীঘড়ি যাচ্ছিলেন। এখনো তাঁর গলায়, গানের নামে সেই স্বরহীন হাহাকার, 'কাশী কাঞ্চী কে বা চায়!' কিন্তু, এখন তাঁর বয়স হচ্ছে, হাহাকারে সে শক্তি নেই। মানুষ দেখে অভ্যাসবশত, 'কিসের দাপে মাটি কাঁপাও বাপ? মাগ ছেলে কেউ তোমার আপন নয়।' বিড়বিড় করে বললেন। তারপর ঠাহর করে দেখে বললেন, 'কে ও খইমালা?'

'আজ্ঞা।'

'এমন সময়ে এখানে?'

'এসেছিলাম।'

'গোলককেও দেখলাম, ঈশ্বরপাটনীর মেজ ছেলে!'

অন্য লোক হলে এর মধ্যে অনেক কদর্থ করত। সনাতন দীঘড়ি সংসারের মলিনতাকে বড়ই ঘেন্না করেন। তাঁর মনে, এদের দুজনকে পরপর দেখবার কোনো কুব্যাখ্যা প্রবেশ করল না। তিনি বললেন, তুমি বাড়ি যাও মা, সন্ধে হয়েছে। এমন সময় বাইরে থাকে না।'

বাড়িতে এসে খইমালা বাইরের ছেঁচাবেড়ার ওপাশে থেকেই মানুষের গলা শুনল। শুনতেই অজানা ভয়ে তার শরীরের ভেতর নড়ে উঠল। অনেক আগে, সেই যেবার বড়ো বর্ষা হয়, সেবার ঠাকুরবটের নিচে গোলকের হাত থেকে কড়ি নিয়ে ঘরে ফিরে খইমালা মানুষের গলা শুনেছিল, আলো দেখেছিল, সেইদিনই তার বিয়ের কথা হয়।

তার বরটি কেমন, কী বৃত্তান্ত, কিছুই খইমালা জানে না। তবে গত তিন

বছর থেকে তাঁর বিংবা ভাগ্নী এসে, 'মামাই ত সব পাবেন গো।' বলে গাছের নারকেল নিয়ে যায়। এতে খইমালার মনে বিস্ময় হয়।

বিধবা ভাগ্নী বলে, 'আচ্ছা ঘর তোমাদের মামী! এমন ঘরে মামার মুনিষ মাহিন্দররাও থাকতে চাইবে না।' তাই খইমালা ভাবে যাদের এত আছে তারা দুঃখিনীর সামান্য সম্বল নেয় কেন? কিন্তু এ ভাবনা কখনো প্রকাশ করে না। কেননা, বৈষ্ণবঘাটে অন্য গৃহস্থবাড়ির গিন্নীরা বলেন, 'নকুড় দাসের বউ! তোমার জামাইভাগ্য তবু মন্দের ভাল মা! জামাই আনতে গেলে কুলীনের ঘরে দেওয়া থোওয়ার অন্ত থাকে না, তা তুমি গাছের ফলফলারির ওপর দিয়েই পার পাও!' এরপরে খইমালা কিছু বলতে গেলে তারই নিন্দে হবে। এটি খইমালার জীবনের শিক্ষা।

নিজের হাত থেকে তার রেহাই নেই।

মা বলে মেয়েমানুষের নিন্দে জগতের সর্বত্র। তবু ত, গঙ্গা পাশে প্রবহমানা, তাই, নৌকো-পানসি আসে যায়, শহরের বাতাস গড়িয়ায়, বৈষ্ণবঘাটায় সর্বদা লাগে। শহরের বাতাস লাগে বলে নিন্দের প্রচলন কিছু কম, তবু ফি বছরে দু পাঁচটি মেয়ে বউ কি নিন্দেয় দুর্নামে আত্মঘাতী হয় না। 'তাতে বা কী লাভ!' খইমালার মা বলে, 'মেয়েছেলে আত্মঘাতী হলে গতি হয় না মা, শোঁশানের পেত্নী হয়ে দাপাদাপি করে।'

খইমালা ধীরে, দাওয়ায় না উঠে, ঘরের পেছনে গেল ও বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল।

ভুবনমাসী ও তার সঙ্গে জয়হরি পুরোহিত। 'ঘাটের বামুন, ঘাটকাজ করায়, সে এমন সময় এখানে কেন?' খইমালা আশ্চর্য হল। তারপর মনে পড়ল তার বিয়ে ঐ জয়হরি ঠাকুরেরই দেওয়া।

জয়হরি বড়ো পয়সার কাঙাল। ঠাকুরসেবায় ঘন্টানাড়া ও ভোগের থানে জোগান দেওয়া, এ কাজও সে পায় না। পায় ধান, কড়ি, গুড়, ঘাটকাপড়, তাই কেউ তামা, রুপো অথবা সোনা দক্ষিণা দেবে বললে সে অমনি তার তসরের কেঠো কাপড় পরে হাতে পায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিমেষে তৈরি হয়। ঘাটের মড়ার সঙ্গে বালিকার বিয়ে দিতে, কচি মেয়েকে বেঁধেছেঁদে জ্যান্ত চিতায় তুলতে সে কিছুমাত্র কাতর হয় না।

সনাতন দীঘড়ি তাকে 'ব্রহ্মপিশাচ' বলেন। তা শুনে সে বলে, 'আপনি মহাশয় লোক, যা বলবেন মাথা পেতে লোব, কিন্তু মিছে দুর্নাম লোব কেন?

অন্যায় কাজ জয়হরি করে না। শাস্ত্রে বলছে তাই করছি। শাস্ত্র পাল্টে দেন, আর করব না।'

জয়হরির ডাক শুনে গঙ্গাতীরের হরিসভার বৃদ্ধেরা সাধুবাদ করেন ও বলেন, 'বাবা জয়হরি, এ কলিকালে তোমার মত ছেলেরা আছে বলেই ধর্ম টিকে আছে।'

এখন সেই জয়হরিকে মার সঙ্গে আলাপ করতে দেখে খইমালা কান পেতে শুনতে লাগল। ভাগ্যের ওপর তার হাত থাকে না, কখনও গুরুবাবা, কখনও জয়হরি, যে যখন পারে এসে তাকে ভাগ্যের যেদিকে ইচ্ছে ঠেলে দিয়ে যায়।

'তবে আর বলছি কি!' জয়হরি বলল, 'আমি জেনে এলাম, নীলমণি ঘোষালের এবারের রোগটি শিবের অসাধ্য। ভাগ্নী বিষ খাওয়াতে গিয়েছিল সেটি প্রমাণ হয়ে পড়াতে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাকে বললে, 'বৈষ্ণবঘাটের বউটি ডাগর-ডোগর হয়ে থাকলে এসে যদি সেবাযত্ন করে ত বেঁচে যাই। আমি আর ক'দিন থাকব। তারপর গয়না বল, টাকা বল, সব তারাই পাবে। উটি গরিবের মেয়ে, রাজি হলেও হতে পারে। বোড়ালে, ধবধবায়, জগদ্দলে, যেখানে বলতে গিয়েছি সেখানেই মুখ করেছে।'

'আমার এক মেয়ে। ওকে না দেখে আমি থাকতে পারব না!' খইমালার মা মেঝেতে আঁক কাটতে কাটতে বলল।

'তুমি ত ষোল বছর ধরে দেখছ গা! এখন ওর বর দু'দণ্ড দেখুক!'

ভুবন থরথর করে বলল। ভুবনের ওপর ঠোঁট ফাঁক, দাঁত দেখা যায়। সেইজন্যে তার স্বামী তাকে নেয়নি। এখন হাটে মুড়ি-মুড়কি বেচে, ক্বচিৎকদাচ কুটনীর কাজ করে ভুবন হাতে বিস্তর পয়সা করেছে, গাই গরু ইটের দেওয়ালের খড়ের চাল দেওয়া বাড়ি, সবই সাজন্ত। কিন্তু যা পেয়েছে তাতে ভুবন সন্তুষ্ট নয়। স্বামী, সংসার এসব কথা ভাবতেই তার মনে হয় যা পায়নি তা বুঝি স্বর্গের সমান। খইমালার মার নারাজ ভাবটি দেখে সে চটে উঠল। বলল, 'মেয়ে সোয়ামীর ঘরে যাবে তাতে নেকীর ন্যাকরা দেখ! সে মিনসে ক'দিনে চোখটি বুঁজবে। তখন সোনাদানা নিয়ে মা-মেয়ে মিঠাই-মণ্ডার হরির লুট দেও না কেন, কেউ দেখতে যাবে না।'

'সোনাদানার লোভ আমি করি না মাসী, গতর খাটিয়ে এক মুষ্টি অন্ন পেলে ধন্য মানি, অন্য সুখের আশা করি না।'

'সে তোর কথা বামুনমেয়ে, মেয়েটার কপালে যদি সুখ হয় ত হোক না!'

মাটির বাঁধে ফাটল থাকলে সেই ফাটলে বেনোজল ঢুকে পড়ে সর্বনাশ ঘটায়। খইমালার প্রতি স্নেহটি তার মায়ের মনে দুর্বল জায়গা। সেই জায়গায় ব্যথা দিয়ে কথা বলে ভুবন বিধবার মন নরম করতে লাগল।

'তা ছাড়া দেখে এলাম পরিপুন্ন সংসার। বাসনে কোসনে গাই গরুতে সব যেন জম্‌জমাট হয়ে আছে।' জয়হরির নিজের চোখেও অমনি সংসারের ছবি ধরা আছে।

'কাল বলব।'

এ কথা বলে খইমালার মা ভুবনদের বিদায় দিল ও খইমালাকে 'দোর দিয়ে থাকিস' বলে নিজে পথে বের হল। এখন তার মনে হল সনাতন দীঘড়িকে পেলে তবে পরামর্শ নিতে পারে। তিনি অন্যায় কথা কখন বলবেন না।

কিন্তু সনাতন দীঘড়ি সে-রাতে বৈষ্ণবঘাটে ছিলেন না। একলা ডিঙি বেয়ে যাচ্ছিলেন, এভাবে মাঝে মাঝেই তিনি বেড়াতে যান।

পরে শুনে বলেছিলেন, 'নীলমণি এক নরপিশাচ। জয়হরি এক ব্রহ্মপিশাচ, দুই পিশাচে মিলে যুক্তি করলে তা থেকে ভাল হতে পারে কি? তা ছাড়া ঐ মেয়েটি কস্মিনকালেও ওর ভাগ্নী নয়। ও বড়ো পাজি মেয়ে, সম্পত্তির লোভে নীলমণিকে জল উঁচু জল নিচু বলে খোসামোদ করত।'

সে কথা শুনে উদ্‌ভ্রান্ত গোলক বলেছিল, 'হা ঠাকুর, তবে বামুনমাসীকে সে কথা বলে দেননি কেন? পাপ ত আপনাতেও অর্শাল!'

সনাতন খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন। তিনি জানতেন তিনি আধাসন্ন্যাসী, উব্‌জে গিয়ে কথা বলে উপকার করা তাঁর কর্তব্য নয়। মানুষ হয়ে জন্মালেই তার কিছু কিছু কর্তব্য থাকে এ কথা গোলাপীও বলতে ছাড়েনি। একজন আধা পাগল, এক বেশ্যা, এদের কাছ থেকে সত্যি কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে যান। সেদিন আর 'কিসের দাপে মাটি কাঁপাও' এ কথাটি আকাশ ফাটিয়ে বলতে পারেননি। 'খইমালার ভাগ্য!' অস্ফুটে বলে চুপ করে গিয়েছিলেন।

ভাগ্যকে কে রোধ করতে পারে? বন্যাকে কে বাঁধতে পারে? বৈষ্ণবঘাটের কেউই জানল না, ভুবন ও জয়হরি দুজনে খইমালাকে নৌকোয় তুলে এড়াচি পৌঁছে দিয়ে।

সেদিন গোলক অবধি ঘাটে ছিল না। ভয়ে শঙ্কায় খইমালা এদিক ওদিকে কত তাকাল কিন্তু গোলককে দেখতে পেল না।

পরে খইমালাকে আর দেখতে পাবে না জেনে গোলক 'কৈতরী কৈতরী' বলে কপালে বৈঠার বাড়ি মেরে কাঁদল।

তারপর, একদিন এড়াচিতে বসে, ভুবনের মুখে খইমালা শুনল, 'আহা, ঈশ্বরপাটনীর দুঃখে বনের পশু কাঁদে! অমন ছেলেটা পাগল হয়ে গেল গো! গোলকের মত ছেলে, সে পাগল হওয়া মানে বাপের বুকে শেল পড়ল। এ নিয্যস্ কেউ ওষুধ করেছে। কাঁচা ছেলেকে অমন দেশে দেশে যেতে দেয়?'

সেই প্রথম, খইমালার ঠাকুরবটের ওপর বিশ্বাসে ফাটল ধরল। দেবতার মুখ চেয়ে থাকে যারা, দেবতা তাদের দেখে না। তবে মানুষ কোথায় যাবে?

৪.

সুখের দিন পলকে যায়। দুঃখের দিন সত্বর কাটতে চায় না। খইমালার জীবনে আর চারটি বছর কেমন করে গেল তা ভাববার কথা।

কেঁদে কেঁদে তার মার শরীর পাত হয়েছিল। জয়হরি ও ভুবনের কথায় মেয়েকে পাঠিয়ে সে মহা ফাঁপরে পড়ে। এড়াচিতে, নীলমণি ঘোষাল এতদিন বিয়ের প্রাপ্য মর্যাদা নিয়ে সম্পত্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। শেষ বয়সে কাশ রোগটি হওয়াতে তিনি তাঁর বিয়ের খাতা রেখে দিকে দিকে সংবাদ করেছিলেন। অবশেষে, গ্রামের মণ্ডলদের বাড়ি বিরজাহোমের সময়ে 'যজ্ঞজোগালী' হয়ে জয়হরি যাওয়াতে তিনি খইমালার সংবাদ পান।

বিরজাহোম সবাই করতে পারে না। এটি করবার জন্যে মণ্ডলরা গড়িয়ার মহাশ্মশান থেকে আগমবাগীশ তান্ত্রিককে এনেছিল। কিন্তু আগমবাগীশ যখনই যজ্ঞ করেন, তখনই 'যজ্ঞজোগালী' বামুনকে নেন। সে তাঁকে সব জোগান দেয়। এক্ষেত্রে আরো দরকার। মণ্ডলরা অব্রাহ্মণ। তাদের দিয়ে যজ্ঞস্থান লেপবার কাজটিও হবে না। তাই তিনি বললেন, 'জয়হরি' তুই আমার সঙ্গে চল্। এক প্রস্থ পুজোর বাসন, একখানা তসর আর একটি টাকা পাবি। তা ছাড়া হোমটি যদি ভালয় ভালয় হয় ছেলেটি বাঁচে, তা হলে শীতের মলিদা তোর ঠেকায় কে!'

আগমবাগীশ পাওনা-থোওনা সবই দেন, কিন্তু বড়ো হেনস্থা করে কথা বলেন। শুন বেটা, ঘি খেয়ে নে। জন্মে ত কপালে জোটে না!…আরে বামুনের বলদ, বেলপাতায় পোকা লেগেছে দেখিসনি?' এ তাঁর মুখের বুলি।

এড়াচিতে মণ্ডলদের ছেলেটি বেঁচে যাওয়াতে তিনি আরো শান্তি-স্বস্ত্যেন করতে ব্যস্ত রইলেন। তখনই জয়হরি নীলমণি ঘোষালের সন্ধান পায় ও খইমালার কথা বলে। নীলমণির স্বভাবে গুণ বিস্তর। একটি বউকে তিনি কোঁকে লাথি মেরে মেরে ফেলেছিলেন, সেই নামে-মাত্র ভাগ্নীটিকে হঠাৎ কোথায় বিদায় করলেন কেউ জানতে পারল না।

তবে গোয়ালা বউ সকালে উঠে গাই দোয়। সে বললে, 'ভোর রাতে দিদি নাকে কাপড় চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নদীর দিকে যাচ্ছিল। আমাকে বললে আমার নাম চণ্ডী, আমার যে কথা সেই কাজ। ঘোষাল আমায় ঠকিয়েছে। আমিও আমার ভেয়েদের এনে ওর মাথা ভাঙব।'

গোয়ালা বউয়ের কথা সবাই কানে নেয়নি। তবে জয়হরি, চারটি টাকার লোভে খইমালাকে এনে দিতে রাজি হল। নীলমণি বলেছিলেন, 'দেখ, বারুইপুরে আমার দুটি ছেলে আছে বটে। কিন্তু আমি মরলে তারা ঠিকই আসবে, জীয়ন্তে একটু দেখবে না। বৈষ্ণবঘাটের উটি গরিবের মেয়ে এখন ভাতটা জলটা দিক, প্রাণটা বাঁচুক। তাকে আমি যা দেবার দেব, ভাতের জন্য ভাবতে হবে না।'

জয়হরি নির্বোধ, লোভী তায় হৃদয়হীন ভুবনের সহায়তায় সে খইমালাকে এনে এড়াচিতে রাখল। পরে ক্রমে ক্রমে, মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথা জানতে পেরে খইমালার মা যত আছাড়িপিছাড়ি করুক, সে কখনই বৈষ্ণবঘাটের পথ মাড়াল না। মুখে বলত বটে, 'খইমালার কপালে আছে তাই ছেঁচা খ'চ্ছে। আমি কী করব বল, এই জন্যেই মনুতে বলছে পুরুতের কলিকালে কোনো হাত থাকবে না।' এখন এসব অঞ্চলে শহরের বাতাস বয়। শহরের বাতাস বইলে উটকো লোকের হাতে পয়সা হয়। সেই সব লোকদের কাছে জাঁক করে জয়হরি কথায় কথায় মনু বাৎস্যায়ন আদি ঋষিদের নাম আওড়ায়।

আসল কথা জয়হরি এদিকে পারতপক্ষে আসত না সনাতন দীঘড়ির ভয়ে। তিনি বলেছিলেন, 'সব পশুকে মারতে নেই, কিন্তু জয়হরিকে বধ করলেও আমার রাগ যায় না। জেনেশুনে তুই এমন পাপটা করলি?'

এ চার বছরে সনাতন দীঘড়িরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আর তিনি স্বরহীন হাহাকারে গান করে করে কালীতলার মাঠে, হাটতলায়, গঙ্গাতীরে একলা একলা ঘোরেন না। এখন তিনি সকালে সন্ধ্যায় ঠাকুরপাট বাড়ির চত্বরে বসে গান করেন, সকলে শোনে। কখনো-সখনো ভাগবতও পড়েন। তা ছাড়া ঠাকুরপাট বাড়িতে কাঙালি-অতিথির সেবা হয় কিনা, দেবতার ভোগে ফাঁকি পড়ে কিনা, সবই দেখেন।

তাঁর দাদা দেহরক্ষা করবার আগে, বাকি এজমালি সব সম্পত্তিই দেবত্র করে রেখে গেলেন। সনাতনের হাত ধরে বললেন, 'ভাই, ঠাকুরপাট বাড়ির আয়ব্যয়ের সম্পূর্ণ ভার তুমি লও। তুমি ভিন্ন আমি অন্য সৎ লোক জানি না।'

এখন সনাতন অনেক কর্তব্য স্বীকার করেছেন। ভাগবত শুনতে যারা আসে তারা তাঁর মুখের শান্ত শ্রী দেখে মনে ভাবে, ঠাকুর নিশ্চয় কিছু পেয়েছে। দৈবী কৃপা না পেলে সেই খ্যাপা হাতির মতো অশান্ত স্বভাব কোথায় গেল?

শহরের আওতায় থাকলে মানুষের মনে ব্যাবসাবুদ্ধি আসে ও সর্বদা মনে হয় কেমন করে ধনী হই। কিছু কিছু লোক থাকে, যেমন কাগজের ব্যাপারী নসীরাম' অথবা মাছের ব্যাপারী সাধু দাউ, যারা একটি ডাব খেতে গেলেও কোথায় ডাব ফলে, কোথায় চালান দিলে লাভ হয়, পানটি গালে দিতে গেলেও পানের বরজে লাভ আছে না ক্ষতি, এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক কথা বলে। কিন্তু আসলে, সময় এলে দেখা যায় এরা বড়োই হিসেবি, ভীরু, যা জানে তার বাইরে নতুন ব্যাবসা করতে একেবারে নারাজ।

নিজের দোকানের দাওয়ায় বসে দিনে দশবার এরা বরিশাল থেকে সুপুরি, সিলেট থেকে চুন, সুন্দরবনের হোগলা আনতে যায়, কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় এদের কাছে 'ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ।' এদের মতো লোকরা সনাতন দীঘড়ির এখনকার চোখমুখ দেখে বলতে লাগল 'ঠাকুর কি পেয়েছে সেটি জানতে পারলে হত।'

সনাতন এদের মনের কথা জানতে পারলে বড়োই আশ্চর্য হতেন। কিছু পেয়ে তাঁর মনে প্রশান্তি আসেনি! পাননি, কিছুই পাননি তিনি। ভগবান ভগবান করে ছুটে বেড়িয়েছেন, তারপর আর ছুটে বেড়ালে বুড়ি ছুঁতে দেরি

হয়ে যাবে ভেবে গুটিয়ে এসে নিজের মধ্যে বসেছেন। এখন তিনি যা পাওয়া যায় না সেদিকে চেয়ে না থেকে, যাদের কাছে থাকেন তাদের মনে ছিটেফোঁটা শান্তি বিধানের চেষ্টা করেন।

খইমালার মাও মাঝে মাঝে ভাগবত শুনতে আসে। সবাই চলে গেলেও স্থাণুর মত বসে থাকে। দীর্ঘ চার বছর ধরে তার দুটি নীরব চোখ সনাতনকে তিরস্কার করে আসছে। যারা সাধারণ, তাদের কাছে তার প্রত্যাশা ছিল না কিছু। কিন্তু যাকে জেনেছিল অসাধারণ বলে, সে কেন দুঃখিনীর বাছাকে রক্ষা করল না? বিবেকের নির্দেশ মতো কাজ যদি না কর, তাহলে নিজেকে বিবেকী বলে প্রচার কর কেন?

খইমালার মা-র চোখের এ তিরস্কার দেখে সনাতন অনেক সময়ে ভাবেন অন্য সকলের চেয়ে তবে কি তিনি অন্যরকম? তাই কি তাঁর কাছেই সকলের দাবী থেকে যায়? বিবেকে, নীতিতে, ব্যবহারে, তাঁরই কি এক আদর্শ মানুষ হবার কথা ছিল?

এ কথা যখন ভাবেন, তখন খইমালার মা-র চোখের দিকে তাকালে তাঁর ক্রোধ হয়। দেবতা হতে পারেনি তাই খইমালার মা অভিযোগ জানায়। কেন, তিনিও দোষেগুণে মানুষ, এ কথাটি মেনে নেয় না কেন?

সনাতন জানেন না এতদিন বাদে তাঁকে সকলের মতো আর একজন মানুষ মাত্র, এ কথা এরা ভাবতে পারে না। তাই তিনি এখন রাগ হলে আর হেস্টিংসের মুন্সীর কথা বললেন না। বলেন, 'যত বড় পণ্ডিত হও, সাধক হও, চিলুতে চড়ালে সবাই সমান। সন্নেসী, শিবাসাধক স্বামী শিবানন্দ আর মহাপাপী ঐ হারাণ শুঁড়ি, চিলুর আগুনে যখন ঝলসে গেল, তখন আর কারো চেহারার তফাৎ রইল না। তবে এত দাপ কিসের অ্যাঁ?'

তাঁর মুখে পাপীর প্রশংসা শুনে দুষ্ট লোক বলে তবে কি তিনি এতদিনে কোনো পাপ করেছিলেন।

এই চার বছরে গোলাপী সাধু সাউ-এর আশ্রয় ছেড়েছে। সে এখন নিজেই তামাকের গুল ও টিকে বেচে। যা পায় তা দিয়ে নিজের ও আশ্চর্য ফকিরের প্রতিপালন হয়। সাধু সাউ সহজে তাকে ছাড়তে চায়নি, কিন্তু গোলাপী বলল, 'মন ছিল বলে ঘর বেঁধেছিলাম গা, এখন মন নাই। এখন তুমি জোর কয়ো না। আশ্চর্য ফকির এখন কানা, চোখে দেখে না। তার ওপর

রক্ত কাসে বলে আমার ঘরের ছোঁয়া মাড়ায় না। উনি পুঁথি বলবে, আমি শুনব. এই ভাল গা। তুমিও মেয়ে তোমার বউ ছেলে নিয়ে এস না কেন, পড়ন্ত বেলায় সেবাযত্নের জন্তে আপনার লোককে কাছে ডাকো। নষ্ট মেয়েম.মুষের হাতের ভাতজল আর কত খাবে? নরকের যমদূত ডাঙশ মারবে না?'

জীবনের পড়ন্ত বেলায়, ঝিঙেফুল ফুটবার সময়ে, গোলাপীকে এমনি শুচিবাই এ পেয়ে বসল। বেশ্যাকে কেউ ভাল কথা বলে না। বেশ্যার ঘরের চৌকাঠে পা দিলেই ভাল লোক, মন্দ লোক সবাই একরকম হয়। সবাই মজা লুটতে চায়। তাহলে ভাল কথা বলবার যখন কেউ নেই, তখন গোলাপী নিজেই ঠিক করল এখন তাকে ভাল হতে হবে। এ চার বছর বলতে গেলে সে ভালই আছে। আশ্চর্যও ভাল আছে। খইমালাকে তারা সব সময়ে চোখে দেখে না। তবু তার কথা তারা বলে। গোলককে দেখে বলে। গোলক কার দুঃখে পাগল হল সেটি গোলাপী জানে। মাঝে মাঝে সনিশ্বাসে বলে, 'কি যে দেওয়ানা হবার কথা শুনিয়েছিলে ওকে!'

কচিৎ কদাচ। অন্য সময়ে তারা নিজেদের কথাই বলে। আশ্চর্যের দেহ গলিত, জীর্ণ। কিন্তু দেহাতীত প্রেমে সে মাঝে মাঝে অস্থির হয় ও বলে, 'আমাকে কি গোরগাড়া করবি না পোড়াবি গোলাপী? তুই কেন কলমা পড়ে ফকিরানী হ না?'

গোলাপী এ কথা শুনলে রেগে যায়। বলে, 'তোমার সমাজ আর আমার সমাজ কি এক? তুমি গোরে যাবে, আমি গড়ের শোঁসানে যাব। আমি ভাল হয়েছি, তাই তোমার সেবা করি। তা বলে কলমা পড়তে যাব কেন?

এরা দুজন নিজেদের নিয়ে ভালই আছে।

আর সবই পারবর্তনের মুখে। গঙ্গাতীরের সমৃদ্ধি বাড়বাড়ন্ত। গড়িয়ার হাটে এখন কচিত সাহেবদেরও দেখা যায়। রথতলার মাঠে রথের মেলাটির জাঁক বেড়েছে। এখানে এখন কত লোক যাওয়া আসা করে ও বৈষ্ণবঘাটা গড়িয়া দিকে দিকে এমন জনবসতি বাড়ছে যে যারা কচিৎ বাইরে আসে তারা এসব জায়গা দেখলে সত্বর চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। চেনা মুখের মধ্যে শুধু ভুবনকে দেখা যায় না। সাপে কেটে সে গত বছর মরেছে। মরবার আগে তার এতখানি জিভ বেরিয়ে এসেছিল। ওঝা তামার পয়সা দিয়ে জিভটি ঠেসে ঢোকাতে পারেনি।

কিন্তু, কি ভুবনের মৃত্যুযন্ত্রণা কি অন্য কোনো যন্ত্রণা, গোলকের উন্মাদ হওয়ার দুঃখটির সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না।

গোলককে দেখলে সকলেরই বুক ফাটে এই জন্যে যে তাকে দেখলে কে বলবে তার ভেতরে চৈতন্য নেই? তার চোখের চাহনি এখনও তেমনি ভাবে ভরা, গভীর। ঠোঁটে সব সময়েই মৃদু হাসি খেলা করে। তাকে দেখা যায় ঘাটের রাণায়, হাটতলায়, ঠাকুরবটের পাড়ে। গোলক সর্বদা আপনার ভাবে অচেতন। মাঝে মাঝে শুধু কি খেয়াল হয়, তখন ঠাকুরবাটের ঝুরিতে নেকড়া বেঁধে ধীরে বলে, 'আমায় দেওয়ানা করে দিও না ঠাকুর! পাগল হতে আমার ভয় করে!'

তার কথা শুনলে অতি বড় পাষাণেরও চোখ ফেটে জল আসে। তার মুখে সনিশ্বাস 'কৈতরী!' শুনে সকলেই নিশ্বাস ফেলে। 'এমন রাজকান্তি চেহারা, এমন ছেলে পাগল হলে মা মাগী কি বাঁচে গো?' পথের মানুষও বলে।

কেউ ওষুধ করেছে, এ কথা আগে সবাই বলত, এখন আর বলে না। কেননা রোজা, সাধু, সন্ন্যাসী, ঝাড়ফুক, তন্ত্রমন্ত্র এসব কথা শুনলে গোলক বড ভয় পায়। বলে, সব কথা বেরিয়ে পড়লে তার বড় নিন্দে হবে ও 'আমাকে ওদের কাছে নিও না মা।' বলে হাউ হাউ করে কাঁদে।

গোলকের মা বাবা এখন আর কিছু করতে চায় না। বিশেষত: গোলকের বাপ। গোলকের মা-কে অনেকে অনেক কথা আজও বলে। দেশ জোড়া দেব-দেবীর থান, সব থাকতে ছেলেটাকে পাগল করে রাখবে?' এ কথা বলে গোলকের মা ঘন ঘন মূর্ছা যায়।

গোলকের মা-র কথা শুনে ঈশ্বরপাটনী আগে খুব চেষ্টা করত।

কে বললে, 'আ গো, পাটনীর বউ! তিরোল-কালীবাড়ির বালাটি এনে ছেলাটির হাতে দাও। উ-তে পাগল হাতি ভাল হয় গো।

ঈশ্বর তিরোল কালীবাড়ির বালা এনে গোলককে দিল গোলক বালাটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর অবাক হয়ে বলল, 'লোহার বালা কেন বাবা? আমি কি সত্যিই পাগল হয়েছি?'

'না বাপ। ই তোমার বায়ের (বায়ুর) অসুক, বালাটি পরলে ভাল হবে।'

গোলক বালা পরল, তারপর একসময়ে বালা কোথায় ফেলে দিল।

গোলককে দেখে দেখে একদিন গোলাপী ঈশ্বরের বাড়ি এল। ভাল হয়ে যাবার পর গোলাপীর মনে এখন ভাল চিন্তার শেষ নেই। আশ্চর্যকে খাইয়ে দাইয়ে, ওর রক্তকাসের গামলা ধুয়ে মেজে নিজে গঙ্গাস্নান করে গোলাপী এ বাড়িতে এল।

'অপাটনীর বউ, কি রান্ধ দিদি ?'

'কে, গোলাপী ? আর দিদি, রাধি যেমন তেমন মরা মাছের ঝোল।'

'উ কি, থালার পাশে ছাই কেন ?'

'আর দিদি, বাউড়ীদের শেতলা বললে গোলক বুঝি কার নজরে পড়েছে। ভাতপাতে ছাই দিও। অপদেবতা ছেড়ে যাবে।'

গোলাপীর হাত দুটো ধরে গোলকের মা কেঁদে বলল, 'দিদি, তুমি তো কত কিছুর সুলুকসন্ধান জান। মোর ছেলাটা ভাল হয় এমন কুন ফকির রোজা জান না ?'

গোলাপী একজন রোজার খোঁজ দিয়েছিল। রোজার দেশ সেই কোথায় বরিশাল না কোথায় যেন। সুপোরির নৌকো চেপে এ দেশে চলে এসেছে। গোলককে দেখে সে বলল, 'এই ছাওয়াল নি পাগল অইছে? না মেঞা, আমি কই, ইনিরে বুঝি কেউ দিওয়ানা করছে। হোনেন, এই এই জিনিস লাগব।'

জিনিস এল। রোজার বাড়িতে গোলক আর ঈশ্বর। সময় সন্ধ্যেকাল। রোজা যেই বলল, 'দেন শ্মশানের সতীর গলার খইমালা ওর হাতে দেন !' অমনি গোলক চঞ্চল হয়।

'নেন, খইমালা জলে দেন !'

এ কথাটি শুনে গোলক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'বাবা গো ! কৈতরীকে জলে দিও না বাবা !' খইমালাটি গোলক তুলে মাথার চুলে জড়াল আর বলল, 'ভয় কি কৈতরী ?'

'আরে আরে, এ জবর দিওয়ানা, কার নাম কয় ?' রোজা চেঁচিয়ে উঠল।

ঈশ্বর ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এল।

তার মনে খটকা লেগে গেল। প্রথমে ইচ্ছে হল গোলককে ধরে মারে। তারপর মনে হল মেরে ধরে বা কি হবে, এ ভাগ্যের দোষ। 'নেত্য ঠাকুরবউকে

গড় করে কাজে যাই, ঠাকুরমন্দিরে বা তাসা না দে নৌকো ছাড়ি না। আমারে ঠাকুরবট এত বড়ো শাস্তিটা দিলে?'

ঈশ্বর খুব দুঃখ করেছিল।

তারপর থেকে ছেলেও বলে, 'আমাকে গুণীর কাছে নিয়ো না।' বাপও বলে, 'ওরে গুণীর কাছে নেব না।'

দুজনেরই ভয় পাছে গোলকের মনের কথাটা বেরিয়ে আসে।

ঈশ্বর জানে বামুনের মেয়েকে পাটনীর ছেলে ভালবাসে এ কথাটি জানাজানি হলে কলঙ্কের শেষ থাকবে না।

দানীমণ্ডল তাকে বলেছিল 'ঈশ্বর, এতজন আমার কাছে সেরে গেল। তুমি ওকে একবার আনলে না? একবার ফকিরপাটে বাঁধতে দিলে না? তোমার বড়ো ছেলে বলে, বাপ ওর আরোগ্য চায় না। এ কথা কি ভালো?'

ঈশ্বর চুপ করে রইল।

'আমার ওপর বিশ্বাস না থাকে বলো তেমন গুনিনের কাছে লয়ে যাই। পেট থেকে সব কথা বের করে নেবে, ছেলে ভালো হবে। আমার মনে হয় গোলকের এ বাইব্যামো নয় ভাই, কে ওষুধ করেছে।'

ঈশ্বর মাটির দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগল। ময়লা চাদরে চোখ মুছে বলল, 'গোলককে আরাম করে এমন ওষুধ কোনো গুণীর, কোনো রোজার হাতে নেই দাদা! তুমি আমি ইয়ার কী করব বলো? ছেলেটির কপাল মন্দ!'

'সে কী কথা ঈশ্বর?'

'হক কথা। আমি সব জানি। জানি, কিন্তু জানতে পারব না, আমার আর কিছু শুধিয়ো না।'

এখন দানীমণ্ডলের মনে নানারকম সন্দেহ হতে লাগল। গোলকের পাগল হবার মূলে ঈশ্বরের কোনো হাত নেই ত? হাত আছে ভাবতে খারাপ লাগে। আবার, আর একদিক থেকে ভাবলে দেখা যায় ঈশ্বরই তার আরোগ্যে বাধা দিচ্ছে। এ-ও কম আশ্চর্য নয়।

সাত-পাঁচ ভেবে সে ঈশ্বরের বড়ো ছেলেকে বলল, 'গগন, তোমার মামাশ্বশুরই যে গুনিন, সে কথা আমি ঈশ্বরকে বলিনি। কাউকে কিছুই না জানিয়ে তোমরা বাজ করো। এতে ত গোলকের থাকতে হবে না, শুধু তোমার মা কাঠ আংরার আঁচে পাঁচসের চাল ভাজবে। এই ত।'

'আজ্ঞা। চালটি যেমন কালো হবে, তেমনি জানা যাবে ও আর ভালো হবে না। চালটি সাদা থাকলে গোলক ভালো হবে।'

'তাই কর গা যেয়ে। দুর্গা, দুর্গা! আমারও কি ইচ্ছে হয় না, ছেলেটাকে সুস্থ দেখি?'

গগন বড়ো গঙ্গায় বড়ো নৌকো বায়। ফুরন করে যাত্রীরা তার নৌকোয় ত্রিবেণী হুগলী, দিকে দিকে যায়। বছর কয়েক হল গগন বড়ো গাছে নৌকো বেঁধেছে। গোলকের সঙ্গে যার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, সেই কুসুম এখন তার দ্বিতীয় পক্ষ। কুসুমের বাবা অধর দাস পাটনীসমাজে মান্যগণ্য পুরুষ। গগন এখন তার শ্বশুরবাড়ির কথায় ওঠে, তাদের কথায় বসে। গোলককে সে সারিয়ে তুলতে চায়, সেটি তার নিজের মতে নয়।

'মা মাগীর কাম্য, জানলেন মণ্ডলকাকা? লইলে, উনারা য্যাত ভালো ভালো করুক, আমার বিশ্বাস গোলক ত্যাত ভালো লয়। স্বভাবের দোষে মাথা বিগড়িয়েছে। মা এই গুনিন রোজার পেছনে কম কড়ি ঢালছে না। ইদিকে আমি আছি, আমার পরিবার আছে, তোমার ছেলে একটি লয়, আরো আছে, সিটি ভাবা উচিত, না কী বলেন?'

'নিশ্চয়।' সংক্ষেপে বলে দানীমণ্ডল তাকে বিদায় দিল ও তার সাকরেদকে বলল, 'কী র'ম বুঝলি? অ্যা? আমরা বলতাম ঈশ্বরের চার ছেলে, ওর কপাল চ'চ্চড়িয়ে খুলে যাবে। এখন যা দেখছি তা ত ভালো লয়, না কী বলিস?'

'ভেয়ে ভেয়ে হিংসে রীষ, এ আর ভালোই বা কী, মন্দই বা কী, রাবণে-বিভীষণে, কার্তিকে-গণেশে, এ আর কবে ছিল না বলো?' সাকরেদ নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিল। যতদিন দানীমণ্ডলের ভালো কামাই হত, তারও কড়ির গেঁজে মোটা হত, ততদিন সে মাতব্বরের মন রেখে কথা বলত। এখন দানীমণ্ডল পড়তি মানুষ, পাগল সারাতে পীর-থানে যায়, তাই সাকরেদ কচিৎ দানীর মন রেখে কথা বলে।

কিন্তু, গগনের মামাশ্বশুর যথাসময়ে ঈশ্বরের বাড়িতে এলেন। ছেলে ভালো হবে এই আশায় ঈশ্বরও শেষে রাজি হয়েছিল। ঈশ্বরের বাড়িতে পাঁচজাতের মানুষের ভিড়, যজ্ঞের জায়গায় মানুষ থই থই করতে লাগল। এমন কী, সনাতন দীঘড়ি পর্যন্ত ঈশ্বরের অনুরোধে এসে বসলেন। এটিও একটি সামাজিক কাজ। প্রতিবেশীর প্রতিটি কাজেই সঙ্গে থেকে করিয়ে দিতে

হয়, সে বিয়ে, শ্রাদ্ধ, শবযাত্রা চুড়ো-করণ, হোমযজ্ঞ, যাই হোক না কেন।

দীঘড়িদের ঠাকুরপাঠ বাড়ি থেকে বড়ো বড়ো তাম্রকুণ্ড আনা হল, একটা মস্ত পিদিম, সেটা সারারাত জ্বলা চাই।

সব আয়োজন শেষ হলে গুনিন বললেন, 'একবার ছেলাটিকে আনা করান, চক্ষে দেখি। একবার দেখব, বাস!'

কিন্তু গোলককে কোথাও পাওয়া গেল না। এখন তাকে খুঁজতে যায় এমন সাহস কারোরই হল না। কেননা বাইরে বড় দুর্যোগ, তুফান, বৃষ্টি। 'শ্রাবণ মাসের এই রকম দিনই ভালো', গুনিন বলেছিলেন।

৫.

আজ বহুদিন পর সেইরকম দুর্যোগ।

এমন দুর্যোগ খইমালার বিয়ের সময়ে হয়েছিল, আবার এই হল। এ দুর্যোগে কেউ বাইরে বেরোয়নি। বনের শেয়ালও বুঝি বনে আছে।

এ দুর্যোগে, শ্মশানযাত্রীরা শব বার করে না, ঘরে রেখে বাসি করে। ইচ্ছে হলেও বাইরে আসার উপায় নেই। কাকদ্বীপ, গেঁওখালি কতই বা দূরে। সমুদ্রের বুকে, শ্রাবণে ভাদ্রে যে ঘূর্ণিবাত্যা ওঠে, তা দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র দাপাদাপি করে। আজ অনেকদিন বাদে আবার সোনারপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, বারুইপুর, ওদিকে ধবধবা-গোবিন্দপুর, এদিকে এড়াচি, রাজপুর, কামডহরি সর্বত্র ঘূর্ণি হাওয়ার মাতামাতি, মহাদুর্যোগ। মানুষের জন্ম-মৃত্যু কারো জন্যে অপেক্ষা করে না, কিন্তু প্রসূতির জন্যে দাই ডাকবার উপায় নেই, মানুষ মরলে বের করবার উপায় নেই, জগৎ সংসার নিরুপায়।

এই দুর্যোগে, একা খইমালা, বাড়ির বাইরে।

এ চার বছরে স্বামীর সেবা করে সে তাঁকে সারাতে পারেনি। ক্রমে নীলমণি বিছানা নেন। তারপর তাঁর রোগশয্যার খবর পেয়ে ভিন্ন গ্রাম থেকে সেই বিধবাটি এসে উপস্থিত হয়। সঙ্গে তার ভাইরাও ছিল।

তারাই খইমালাকে যারপরনাই কষ্ট দেয়। এদিকে নীলমণি, খইমালার

রূপ-যৌবনকে, খইমালাদের নারকেল গাছ ও দো-চালা বাড়ির মতোই নিজের সম্পত্তি ভাবতেন। সম্পত্তি আছে, অথচ ভোগ করতে পারছেন না, সেজন্যে তাকে চোখের আড়াল দেখলেই কুৎসিত সন্দেহ করতেন। বিছানায় পড়ে থাকলে কী হয়, পায়ে বেশ শক্তি অনেকদিনই ছিল। সে শক্তির চিহ্ন এখনো খইমালার শরীরের কোথাও কোথাও আছে।

শেষের দিকে তাঁর ঘোর সন্দেহ হয় খইমালা তাঁকে বিষ দেবে। তার হাতেও খেতে ভরসা পান না। সে ভাগ্নীকেও ভরসা হয় না। শেষ অবধি না খেয়ে তাঁর নাড়ি শুকিয়ে যায়। তারপর তাঁর আগেকার দুই ছেলে এসে উপস্থিত হয়। সকলেই মনে করত খইমালা স্বামীর সম্পত্তির হদিস জেনে ফেলেছে। ফলে খইমালাকে বড়ো কষ্ট পেতে হয়। এ-অঞ্চলে বউয়ের ওপর নির্যাতন এমন কিছু নয়। কিন্তু তার মধ্যেও এ কথাটি বিশেষ রটে যায়, নীলমণি ঘোষালের বৈষ্ণবঘাটার পরিবারটির মতো সহ্যগুণ এ যুগে কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

এদিকে, তাকে যে তাড়িয়ে দেবে তাতেও কেউ রাজি ছিল না। কেননা রোগের প্রকোপে নীলমণির নিঃশ্বাসে, কফে, সমস্ত গায়ে তীব্র দুর্গন্ধ। খইমালা ছাড়া কেউ তাঁর কাছে যেতে পারে না। পরশুদিন নাক বসে যায়, ও তাই দেখে নীলমণির জ্ঞাতি গুণমণি ঘোষাল কবিরাজকে বললেন, 'আর কী দেখ? এখন আমগাছ কাটতে বললেই হয়।'

আজ সন্ধ্যায় নীলমণি চোখটি বুজেছেন। মৃত্যুর আগে, জ্ঞান হারাবার আগেই তিনি আধাবিকারে বলেছিলেন, 'আমার পইতেবাঁধা চাবি, সিন্দুকের নিচে।' কিন্তু আর কিছু বলেননি। নীলমণি ঘোষাল আজ সন্ধেবেলা মারা গিয়েছেন। মড়ার কাছে ওরা খইমালাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। এত রাতে, এমন দুর্যোগে। মড়া পোড়াতে আসতে কেউ রাজি নয়। তাই ঠিক হল সকালবেলা প্রায়শ্চিত্ত করে শবদাহ হবে।

নিজেদের মধ্যে কী ফিসফিস করে বলছিল ওরা, খইমালা শুনতে পারনি ওরা বলল মড়া ছুঁয়ে থাকো, ও মড়া ছুঁয়ে বসে রইল।

দরজার শেকলটা টেনে দিতে বলল ওরা।

ও ঘরে বসে ওরা যেন কী বলাবলি করছিল।

নীলমণির বড়োছেলে চেঁচিয়ে কথা বলে। সে বললে, 'পনের টাকা পাঁচআনা তিনপয়সা খরচ। আমরা তিনজনে ভাগ করে খরচ দেব। এখন তুমি বলছ

সতীবস্তোর দেবে না, ঢুলীকে আটগণ্ডা পয়সা দেবে না। পুরুত তিনটি টাকা নেবে তা দেবে না। বাবা ইয়ার কমে হয় কী করে বলো দি'দি।'

ভাগ্নী বলছিল, 'এ একবারের খরচ, জানলি হরিশ? তা' পরে তুই সব নিজের পেটে পোরুনা কেন?'

খইমালার ভাসাভাসা মনে হচ্ছিল কথাগুলো ও বুঝতে পারছে অথচ যেন বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।

একটু রাত হতে সবাই যে যার দোরে খিল দিলে। তখন কে যেন দোরে শেকল নাড়া দিলে।

ওদের পাটকরুনী ঝি। উঠোন লেপে, ধান ভানে, বাসন মাজে। খইমালাকে যা হোক ও তবু একটু দেখাশোনা করত। আজ ঘরে ঢুকে ও খইমালার কাছে এসে বসল ও ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'কাল তোমার কাছে এসতে পারবুনি আঙাবউ, কাল তোমায় নে' সকলে টানাছেঁড়া করবে। তোমার হাতের আঙাকড়টা আমায় দেবে মা? আমার ছেলা দেশান্তরী, বউটা চক্ষের জলে ভেস্তে ঝায়। কাল তুমি সতী হবে। সতীরঙ্গের (অঙ্গের) অলঙ্কারে মানুষের ভালো হয় মা।'

খইমালা কিছুক্ষণ ওর দিকে সুন্দর, কালো, অবাক চোখ দুটি তুলে চেয়ে রইল। বুঝতে পারছে সে, সব বুঝতে পারছে। ওকেই ওরা কাল নীলমণির সঙ্গে বেঁধেছেঁদে পোড়াবে। তাই সতীবস্ত্র, পুরুত আর ঢুলীর কথা হচ্ছিল। খইমালার হঠাৎ মনে হল ওরা কি জানে, এই চার বছর ধরে ও শুধু গোলকের কথা ভেবেছে? সেইজন্তে ওকে সতী করতে চায়? টাকাপয়সা সোনাদানার কথা খইমালার মনে হল না, কেননা নীলমণির সম্পত্তিতে ওর অধিকার আছে বলে ও কোনো দিনই মনে করেনি।

ঝি অস্বস্তির সঙ্গে ওকে দেখছিল। কী আশ্চর্য রূপ রাঙাবউয়ের—যেন পটের ঠাকুর। এত অযত্নে, এত অনাদরে তবু কী রূপ।

এ আগুনের খাপরা কোথায় আখবে সেই ভেবে উনারা ওঁয়াকে সতী কত্তেছে, ঝি মনে মনে ভাবল।

খইমালা হাত থেকে লাল কড়, সোনার সরু রুলি, সব ঝি-কে দিল।

'এ কী গো আঙাবউ! এ যে সোনা গো!'

'তুমি নাও।'

'নেব ?'

'নাও।'

'তুমি সগ্যবাসী হও মা, বেঁচেজীয়ে থাকো!'

পাছে কেউ দেখে কেড়ে নেয় সেই ভয়ে ঝি তাড়াতাড়ি চলে গেল। যাবার সময়ে ভাবল কাল যাকে সতী করবে আজ তাকে কেউ একলা ফেলে রাখে? এ বাড়ির সবই সৃষ্টিছাড়া।

খইমালা আস্তে উঠে দাঁড়াল। ঝড়ের দাপে গাছপালায় শন্‌শন্‌ শব্দ। খইমালার মনে হঠাৎ বাঁচবার ইচ্ছে প্রবল হল, ভীষণ। দরজার চৌকাঠে এক পা রেখে ও একবার ভাবল, না, এমন কাজ করবে না।

তারপর দেখল, না, তার মনের কোথাও স্বামী নেই, কোনোদিন ছিল না। গোলক তার ছোটবেলার সাথী, কতদিনের বন্ধু। গোলক ছাড়া অন্য পুরুষের কথা তো সে চিন্তাতেও আনেনি?

খইমালা দরজার বাইরে পা দিল।

যেমন করে হোক সে মীরকাজির ঘাটে গিয়ে হোগলার নৌকোয় চড়বে। হোগলার নৌকো রাতদিন গঙ্গা বায়, তাদের দেশের দিকে যায়। হোগলার নৌকোর মাঝিরা তবু শরীরে দয়া রাখে। তাদের পায়ে ধরে খইমালা বলবে, 'যেমন করে পার আমাকে মায়ের দেশে পৌঁছে দাও।' সেখানেও যদি এরা তাকে ধরে আনতে যায়, তাহলে খইমালা আরো দূরে যাবে!

দুর্যোগের রাত হলে কী হয়, আসলে শুক্লপক্ষ। তাই অন্ধকারটি স্বচ্ছ। মেঘ-বাদলের রাত বোধ হয় এমনই স্বচ্ছ হয়। খইমালা এখন দেখল মাথার চুল সরাতে গিয়ে কিসে যেন চুল বাধে। হাতে সরু রুলি, লোহা। কার চিহ্ন? নীলমণি ঘোষালের চিহ্ন?

হাত থেকে টেনে গয়না ও আয়তির চিহ্ন সে ফেলে দিল। গোলাপী নরকের ভয় করত, খইমালা এ চার বছর নরকবাস করেছে। পাকা ঘরে ঘুমোলে, আর ভরপেট অন্ন পেয়েও সব সুখ হয় না, নীলমণি তাকে বড় কষ্ট দিয়েছেন। বিকারে হাত কামড়ে ধরেছিলেন, এখনও ব্যথা আছে।

ঐ নদী, নদীতে নৌকো নাচে। এড়াচির পাটনীরা বড়ো ভীরু, তারা নৌকো তুলে নেয়নি কেন? এভাবে আছড়ালে নৌকো নিমেষে ভাঙে। এখন, একটি দাঁড় পেলে খইমালা এই তুফানেই নৌকো বাইতে পারে। এখন

খইমালার মনে হল তার শরীরে মত্ত হাতির বল, সকালের আলো ফুটবার আগে, আঁধারে আঁধারে সে একাই মার কাছে চলে যেতে পারে, অসাধ্য সাধন করতে পারে।

কিন্তু সামনের নৌকোয় গোলক ছিল। খইমালা নিমেষে চমকাল। গোলক কেমন করে এ দুর্যোগে এখানে এল? নাকি গোলক আর বেঁচে নেই, তাই প্রেত হয়ে প্রেত-নৌকা বায়? সে থমকে দাঁড়াল।

'কৈতরী? তুমি দাঁড়ালে কেন?'

'গোলক, সত্যিই তুমি!' এখন খইমালার মনে এক আশ্চর্য অপার আনন্দ। যেন ঠাকুরবট তার সব কথা শুনেছেন, তাই গোলক তাকে নিতে এসেছে। যেন সমাজ নেই, সংসার নেই, লোকনিন্দা নেই। শুধু গোলক আর খইমালা ছাড়া কেউ নেই।

কবে, কোন প্রাচীন শৈশবে দুজনে দুজনের সঙ্গে ঠাকুরবটের ছায়ায় বসে খেলা করেছিল, গোলকের সে কথাটি মনে আছে তাই ও খইমালাকে নিতে এসেছে।

'হ্যাঁ, আমি।'

'তুমি কেমন করে এলে?'

'তোমাকে নিতে। সন্ধেয়, দাদা বললে গুনিন আসবে। গুনিনকে আমি বড়ো ডরাই, আমার মনে পাপ আছে তো? পাপ থাকলে গুনিনকে ভয় হয়। তাই আমি নৌকো বেয়ে যাচ্ছিলাম। রাজপুরে জয়হরি পুরুত বললে, এড়াচির ঘোষালের অবস্থা এখন তখন, বুঝি হয়েই গেছে। নকুড়দাসের মেয়েটি রাঁড় হল। তাই কৈতরী, তোমাকে নিতে এলাম। জয়হরি বলে ভোর হলে ওরা তোমায় জ্যান্ত ছেঁচবে, আহা বড়ো কষ্ট। তার চেয়ে বামুন-মাসীর কাছে চল।'

গোলকের সব কথাই খইমালার কানে প্রলাপের মতো মনে হল। কিন্তু সে নৌকোয় এসে উঠল।

বড়ো তুফান। বাতাসের জোর। তা ছাড়া এ গঙ্গা বড়ো সঙ্কীর্ণ. এদিক থেকে ঠেলা না গেলে নৌকো ওদিকে আছাড় খায়। গোলক পাড় দিয়ে ধীরে ধীরে যেতে লাগল।

বৃষ্টির ছাটে খইমালার চুল, কাপড় ভিজতে লাগল। সে গলা তুলে জিজ্ঞেস করল, 'গোলক, তবে যে সবাই বলে তুমি পাগল হয়েছ?'

গোলক কিছুক্ষণ জবাব দিল না। তারপর বলল, 'কৈতরী, এ কথা বলো কেন? আমি ঠাকুরবটকে মানত করেছিলাম, পাগল হতে আমার বড়ো ভয়।'

খইমালার ভাসা ভাসা সব কথা মনে পড়ল। কখনো ধীরে, কখনো জোরে, বাতাস ও নদীর স্রোতের খেয়াল মতো নৌকো যেতে লাগল।

'গোলক, আমাকে নিয়ে কোথায় যাও?'

'অনেক দূরে যাই কৈতরী।'

'সেখানে গেলে আর ভয় নেই?'

'কিসের ভয়?'

'মানুষের।'

'না কৈতরী। কালিকাক্ষেত্রে যাই চলো। সেখান থেকে আমরা আরো দূরে যাব।'

অনেক দূরে গেলেই ভালো। এখন খইমালার মনে হল সে বুঝি আশ্চর্য কোনো দেশ। সে দেশে কেউ বলে না খইমালা কেন পাটনীর জাতে জাত দিল। কেউ বলে না তোর মনের কথাটি পাপকথা।

এখন যেন মনে হয় সেইসব কথাই সত্যি। সেই জোনাকি জ্বলা সন্ধ্যায় বালিকা খইমালা গোলকের সঙ্গে ঠাকুরপুকুরে পিদিম ভাসাতে যেত। ঠাকুরবটের ডালে মালা দিয়ে কে কাকে বলেছিল পরজন্মেও আমি তোমার কথা মনে রাখব?

'আশ্চর্য ফকির কেন ভালো উপাখ্যান বলে নি গোলক? কেন বলেছিল প্রথম পরস্তাবেই নায়ক দিওয়ানা?'

'আশ্চর্য জানে না কৈতরী।'

'পরের পরস্তাবে কী?'

'পরের পরস্তাব আমি জানি না।'

'তবে কে জানে?'

'কেউ জানে না।'

'আমার তোমার জন্যে কষ্ট হত গোলক'

'কষ্ট কেন কৈতরী?'

'ভয় হত।'

'ভয় কোরো না কৈতরী। এখন আর তোমার কোনো ভয় নেই।'

'তুমি আমার কথা ভাবতে ?'

গোলক একটু হাসল। এখন আকাশের মেঘ বাতাসের তাড়নায় ভেসে চলেছে। দিক্‌হারা হাতির পালের মতো কালো মেঘ।

'গোলক, কালিকাক্ষেত্রে যবে, তা গঙ্গা গিয়ে খালে পড়তে নৌকো ভাঙবে না ?'

'কোন্ খালে ?'

'কেন, বাঁশদ্রোণীর খালে ? না এখন আর সে ভয় নেই ?'

'ভয় নেই।' গোলক অস্ফুট বলল, ওই দেখ পুব আকাশ ফর্সা হয়।'

খইমালা দেখল পুব আকাশ ক্রমে তরল হচ্ছে। অদূরে হাটতলায় চালা। এমন সকালেও ঘাটে কত লোক।

'গোলক এ যে আমাদের ঘাট ?'

'হ্যাঁ কৈতরী।'

'এখানে কেন এলে ?'

গোলক সে কথার জবাব দিল না।

'গোলক, নৌকো বাও।'

'না কৈতরী, সকাল হয়েছে।'

'তাতে কী ?'

'তোমার কলঙ্ক।'

'কলঙ্কে আমি ভয় করি না গোলক, তুমি আমায় সঙ্গে নাও।' খইমালার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

'কৈতরী, এতদিন ভাবতাম ঠাকুরবট মিথ্যে, দেবতা নেই, কেন ভাবতাম জান ?'

খইমালা ঘাড় নাড়ল।

'যদি আমার মনে সত্যিই পাপ থাকে, যদি আমি সত্যিই পাগল হই, তাহলে জানব ঠাকুর মিথ্যে।'

'তা কি হয় গোলক ? শোননি যেদিন দেবতা চলে যাবেন, সেদিন থেকেই ঐ বটগাছের মূল শুকোবে, ক্রমে পড়ে যাবে। সেদিন থেকেই এই গঙ্গার মাহাত্ম্য যাবে, নদী মরবে।'

'শুনেছি, তাই না ? তুমি বললে বলে মনে পড়ল, নইলে এখন আর মনে পড়ে না।'

'আমার মনে পড়ে। তুমি আমি একসঙ্গেই শুনতাম। সেই, যখন আশ্চর্য ফকির আমাদের পুঁথি শোনাত।'

'আশ্চর্যের পুঁথি! ঠিক বটে।'

এখন, খইমালার মনে সেই অনেক আগেকার সৌরভ ফিরে আসতে লাগল, বুঝি বা চেষ্টা করলেই অনেক কথা মনে পড়ে। কিন্তু না, মনে পড়লেও সব কথা মনে করতে নেই। কিছু কিছু কথা বুকের কোটরে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দেহান্তে ছাই হয়। কিন্তু গোলক মুখ ফিরিয়ে আছে, খইমালার চেয়ে দেখতে দোষ কী?

'কৈতরী! ঐ ঘাট দেখা যায়। আমি পাড়ে লাগাই, তুমি নেমে যাও।'

'গোলক, তুমি আসবে না?'

'না কৈতরী। এখন, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি নিশ্চয় জানলাম আমার মনে পাপ নেই। কিন্তু ওরা তা জানে না। তুমি ওদের বলে দিয়ো।'

কিন্তু গোলকের হাতে লোহার কড় কেন? এমন আঙ্গি কাটা কড় দানীমণ্ডল হাতে পরায়, এ কী?

খইমালা বিস্মিত মুখে কথা নেই, সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

সনাতন দীঘড়ি, ঈশ্বরপাটনী, গগন, জয়হরি, চেনা-অচেনা আরো কত মানুষ, রাঙা কাপড় পরনে গুনিন, গুনিনের হাতে কিসের সরা?

'হায় গোলক!'

ঈশ্বরের গলার স্বরে দুঃখ, কাতরতা, শোক। গোলকের যে-কথাটি অপ্রকাশ ছিল, এখন এরা সকলে জানল। খইমালার জন্যে আজ এত বছর গোলক পাগল, এখন একথাটি কেমন করে চাপা দেওয়া যাবে?

গোলক তাড়াতাড়ি নৌকো নিয়ে মাঝনদীতে গেল। এখন নিমেষে তার মুখের শান্তভাবটি দূরে গেল। বুঝি খইমালাকে আনবে বলেই ভগবান ঐ শান্তভাবটি দিয়েছিলেন, এখন কেড়ে নিলেন।

'চাল সাদা থাকুক আর কালো হোক, আমি বলি নাই গোলক পাগল? বলি নাই, উ রোগটি সারবার লয়?'

গগন ছুটে এল, চেঁচিয়ে বলল। তারপর বলল, 'ধর্, গোলকের নৌকো ধর্। গোলক পালায়।'

খইমালা অসহায়। তার মুখের ভেতর জিভ আঠায় আটকাল, কথা সরে না।

'কৈতরী! তুমি ওদের বলো আমার মনে পাপ নেই, আমি পাগল নই। হেই দাদা! তুমি সাঁতার কাট কেন? তুমি কৈতরীকে শুধোও। হেই দাদা!'

'ঈশ্বরকাকা! গোলক পাগল নয়। তোমরা ওকে ধর কেন?' খইমালা আর্তকণ্ঠে বলল; খইমালা জানে তাড়া করে ধরলে বাঁধলে কেমন লাগে, আহা ওরা কী জানবে। গোলককে অমন করে ধরছে কেন? গোলক কি বনের পশু?

'কৈতরী! দাদা আমায় ধরে। তবে কি আমি পাগল? হা ভগবান আমি যদি পাগল হই আমার মনে যদি পাপ থাকে তাহলে ঠাকুরবট উপড়ে পড়ে, এই গঙ্গা মাহাত্ম্য হারায়, খবরদার! আমায় পাগল করো না!'

'গোলক!'

খইমালা লোকলজ্জা নিমেষে ভুলল। গোলকের দুঃখ সে বোঝে, তার মতো যন্ত্রণা এরা কে সয়েছে?

'গোলক, বৈঠা ফেলো না, জোরে জোরে বাও, সামনে খালের মুখ!'

'হেই ঠাকুর! দেবত্বের মায়া করো তো আমায় পাগল করো না। নইলে তোমার মাহাত্ম্য যায়।'

মজা পেয়ে এখন অনেকে নদীতে ঝাঁপ দেয়। গগন তাদের সবার আগে।

'কেন এত কষ্ট করলি কৈতরী! নাই, ঠাকুর নাই। এ গঙ্গা শুধু জল। শুধু জল।'

গোলক বৈঠা ফেলল, ডিঙির মুখ উলটে জলে ঝাঁপ দিল।

'যাস্ না গোলক, সামনে বাঁওড়।' ঈশ্বরের আর্ত চীৎকার কত দূরে গেল।

আশ্চর্য ফকিরের পুঁথির শেষ প্রস্তাবে কী ছিল খইমালা জানে না। 'গোলক! আমায় সঙ্গে নাও!' তার আর্ত আহ্বান গলায় ফুটল না। সে দেখল কী ঠাকুরবটে, কী জাহ্নবীতে কোথাও দেবতা নেই। গোলক, খইমালা আর তার ডিঙিকে যা টানে তা শুধুই নদীর স্রোত। গোলক আর খইমালাকে জল-স্রোত কলার খোলার মত অবহেলে ডিঙিসুদ্ধ শূন্যে ছুঁড়ে আবর্তে ঘুরিয়ে সামনের ফেনায় ফেলল।

তারপর তীব্র স্রোত, তারপর বড়ো গঙ্গা। ভাসতে ভাসতে গোলক আর খইমালা কতদূর গেল, আর দেখা গেল না।

## শরীর

১। সন্ধ্যায় মেয়েটি একটা রুপোলি ফিয়াট চালিয়ে গড়িয়াহাটার মোড়ে আসে। গাড়িটা বুলেভার্ডে রাখে। ও বাঁদিকের ফুটপাথে এসে দাঁড়ায়। উলটোদিকে বাজারের সামনে একটা কালো গাড়ি এসে দাঁড়ায়। একটি যুবক চালায়। ছেলেটি গাড়ি থেকে নামে না। ছেলেটির চুল এই বয়েসেই কাঁচাপাকা। পোশাক ওর সাধারণত শাদাই থাকে। ও গাড়িতে বসে মেয়েটিকে দেখে।

মেয়েটি কখনো কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বলে। রুমাল বের করে ঘাড়টা মোছে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে ওর গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। ওদিকের কালো গাড়িটা তখন আস্তে সরে যায়।

মাঝে মাঝে মেয়েটি কারো সাথেই কথা বলে না।

তখন কালো গাড়িটা খুব তাড়াতাড়ি সরে সেখান থেকে যায়।

২। মাঝে মাঝে মেয়েটি বিকেলে রুপোলি ফিয়াট চালিয়ে বালিগঞ্জের সেই চায়ের দোকানটার সামনে আসে। তখন কালো গাড়িটা থেকে যুবকটি নেমে আসে। ওরা দুজনেই চায়ের দোকানে ঢোকে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। কোনো কোনো দিন মেয়েটি কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বলে। তখন এই যুবকটি বেরিয়ে যায়। অবশ্য যুবকটি দেখে নেয় মেয়েটি রুমাল বের করে ঘাড় মুছল কি না। প্রায়ই মেয়েটি কারো সঙ্গেই কথা বলে না। যুবকটি অবশ্য দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে। যুবকটি শাদা পোশাক পরতে কখনো ভোলে না।

৩। মাঝে মাঝে মেয়েটি রুপোলি ফিয়াট চালিয়ে দুপুরে পোটোপাড়ার সেই বাড়িটার সামনে যায়। উলটোদিকের ফুটপাতের গা ঘেঁষে একটা কালো গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়িটার সামনের সিটে এক যুবক…।

সকালে মেয়েটির রুপোলি গাড়ি কোথাও দেখা যায় না। কেননা ও অনেক বেলা অবধি ঘুমোয়। ওর রাত অনেক রাতে হয়—যখন পথের কুকুর, কার্নিসের বেড়াল ঘুমিয়ে পড়ে। চাঁদ এবং পথের নিয়ন বিশ্রাম চায়, কলকাতার পথের গোটাকয়েক মূর্তি শুধু দাঁড়িয়ে থাকে, আর সকলেই

ঘুমিয়ে থাকে। শুধু আরশোলা ও ইঁদুরদের কথা বলা গেল না। ডক এলাকার ইঁদুররা এই সময়ে ঘুমন্ত খালাসী বা ভিখিরি পেলে পায়ের গোড়ালির নিচ থেকে সাবধানে একটু একটু মাংস কুরে খেয়ে চলে যায়। আর নরমাংসে ওদের প্রবল ভালবাসা। শোনা যায় বিম্বিসারের স্ত্রীও এক সময়ে আর নরমাংস···

মেয়েটি ফ্ল্যাটে ফিরে আসে আটটা নাগাদ। এসেই বাথরুমে ঢোকে। স্টিমবাথ নেয়। ওকে নিতে হয়। কেননা ওর কাছে কিছুক্ষণ বাদে যিনি আসেন, তিনি যদিও সকলের, 'সব নিবি কে সব নিবি আয় বলে' এক সময়ে যদিও তিনি তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঘর দোরের অনেকগুলোই দিয়ে দিতেন তবু এখনো তিনি নামে এবং পরিচয়ে নৃপতি। যদিও তিনি সকলের, তবু গোঁড়া বিধবা যেমন মুশুর ডাল আর হলুদ ছোঁন না, নৃপতিও মেয়েদের চামড়ায় নোংরা থাকলে স্পর্শ করেন না। দিকে দিকে বক্তৃতা, মিটিং করে, এই অসম্মানে মৃত ও সমাধিস্থ আমাদের বাংলার এদিক থেকে ওদিক অপরের জন্যে ছুটোছুটি করে ওঁর বয়স ষাটের কাছে হল। তবে এখনো বাপের মতো ( উনি এক ফরাসি ফকির ছেলে ) সুবিপুল চেহারা। এখনো উনিও স্টিমবাথ নিতে ভোলেন না। ওঁর বয়সে কলকাতায় ওঁকে অন্তত পনেরোটা মেয়ের জন্যে সময়ে সময়ে ফ্ল্যাট রাখতে হয়েছে। প্রতিটি ফ্ল্যাটে ঐ স্টিমবাথের বন্দোবস্ত ওঁকে করতেই হয়। 'সাধারণ মানুষ!' বলে চেঁচানো হচ্ছে এক কথা, কিন্তু কত আর সাধারণ হতে পারেন নৃপতি? ফরাসি রক্ত আর বাঙালি পরিচয় নিয়ে?

ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে স্টিমবাথ রাখেন, আর মেয়ে খুঁজতে শ্রী এম.-এর কাছে যান। এম-এর পুরো নাম বলা যাবে না, তবে একথা নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে এম. কাজের লোক। স্বতঃসিদ্ধ এই গাণিতিক রাশিফল। নৃপতির যদি রক্ষিতা দরকার হয়, তাঁকে ওদের কাছেই যেতে হবে। কেননা নৃপতির আবার কুৎসিত মুখ ও সুন্দর দেহের ওপর প্রবল আসক্তি। এ সব মেয়ে আজকাল হরদম তৃতীয় শ্রেণীতে মেলে। এই মেয়েটার বিশেষত্ব অবশ্য অন্যত্র। এর বাপ মা কোনো এক উপজাতির মানুষ। ওরা দুজনে একাধিক খুন করে ধরা পড়েছিল। ফাঁসি হয়ে যায়। ছোটো মেয়েটা সরকারি তত্ত্বাবধানেই বড়ো হয়। তারপর স্কুলে পড়ে, কলেজে আসে। ওর মুখচোখের কথা না বলাই ভালো। একধরনের প্রাচীন, কর্কশ পাথর দিয়ে দিয়ে যেন মুখটা তৈরি। চোখের চাহনি সাধারণত

দুর্বোধ্য। মুখে কী এসে যায়, শরীর, ওর শরীর, আদিম মানুষদের পূজিতা প্রতিমার মতো। কালো, আদিম, কঠিন, ভয়ঙ্কর।

আর সাহস। আর প্রবল বিশ্বস্ততা বোধ। সেই সঙ্গে যা এমকে আকর্ষণ করেছে, তা হল কোনো নীতি-নৈতিকতার ধার ধারে না মেয়েটা। মেয়েটি স্নান করে। ভালো জামাকাপড় পরে। বেরিয়ে আসে। তারপর ওর দরজায় একটা টোকা পড়ে। সেই যুবকটি আসে। দুটো টোকা পড়ে। এম আসেন। মেয়েটি একটা খাম মাঝে মাঝে পায় এমের কাছ থেকে খামটা ও লোহার আলমিরায় ফেলে রাখে।

তারপর এরা চলে যায়। নৃপতি আসেন। মেয়েটির সঙ্গে মাঝে মাঝে উনি এইভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তর চালান। মেয়েটিই কথাটা তোলে, কেননা প্রায়ই আজকাল ওর মনে হয় ও ঠিক কাজ করছে না।

এই যে আমাকে দিয়ে ওদের ধরাচ্ছে...

তুমি যে ওদের চেন।

মেরে ফেলে কেন ?

ওদের মেরে ফেলাই ভালো।

যদি ওরা বুঝতে পারে...

তোমাকে টুকরো করে ফেলবে।

আমাকে! মেয়েটি চুপ করে যায়। কী যেন ভাবে।

নৃপতি জিগ্যেস করেন, তোমার সেই তার খবর পাও না ?

না।

এখনো তাকে ভালবাস ?

মেয়েটি উত্তর দেয় না। নৃপতিকে ও একটু বিস্মিত চোখে দেখতে থাকে।

তুমি আমাদের সাহায্য কর কেন ? এম বলেন বলে ?

হ্যাঁ।

কেননা মেয়েটি এমের কাছে কৃতজ্ঞ। অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এমের হাতে ও বন্দী, নিরুপায়। দোকানে দোকানে চুরি করে বেড়াত ও, ধরা পড়ে ওয়ার্নিং পায়। তারপর অচেনা লোকের সঙ্গে বারে গিয়ে বসত। সুবিধে পেলেই তাকে সাহায্য করতে গিয়ে পার্সটা সরিয়ে নিত। মেয়েটি ধরা পড়ল এক অধ্যাপককে বাঁচাতে গিয়ে। ভদ্রলোককে এখানে দেখে ও অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিল। কেননা ওঁর বাড়িতেই উনি ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকতেন,

নানারকম কথা বোঝাতেন। ওঁর বাড়িতেই মেয়েটি যেত অনুপমকে একটু কাছ থেকে দেখতে পাবে বলে। অনুপমের সঙ্গে একঘরে থাকতে পাবে বলে। অন্যরা, আলোচনা করত, কথা বলত, বই কাগজ পড়ত। মেয়েটি শুধু অনুপমকে দেখতে। তারপর একদিন অনুপম ওখানে আসা বন্ধ করে দেয়। তারপর একদিন অনুপম ভি. আই. পি. হয়ে গেল। মেয়েটি সেদিন ওকে নিজেকে দিতে গিয়েছিল। অনুপম ওর ওপর খুব সুবিচার করেনি সেদিন কিন্তু মেয়েটির লজিক দেখে ও অবাক হয়ে গিয়েছিল।

মেয়েটি অনুপমকে চায়। এ জগতে কিছু চাইলেই কিছু দিতে হয়। মেয়েটি নিজেকেই দিতে চায় কেননা ওর আর বিশেষ কিছু নেই। অনুপম অবশ্য ওকে কিছুই না বলে ওর জীবন থেকে সরে গিয়েছিল। মেয়েটি সেই সময়ে কিছুদিন কী করেছে, কী করেনি, কিছুই বলতে পারবে না। কলকাতার পথে পথে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরত। মনে হত এবার ভুলে গেছে অনুপমকে, আর যন্ত্রণা নেই কোনো। কিন্তু ঘুম ভেঙে যেই চোখ তাকাত অমনি বুঝতে পারত যেমন ব্যথা তেমনি আছে। তারপর ও অন্য জায়গায় যেতে শুরু করে, অন্য জায়গায় মিশতে।

সে যাই হোক, এই অধ্যাপককে দেখে ওর অনুপমের কথাই মনে পড়েছিল। ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে হাত ধরেছিল। অধ্যাপকের পার্স্‌টা ও মাটি থেকে তুলে হাতে দিতে যায় কিন্তু অধ্যাপক 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে থাকলেন।

ফলে আবার সেই থানা-পুলিশ-ও.সি.—বাদামি কাগজে আবছা কালিতে ছাপা অনেক এ. বি. সি ভর্তি করা। এম. বললেন, কেতকী তুমি!

বেড়ালছানা যেমন বাড়ি চিনে চিনে ঠিক ফেরে, হাঁসের ছানা যেমন জলে পড়েই সাঁতার কাটে, মেয়েটির জেল-পুলিশের প্রতি সেই রকম হোমিং ইন্সটিংক্ট দেখে এম খুবই অবাক হলেন। ওকে ভালো করার চেষ্টা করতে লাগলেন বটে কিন্তু তারপর সহসা নৃপতি ওকে দেখতে পেলেন। যে নৃপতির সব কিছুই সকলের, নিজের বলতে শুধু সভা-সমিতির ফাঁকে ফাঁকে ফ্ল্যাট-মেয়ে-স্টিমবাথের গোপন রহস্য।

নৃপতি যখন জিগ্যেস করলেন, তুমি এ কাজ কর কেন? মেয়েটি কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল, তারপর 'এম বলেন বলে?' এ কথার উত্তরে ঘাড় নাড়ল।

তারও অনেক পরে বলল, 'তুমি এ কাজ কর কেন? ওদের ভয় পাও বলে? তোমার লোকেদের দিয়ে, এম-এর লোকদের দিয়ে…ওদের… ?'

নৃপতি ওর মুখের ওপর নিজের বাঁহাতের চেটো দিয়ে থাপ্পড় মারলেন। চটাস করে ভোঁতা শব্দ। মেয়েটির ঠোঁট কেটে রক্ত গড়াল। নিজের রক্ত দেখলে মেয়েটি এখনো মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যায়। এটা ওর রক্তের ইন্সটিংক্ট। ওর বাপ-মাকে ও চোখে দেখেনি কিন্তু ওর বাপ মা-ও, তাদের গায়ে গায়ে কেউ আঘাত করলে, রক্তপাত ঘটালে তবেই হেঁসোটা তুলে নিত। মেয়েটি ওর ঠোঁটের রক্ত মুছল। তারপর বলল, তোমার ছেলেটা না গীটার বাজায়? ও সেদিন এখানে এসেছিল জানো? জল খেতে। যেন এ ফ্ল্যাট ছাড়া জল খাবার জায়গা নেই কলকাতায়।

নৃপতি ওকে ডানহাতে টানতে লাগলেন। বাঁহাতে এখন একটা গেলাস। দুটো হাতই সমানে চলে বলে ওঁকে সব্যসাচীও বলা হত।

সেইদিনই ভোর রাতে মেয়েটির কাছে অনুপম এল। মেয়েটির কাছে আসবে বলে আসেনি, যে কোনো আশ্রয়। কিছুক্ষণের জন্যে লুকিয়ে থাকার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে এল।

তুই? অনুপমের হাতটা পকেটের দিকে গেল। অভ্যাসমাত্র। নিজেকে বাঁচানো উচিত। এই ধারণাবশত ও পকেটে হাত দিল কিন্তু এখনো ওর হাতের কব্জিতে জোর নেই।

আমি।

মেয়েটি আর অনুপম কিছুক্ষণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল। মেয়েটির পোশাক, ঘরের আসবাব, গেলাসের ছড়াছড়ি, নৃপতির প্রিয় নোংরা ছবির অ্যালবাম (কার্পেটে পড়ে ছিল) দেখেও অনুপম কিছু বলল না। শুধু বলল, একলা আছ? (তুমি বলল)

হ্যাঁ।

আমাকে একটু রাখতে পারবে? কাল চলে যাব।

পারব। কাল, কাল আমি তোমাকে পৌঁছে দেব। তুমি পালাচ্ছ তো? আমার গাড়ি আছে।

অনুপমকে ও নিজের শোবার ঘরে ঢোকাল। তালা বন্ধ করতে বলল ভেতর থেকে। ও বাইরে বসে রইল। বসেই রইল। তারপর একসময়

ঘুমিয়ে পড়ল। এই প্রথম ওর মনে রইল না রুপোলি ফিয়াটটা নিয়ে ওর কোথাও যাবার কথা ছিল। দুপুর গড়িয়ে গেল।

তারপর একসময়ে অতনু এল। অতনু, এম, আরো লোক, আরো অনেক লোক। সিঁড়িতে বুটের শব্দ।

অনুপম ওকে বলল, কত টাকা পাবি।

মেয়েটি কী করল বলে আপনাদের মনে হয়? সেই রাতে ওর ফ্ল্যাটে নৃপতি, এম এঁদের উন্মত্ত আনন্দের আসর বসেছিল। ও ওদের গুলি করতে পারত, মদে বিষ মিশিয়ে দিতে পারত। মেয়েটি সে-সব কিছুই করেনি।

ও বাথরুমের দরজা বন্ধ করেছিল। তারপর একটা শব্দ হয়। নিচে চিৎকার। নৃপতি আর এম পাশাপাশি মুখ বাড়িয়ে দেখেছিলেন আটতলা নিচের ফুটপাথে একটা ভাঙাচোরা আশ্চর্য শরীর পড়ে আছে। শত শত মানুষের চোখের সামনে ওদের পাশাপাশি মুখ জানালার ক্যামেরায় শার্সির ফ্রেমে আঁটা রইল।

## ধীবর

লোকটার জাল আছে। একসময় যখন পুকুরে মানুষ শুধু আগাছা সেঁচত, মাছ ধরত, পানা তুলত তখন ও জাল ফেলত।

মালিকের পুকুরে জাল ফেলে ফেলে মাছ ধরত। এখন আর মালিক পুকুরে মাছ ছাড়ে না। জগতের জালটা এখন ঘরেই থাকে। কেউ চাইলে জগৎ ভাড়া দেয়।

এখন অন্য কাজ করে জগৎ। এখন একদিন যায় দু'দিন যায় থানা থেকে ডাক আসে।

জগৎ, আছ নাকি বাড়ি?

আছি।

একবার যেতে হয় যে জগৎ!

কোথা?

রায়পুকুরে।

শালারা এক রায়পুকুর চিনেছে বটে।

জগৎ একটা কালো জাঙিয়া পরে। গায়ে বেশ তেল মেখে নেয়। বাঁশের লগা নেয় একটা। রায়পুকুরের ধারে পুলিস দাঁড়িয়ে থাকে। ডোম দাঁড়িয়ে থাকে। তেরপলের ডুলি থাকে একটা। জগৎ ডোমের কাছ থেকে বিড়ি নিয়ে টেনে নেয় খানিকটা। তারপর নেমে পড়ে জলে।

রায়পুকুরের জলের নিচে এর আগে-আগেও আশ্চর্য সব বিস্ময় লুকোনো থাকত। মানুষ ডুব দিয়ে বাসন পেত, পুজোর বাসন। গয়না, মোহর, এটা-ওটা নাকি কতজন পেয়েছে।

এখন আরেক রকম বিস্ময় লুকিয়ে রাখে রায়পুকুর। জলের নিচে ডুব দিয়ে জগৎ চোখ খোলে। ঘোলাটে সবুজ জল। ভীতত্রস্ত তে-চোখো মাছেরা সরে সরে যায়। কুচো চিংড়ি শুঁয়ো নাচিয়ে নড়তে থাকে। জগৎ আগে বাঁশ খুঁচিয়ে বুঝে নিত কোথায় নামতে হবে।

এখন আর বাঁশ খোঁচাতে হয় না। জলের নিচে কাদায় চিত হয়ে পড়ে

থাকে মানুষটা। আশপাশে জল ভুড়ভুড়ি কাটে। জগৎ সন্তর্পণে পা ধরে টানে। কখনো হাত ধরে। তারপর ওপরে এসে কিছুক্ষণ দম নিয়ে নেয় ফুসফুস ভরে।

পেলি জগৎ?

যাবে কুথা?

সযত্নে জগৎ দেহটিকে তুলে আনে। জল থেকে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র পচা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে দেহটা প্রতিবাদ জানাচ্ছে। জগৎ তেরপলের ওপর দেহটি শোয়ায়। তারপর পুকুরের কাদা তুলে কবজি থেকে কনুই অব্দি ঘষে ঘষে ধোয়।

লাশ পিছু সাত টাকা নেয় এখন জগৎ। এখন টাকার আর দাম কী বলো! টাকা আর মানুষের প্রাণ দুটোই খুব সস্তা এখন। জগতের ধারণা যারা মারে তারাও টাকা পায়। টাকা ছাড়া কিছু হয় বলে জগৎ বিশ্বাস করে না।

ও মনে করে, ঐ ডোম-কনস্টেবল-দারোগা নিহত ও হত্যাকারী সবাই কোনো না কোনো ভাবে টাকার লেনদেন করে চলেছে।

একথা শুনে জগতের ছেলে জগৎকে বলে, বোকাটা! কিন্তু কেন যে জগৎ বোকা হল আর অভয় বুদ্ধিমান, সেকথা জগতের টেকনিকাল স্কুল পাশ ছেলে জগৎকে বুঝিয়ে দেয়নি কখনো।

তারপর জগৎ বাড়ি আসে। কার্বলিক সাবান দিয়ে গা হাত পা ধুয়ে ফেলে। তারপর টাকা আনতে যায়।

জায়গা শহরের বাহির-আঁচলে। রায়বাবুদের বাড়ির পুরোনো দলিলে লেখা আছে "গঙ্গা-বিধৌত-পবিত্র-ভূমি-আম্রকুঞ্জ-শস্যক্ষেত্র"।

সে গঙ্গা এখন মজা খাল। আমবাগানের একটা গাছও নেই। শস্যক্ষেত্রে এখন মানুষ থাকে। আর পবিত্র ভূমির তিলমাত্রও রায়বাবুদের দখলে নেই। শুধু রায়বাগান আর রায়পুকুর নামের মধ্যে রায়বাবুরা টিকে আছে।

বাইরে বলেই এত সুবিধে। একটা খুন হয়েছে বলেও কেউ বলে না। একটা ছেলের বাপ-মাও খোঁজ নিতে আসে না থানায় বা লাশঘরে। সব চেয়ে অবাক কাণ্ড কী, জগৎ জানে, চেঁচিয়ে কেউ কাঁদে না অবধি।

জগৎ বুঝতে পারে খুব স্নেহহীন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। ছেলেগুলোর দয়ামায়া নেই। মা-বাপ অবধি চেঁচিয়ে শোক করে না আজকাল।

অথচ জগৎ শুনেছিল স্নেহ নিম্নগামী। কেননা জগৎ যখন ছোটো ছিল, ও

ওর কাকার সঙ্গে গাঙে যেত। গাঙহাটায় রাজবন্দীর ক্যাম্প ছিল। বুড়ো রাজবন্দী বাবু সন্ধেবেলা রামায়ণ পড়তেন। কাকারা সময় পেলে বসে বসে শুনত।

তখন জগৎও শুনেছে ভালো ভালো কথা। স্নেহ যে নিচে ধায়, ছেলে মাকে ভুললেও মা ছেলেকে ভোলে না, এসব কথা তখনি শুনেছে।

রায়বাগানে বসে বসে সে-সব কথা মনে থাকে কই! কেউ কাউকে খুন করে না, শুধু মাঝে মাঝে এ-পাড়া বে-পাড়ার ছেলে নিখোঁজ হয়ে যায়।

তখন জগতের ডাক পড়ে।

কেননা নিখোঁজ ছেলেগুলোর শেষ ঠিকানা পুকুরের নিচে। জগৎ শুনেছে ছেলেগুলো নাকি বনের বাঘ, গর্তের সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

ভয়ঙ্কর যে তা তো বোঝাই যায়। দেখতে যেমন হও না বাপু নিরীহ, কিশোর, সুকুমার আসলে তোমরা ভয়ঙ্কর। নইলে আর এমন করে মর?

জগৎ কিছু ভাবে না, তলিয়ে ভাবতে যায় না। সাতটা টাকা নিয়ে ও পাঁচটা টাকা ভামিনীকে দেয়। দু টাকা নিয়ে জগৎ নেশা করতে যায়।

ঐ ওর এক সৃষ্টিছাড়া অভ্যেস।

কেন খাও, নেশা বলে?

অভয় জিজ্ঞেস করে। জগতের টেকনিকাল স্কুলে পাস করা ছেলে অভয়। বাবা যখন মদ খায় না, তখন ঐ কালো কাঁচা পাকা চুল বন্য চেহারার লোকটার সঙ্গে অভয় কথা বলতে পারে না। কেমন করে কথা বলা যায় তাও অভয় ভেবে পায় না। লোকটা অভয়ের ভাষায় কথা বলে না। লোকটা পিশাচের মতো, ঘেন্না জানে না এতটুকু। লোকটা নিজের নাম বলে—জগৎ সাঁ, জাতিতে ধীবর আজ্ঞে।

অথচ অভয় বাবাকে নিয়ে গিয়ে আদালতে আর্জি করে নামটা পালটে জগৎচন্দ্র দাশ করে এনেছিল।

অভয় আর ওর বাবার জগৎ দুটো আলাদা আলাদা গ্রহে। শুধু বাবা যখন মদ খায় তখন বাবার চোখ নরম হয়, স্নেহমাখা, শান্ত। বাবা মদ না খেলে অভয় বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারে না এ কি কম দুঃখের কথা।

অভয় জিজ্ঞেস করে, কেন মদ খাও, নেশা বলে?

নেশা!

তবে রোজ খাও না কেন?

না, রোজ খাই না।

যেদিন লাশ তোল সেদিন নেশা না করে পার না ?

না।

জগৎ মাথা নাড়ে। বলে, বড় কষ্ট হয় অভয়। বড় ভয় হয়।

কাকে ?

সকল মানুষকে। সব এমন হয়ে গেল কেন ?

অভয় দরজায় হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর বাবা সব মানুষকে ভয় পায় আজকাল ? ওর মা ? ওর মা বোধহয় শুধু ছেলেকে ভয় পায়। মা আর বাবা কি অভয়ের মনের জ্বালা বুঝতে পারে ?

অভয় তো বুঝতে দেয় না ওদের ! অভয় ওদের সঙ্গে সব সময়ে ভদ্র ভাবে, শান্ত হয়ে কথা বলে। অভয়ের অসীম মমতা আছে ওর বাবা আর মার প্রতি।

বাবা, লাশ যখন তোল তখন একদিন নেশা না করে দেখ।

ভয় করে অভয়। নেশা করে টু'নি ভুলে থাকি।

জলে নামতে তোমার ভয় করে না বাবা ?

না অভয়।

জগৎ অল্প হাসে। আজকাল মাঝে মাঝে ও ডুব সাঁতার কাটে, এমনিই কাটে। বহু প্রাচীন দিঘি রায়পুকুর। একদিকে দাঁড়ালে অন্য পাড়ের মানুষকে সত্যিই ছোটো দেখায়। বর্ষার দিনে পুকুরের সবুজ জলে বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে শাদা ফুলঝুরির মতো ছিটকে পড়ে।

জগৎ তখন মাঝে মাঝে সাঁতার কাটে পুকুরে, স্নান করে। বড়ো আপন মনে হয় জলকে, জলকে মনে হয় জীবন। কত শান্ত আর সবুজ জলের নিচের পৃথিবী। কত শান্ত। জলের মাছ, ঢোঁড়া সাপ, চিংড়ি-শামুক-গুগলি, জলের ঝাঁজি ও আগাছা। সবাইকে মনে হয় আপনজন।

অভয় তোর মনে খুব বেথা ?

বাবা এ প্রশ্নটা এই সময়েই করে। তাই অভয়ের ভালো লাগে বাবাকে। বড়ো ভালো লাগে। মনে হয় বাবার হৃৎপিণ্ডের ওপর আঙুল বুলিয়ে আদর জানায় অভয়।

অভয় বলে কেন বাবা ?

লেখাপড়া শিখাতে যেয়ে তোর মন্দ করে দিলাম ?

মন্দ কেন বলছ ?

এই যে কাজ জুটে না, করতে পারিস না কিছু, তাই তোর মনে বেথা ?

অভয় চুপ করে থাকে।

তুই যেমন ঘুরিস, তেমন কাজ দেয় না। তোরে আমি মোহনের দোকানে পাটনার করে দিব।

অনেক টাকা চায় যে !

টাকা দিব, টাকা আমার হবে না কখুনো ?

মোহনের সাইকেল ও সাইকেল-রিক্সা মেরামতের দোকানে অভয়কে পার্টনার করে দেয় এ জগতের অনেক দিনের ইচ্ছে।

মোহন পাঁচ-সাতশ টাকা চায় বাবা !

দিব অভয়, নিশ্চয় দিব। তুই যেমন ধান্দা করবার কর্‌গা যা।

অভয় সস্নেহ হাসে। তারপর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়।

জগৎ বড়ো ভালো ঘরে থাকে এ অঞ্চলে। যার জমি, তিনি বিদেশে থাকেন। তাঁর জমিতেই এই দুখানা ঘর আর দাওয়া বেঁধে দিয়েছিল জগৎকে। হাঁস-মুরগি রাখবার ঘর ভামিনী নিজে বেঁধে দিয়েছে। ভামিনী হাঁস-মুরগি পোষে। জগৎ ডিম দিয়ে আসে বাজারে। এ রোজগারটা ওদের বারোমেসে।

ভালো ঘরটা অভয়ের। একটা চৌকি, একটা টেবিল, একটা চেয়ার। দড়িতে জামা, পাজামা, প্যাণ্ট,। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার। জগৎ মাঝে মাঝে ঘরটার দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেলে। কিছুতে বিয়ে করল না অভয়। বিয়ে করল না স্বজাতে। বিয়ে করলে একটা ছোটো রেডিও, শ্বশুরের সাইকেল-রিক্সা একটা, খানিকটা চাষের জমি অভয় পেত।

অভয় বলেছিল, দূর ! অভয় হেসেছিল। জগৎ যেন নতুন করে দেখেছিল অভয়ের চেহারা। লম্বা, সুকুমার, কালো হলেও কুশ্রী নয় অভয়। মুখের ভাবটি বড় শান্ত।

জগৎ মাথা নেড়েছিল। এখনো মাঝে মাঝেই মাথা নাড়ে বিস্ময়ে। অভয় এত অচেনা কেন ? দিনকালের গতিকে ? এদিকে একটা কাজ করতে বলো, ঐ ছেলে বেড়া বাঁধবে, মুরগি ঘর করবে, ভামিনীর বেগুনখেত নিড়িয়ে দেবে।

জগৎদের ঘরের ছেলেরা আজকাল কত টেরি কাটে, সরু প্যাণ্ট পরে, বগলে রেডিও নিয়ে ঘোরে। সিনেমা দেখে। কড়া, চড়া কথা বলে।

অভয় ওদের মতোও নয়। অভয় কাদের মতন ?

তোর মতো নয়, আমার মতো নয়, ছেলেটা কার মতো হল? একটা ছেলে ?

তুমি জান না, আমি মেয়েছেলে হয়ে জানি!

ভামিনী কথা বেশি বলে না। ভামিনীর মনের গোপনে ব্যাথা আছে, গভীর ব্যথা। ছেলের কাপড় কাচে ও, ভাত রাঁধে, অথচ ছেলের সঙ্গে বসে দুটো কথা বলে সুখ পায় না। শ্রাবণ-পূর্ণিমায় জল বয়ে বয়ে তারকেশ্বরে যেত ভামিনী। ছোটবেলা অভয়ও যেত।

গত বছর বলল, আর যেয়ো না মা।

কেন ? তোর লজ্জা করে ?

ভামিনীকে ওর জ্ঞাতিরা বলে, তোমাদের পরিচয় দিতে অভয় লজ্জা পায়, তা বোঝ ?

অভয় হেসেছিল। বলেছিল, না গেলে কষ্ট পাও তো যাও। তবে দিনকাল তো ভালো নয় তাই মানা করছিলাম।

যাব ? গেলে তুই রাগ করবি না ?

রাগ করব কেন ?

ভামিনী গিয়েছিল ফুল-সাজানো বাঁকে জল নিয়ে। আসবার সময়ে চিনির ওলা আর তারকেশ্বরের কুমড়ো এনেছিল একখানা। বাড়ি ফিরে কী দেখেছিল ভামিনী!

উঠোনে দাঁড়িয়ে অভয় একটি মেয়ে আর দুটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছে।

আমার মা !

অভয় মাথা হেলিয়ে বলেছিল। ভামিনীর যে কী অবাক লেগেছিল তা বলতে পারে না ভামিনী। ওদের সঙ্গে অভয় যেন সমানে সমানে কথা বলছে।

সেদিন থেকে ভামিনী ছেলেকে আরো বেশি করে সমীহ করে। ছেলে অচেনা, বড়ো অচেনা হয়ে গেল গো ছেলেটা ভামিনীর। এই ছেলের বউ আসবে, ছেলে-বউ ঝগড়া-কোঁদল ভাব-ভালবাসা দিয়ে, সন্তান দিয়ে ভামিনীর সংসারটা সাজিয়ে দেবে ভাবতে পারে না ভামিনী।

ও শুধু জগৎকে বলে, ওরে সরিয়ে দিলে হয় না ?

কেন ?

সবাই জোয়ান ছেলে সরিয়ে রাখছে, দেখ না ?

সে বাবুদের ছেলা।

বাবু-ভদ্দরলোক, এসব কথা অভয় শুনলে বলে আর বোলো না বাবা।

তখন অভয়কে জগতের ভয় করে। বড় কষ্টে জগৎ মদ খায়, বড় দুঃখে সাঁতার কাটে রায়পুকুরে। মানুষ এমন ভয়ের হয়ে উঠল কেন?

অথচ দারোগাবাবু-ডোম-মড়িঘরের ডাক্তারকে ভয় পায় না জগৎ। সেখানে গিয়ে কেমন গ্যাট-ম্যাট-ফ্যাট বারফট্টাই করে আসে। দারোগাবাবুর বুকে কালীর ছবি আঁকা লকেট ঝোলে সোনার হারে। দারোগাবাবু জগৎকে বলে—ছেলে লেখাপড়া শিখেছে, একটা কাজ খুঁজে দে।

আপনি একটা সুলুক-সন্ধান দিন না বাবু।

কাজ কি আর হয় না? কাজ হয়।

কোথায় হয় বাবু?

একবার আসতে বলিস থানায়।

ও বাবা! আমার ছেলে আমার মত ভীতু যে!

তবে যেয়ে বল্‌গা দারোগাবাবুকে মাঝে মাঝে খোঁজখবর দিস, টাকা পাবি। একথা আবার বিশ্বসংসারে বলতে যাস না যেন।

না বাবু। কিসের খোঁজখবর?

বল্‌গা যেয়ে। সে বুঝবে।

অভয় একটু হেসে উড়িয়ে দেয় বাবার কথা। বলে খোঁজখবর কী দেব! তার চে' উনি আমায় কর্পোরেশনে একটা কাজ করে দিন না নৃসিংহ দত্তকে বলে! লোক নিচ্ছে ওরা।

এই ভালো কথাটা শুনে দারোগাবাবু যে কেন রেগে যায় কে জানে। বলে, চাকরি করবে! চাকরি গাছের ফল যে আঁকশি টানলে পড়বে? কেন? কাজের কথা, হাতে হাতে টাকা পছন্দ হল না? তোর কপালে জগৎ বিস্তর কষ্ট আছে। খুব কষ্ট পাবি তুই। জল থেকে লাশ তুলবি আর ডিম বেচবি।

জগতের ছেলে টেকনিকাল স্কুলের পরীক্ষায় পাস করেছে, দারোগাবাবুর ছেলেটা সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে- সেজন্যেও দারোগাবাবুর মনে মনে রাগ আছে। জগৎ তা বুঝতে পারে না।

তাই জগৎ লাশ তোলে, শুধু লাশ তোলে। জীবিত থাকতে কত লাফালাফি, ছোটাছুটি, নাচানাচি। মা গো! জীবিত মানুষকে বড়ো ভয় করে

জগৎ। জলের নিচে দেখ শান্ত, স্থির, অনড়। গলায়-বুকে পাথর, ইটের ভার। সমস্ত শরীর কেমন মাছেদের খেলাঘর।

জলের নিচের জগৎ শান্ত, সবুজ, রহস্যময়। এমন নগ্ন নয় সব, শবদেহও নয়। জলের নিচে তেচোখো মাছেদের রুপোলি ডানা দেখতে কত সুন্দর।

লাশ তুলে জগৎ সাত টাকা পায়। পাঁচ টাকা ভামিনীকে দেয়। দু'টাকার নেশা করে। নেশা করে ও অভয়ের ঘরে গিয়ে দরজা ধরে দাঁড়ায়।

তোর মনে বড় বেথা অভয় ?

হ্যাঁ, বাবা।

কিসের বেথা জানি রে। তোর কাজ হয় না, হামলে পড়ে কাজ খুঁজে বেড়াস। তাই বেথা এত।

বাবা···আমি কিন্তু কাজ খুঁজে···

অভয় কী যেন বলতে যায়। অথচ বলে না, বলতে পারে না। কাজ ! অভয় কাজ খোঁজে আর কাজ পায় না সেই ব্যথা অভয়ের ! বাবা গো ! তুমি অভয়ের ব্যথা চেন না।

জানি অভয়। তুই খুঁজে হেদাস অথচ পাস না। আমি তোকে পাটনার করে দিব মোহনের।

কেমন করে ? গুপ্তধন পেয়েছ না চুরি করেছ ?

হাসিস না অভয়। বাপকে চোর বলিস না। চুরি আমি করি না। দারোগাবাবু বলে কাজ দিবে আরো, আরো টাকা দিবে।

ও-কথা বললে বিচার করে দেখে তবে কাজে যেয়ো বাবা।

কেন ? ও আমায় ফাঁসাবে।

বাবা, তুমি বোঝ না কিছু। কেন মদ খাও বাবা ?

আমার ভয় করে অভয়।

ভয় করে ?

মানুষকে। এই এত পাপ বাবা ! এত পাতক !

অভয় হাসে। মধুর শান্ত হাসি' অন্যগ্রহের মানুষ যেন জগৎকে দেখে হাসছে।

অভয় বলে, খেতে চল। মা ভাত বেড়ে বসে আছে।

অভয় কথা বললে জগৎ সেকথা অমান্য করতে পারে না। জগৎ খেতে

যায়। কিন্তু জগৎ দারোগাবাবুর কথা ভুলতে পারে না। রাত করে আসিস জগৎ। কাজ আছে। এবার অনেক টাকা পাবি।

টাকার লোভেই জগৎ পূর্ণিমার রাতে রায়পুকুরে নেমে যায়। আজ রাতে যেন সবই অচেনা অচেনা। চেনা মানুষদের ব্যবহার পর্যন্ত অচেনা। নইলে আজ দারোগাবাবু থেকে শুরু করে এতজন লোক পুকুরের পাড়ে কেন? কেন একটা কালো গাড়ি?

জলের নিচ থেকে জগৎ উত্তরটা তুলে আনে। একবার নয়, ছবার ওকে ডুবতে আর উঠতে হয়। ছটা লাশ তেরপলে মুড়ে গাড়িতে তোলে পুলিশ।

আজ দারোগাবাবু ওকে অনেক টাকা দেয়। এত টাকা জগৎ কখনো একসঙ্গে দেখেনি। দারোগাবাবু আজ বলে, সাবধান জগৎ। ক'টা লাশ তুললি, কাদের লাশ তুললি কারেও বলবি না। বললে নিকেশ করে দেবে।

ব্বাপো রে ব্বাপো! বলি কখুনো?

ওদের যারা নিকেশ করেছে তাদের রাগ দুরন্ত, জগৎ।

জগতের পেটের ভেতরটা বরফ হয়ে যায়। কারা নিকেশ করেছে! ওরা তো ধরা পড়েছিল! ওদের তো থানায় নিয়ে গিয়েছিল ধরে! জগৎ আর ভাবতে পারে না, ভাবতে চায় না। বাড়ি ফিরে এসে এই প্রথম ও মদ খায় না।

কিন্তু অভয় যখন মরে যায় তখন জগৎ ওর লাশ তোলে না। অভয় শেষ পর্যন্ত কেমন করে মরে, কারা ওকে মারে কিছুই জানতে পারে না জগৎ।

ওকে জিজ্ঞেস করবে বলে থানায় আনা করালেন!

ছেড়ে দিই নাই? শুধা যেয়ে সবারে?

ছেড়ে দিলে, কখন, কখন-বা ধরেছিলে? আমি ধবধবি যেয়ে বসেছিলাম বুনের বাড়ি?

কোথা যায়, কার সঙ্গে মেশে জানতে ধরেছিলাম। তা রাত হতে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

কোথা?

যা জগৎ। মেলা ভ্যান ভ্যান করিস না।

ভ্যান ভ্যান করব না?

না।

আমার পুত্র মরে গেল, আমি নিবংশ হয়ে গেলাম—তা এট্টু ভ্যান-ভ্যান করব না ?

দারোগা আজ ওকে হাঁকড়ে বের করে দেয় থানা থেকে।

জগৎ কাঁদতে কাঁদতে চলে আসে বাড়ি।

তারপর দারোগাও একদিন নিখোঁজ হয়ে যায়। সাইকেলে বাড়ি ফিরতে ফিরতে। কোথাও পাওয়া যায় না দারোগাকে।

জগৎকে ডাকতে আসে পুলিস। চল্ জগৎ। রায়পুকুরে দেখবি চল্।

জগৎ আজ রায়পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে—ঘাটলায় ভাঙা ইট, সিমেন্টের চাপড়ে লাথি মারতে থাকে।

নাম্ জগৎ! দারোগাবাবু যদি লাশ হয়ে থাকে, তবে আজ রায়পাড়া লাশ করে ফেলাবে।

ছোটো দারোগাবাবু গর্জে ওঠে।

জগৎ জলে নামে। জলের নিচে সব সবুজ, শান্ত, অপার্থিব। দারোগাবাবু আর সাইকেলটা জড়িয়ে বাঁধা। অভয়ের গামছাটা দিয়ে।

জগৎ ইট-পাথরের চাপড় টেনে নিয়ে দারোগাবাবুর পেটের ওপর চাপা দেয়। এখন এইরকমই থাকুক। দুদিন বাদে দেখা যাবে আর কী ব্যবস্থা করা যায়।

তারপর জগৎ উঠে আসে।

কী হল ? পেলি ?

না।

জগৎ মাথা নেড়ে জবাব দেয়। তারপর গা হাত পা মুছতে থাকে। আজই ভামিনীকে বলতে হবে ধবধবি চলে যাবার কথা।

ভাল করে দেখেছিলি ?

জগৎ ধীবর আজ্ঞা। কুনদিন আপনাদের কাজে হেলা করেছি ? বলেন ?

জগৎ একটা দুর্বোধ্য হাসি হাসে। ছেলে মরে যাওয়ার পর এত সস্ত সস্ত ওর মুখে হাসি দেখে ছোটো দারোগাবাবু আজ অবাক হয়ে যায়।

# পিণ্ডদান

পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদের আলোয় কঙ্কালটা ধবধব করছিল। অকলঙ্ক শুভ্রতা করোটিকা থেকে পাদাঙ্গুলি-মূল-শলাকা পর্যন্ত জুঁইফুলের পাপড়ির মতো স্নিগ্ধ আভা ছড়াচ্ছিল। খেঁটে গাছখানায় শরীরের ভর রেখে কঙ্কালটাকে দেখতে দেখতে দশরথের বৃদ্ধ লোলচর্ম দেহ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানাপচা জল ঝরছিল। চোখ থেকে বিফলতার দুঃখে ঝরছিল সরযূ নদীর ধারা।

বড়ো দুঃখ দশরথের মনে। এ কঙ্কালটাও আস্ত নয়, নিখুঁত নয়। যতদিন শরীরে পেশী রক্ত-মাংস-চামড়া থাকে, ততদিন বোঝা যায় না গো। কত কষ্ট দশরথের। প্রথমে পালবাবুকে খবর দিতে হয়। বলতে হয়, 'হোথা দেখলাম ঘাট ছেড়ে সব আঘাটায় নেমে নাইতে নাইতে সিটাই ঘাট করে নিছে বাবু। তবে ঘাটে পুঁতা আছে মনে লেয়।'

পালবাবু বলেন, 'শালা, আড়াই বছরে কওগুলান মরেছে দশরথ? শালার একটা পুষ্কর্নী বাকি নাই?'

বোসবাবু বলেন, 'মেরেছে, আর পাথর ইটের থলিতে পুরে পাঁকে ফেলেছে দাদা। তা বাবা দশরথ, ঘাটে মড়া পুঁততো বলে আঘাটায় বউ ঝি চানে নামে এ তুমি মোক্ষম ধরিছিলে।'

একথা শুনে দশরথ হাসে। তারপর রাতে-ভিতে জলে নামে। কঙ্কাল তোলে এবং সযত্নে চুনে ও ব্লিচিং-এ মুছে সাফ করে। কঙ্কালগুলি দেখলেই দশরথের মনে প্রজ্জলন্ত স্নেহ এবং কৃতজ্ঞতা যুগপৎ কেলি করতে থাকে। তরুণ কঙ্কাল সব, সেই জন্যে স্নেহ। পালবাবু আর বোসবাবুর কাছে পেঁাছে দিলেই টাকা পায় দশরথ, সেই জন্যে কৃতজ্ঞতা। টাকা পেলেই দশরথ সর্বাগ্রে মদ কেনে।

কুসি ওর গায়ে মদ মালিশ করে দেয়, বোতল থেকে ঢেলে দেয়। দশরথ বলে, 'কবজি মোটা হয়লাই। গোড়ালি মোটা হয়লাই, বুঝি দাদা ছিল জগতে? আহা, মায়ের ছেলা গো। বাপ পিণ্ড পাবেলাই, ই কি কম দুস্ক?'

কুসি বলে, 'তো খালভরার কথার তরিবৎ নাই। ছেলাগুলা অকালে মরে তার তরে দুস্ক করিস না?'

দশরথ হু হু করে হাসে। বলে, 'আমি কি বলি তোরা যেয়ে মরগা? তবে মরছিল বুলো তোর কোমরে গোটাদানা উঠল না কি বল?'

'মর যা, পিচাশ।'

দশরথ ভেবে পায় না ও কিসে পিশাচ হল। ও মারে নি ছেলেদের, পুকুরে ডোবায় ফেলেনি। ও ত শুধু কঙ্কাল তোলে, পালবাবুদের দেয়, নিজে কমিশন নেয় এই কাজ ও আগেও করত, এখনো করে। অযোধ্যার কোনো গ্রামে ওর বাড়ি ছিল, প্রসন্নতোয়া সরযূর তীরে ছিল জনাইয়ের খেত. এখন আর মনে পড়ে না কিছু। তিন বছর বয়স থেকে ও এই শহরে। মেডিক্যাল কলেজে বেওয়ারিশ মড়া শটিত করে শ্বেতশুভ্র কঙ্কাল বের করে নিতে ওর জোড়া ছিল না। তখনো রামের মা ওকে ঘেন্না করত, কাছে আসতে দিত না। অথচ দশরথ জানে কঙ্কাল হল মানবশরীরের স্থির ও পবিত্রতম পরিণতি। আর সবই পচনশীল, অশুচি, অস্থায়ী।

রামের মা মরে গেছে। রামের জন্যে দশরথ ভাবে না। রাম দু বছর হল জেল খাটছে। কোন্ জেল, তা দশরথ জানে না। কিন্তু পালবাবু বলে রাম ভাল আছে। বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে মিশে ওর পাখা গজিয়েছিল। জেলখানায় পাথর ভেঙে রাম ধীরে ধীরে শান্তিতপক্ক হচ্ছে।

'সব ঠিক আছে।' পালবাবু বলে।

'হুঁ বাবু।' দশরথ মাথা নাড়ে। পালবাবুতে ওর অগাধ বিশ্বাস। তাছাড়া, ছেলের ধার ধারে না দশরথ। এখনো ও চাল কেনে, খাসির মাংস, মদ। এখনো ও কুসির বিগততিরিশ দেহে সাপ খেলাতে পারে। ছেলে জেলে আছে। ভালো আছে। দশরথের বাবাও কুসির মতো একজনকে নিয়ে ভালো থাকত। ছেলের ধার ধারত না। দেহ জরাবলি হবার পরও তার শরীরে পৌরুষ ছিল। দশরথেরও আছে। বাপ মরেছে খবর পেতে দশরথ পিণ্ড দিয়েছিল। রামও দেবে।

তবে জেল থেকে রাম বেরোলেই দশরথ বলবে, 'তু বিয়েটা করে লে বাপ। টাকা আমি দিব।' বিয়ে করলে রাম হয়ত থিতোবে। অমন দাপিয়ে বিশ্বসংসারকে শত্রু করে তুলবে না। কিন্তু টাকা যেন জমতে চায় না।

একটি নিখুঁত কঙ্কাল পায় না দশরথ। যারা পৃষ্ঠবংশ-গলবিল-হৃৎপিণ্ড-মূত্রাশয়ে ছুরি নিয়ে মরেছিল; অস্থিসংস্থান যাদের অটুট ছিল। সেই নিষ্কলঙ্ক কঙ্কালগুলো যে কারা নিয়ে গেল! দশরথ যাদের টেনে টেনে তোলে, তাদের

করোটিকা-অক্ষকাস্থি-জঘন-কপাল-ঊর্বস্থি-অংসফলক-পঞ্জরাস্থি চূর্ণি খুঁতো। কোনো কোনো কঙ্কালের শরীরের প্রতিটি অস্থি দশরথ দেখেছে।

সে কঙ্কালে বেশি টাকা পায় না দশরথ।

আজ পূর্ণচাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্না-ধোওয়া কঙ্কালটি দেখে দশরথ তাই কাঁদল। পা ও হাতের আঙুলের একটি হাড় নেই, পাঁজরায় শামুক আটকে আছে। কবে দশরথ একখানা আস্ত কঙ্কাল পাবে, কবে পাবে একখানা বড়ো নোট? চোখ মুছে দশরথ সযত্নে কঙ্কালটি বস্তায় পুরল। ঘোড়ের পাগড়িকে একটা টাকা দিল, কুসির ভাইটার জন্যে একটা টাকা কানের পেছনে গুঁজল। তারপর চলে গেল পালবাবুর বাড়ি।

পালবাবুর ঘরে সারারাত বাতি নেবে না। সমানে কঙ্কাল আসে আর যায় এ-ঘরে, তাই বাতি জ্বেলে পালবাবু বসে থাকেন আর মদ খান। রাত হলেই উনি ঘুমোতে ভয় পান। কেবলই মনে হয় দশরথ বা নিধিরাম বা চৈতন্য ওঁকে জাগ্রত না পেলে চলে যাবে দত্তরায়বাবুর কাছে। জীবনে যাদের প্রতি নিয়ত ক্রোধ হত, মনে হত তারা না জন্মালেও দেশের দশের চলে যেত বেশ, মনে হত উত্তর-চল্লিশ লোকগুলোর আরো সুখভোগের পথে তারা কাঁটা, মৃত্যুতে তারা বড় দামি। জীবনে যারা ঘাতকতাড়িত হয়ে একটি দরজা খোলা পায়নি, মৃত্যুতে তাদের জন্যে দরজার পর দরজা খোলা।

তাই পালবাবু, রক্তরাঙা চোখে বসে থাকেন, আজও ছিলেন। কঙ্কালটা দেখে বললেন, 'আস্ত মাল ল' দেখি দশরথ। তুই পাস না। অরা পায় ক্যামনে?'

'আনব বাবু।'

দশরথ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। তারপর বলল, 'মাল দেন, খাই। ই শালারে উঠাতে চারবার ডুব দিয়েছি জানেন? বুক দিয়ে শিক ফুঁড়ে কাদোয় পুঁতা করেছিল, তা শালা উঠতে আর চায় না।'

পালবাবু মদ দিলেন। বললেন, 'ভাল মাল না পাইলে আর আনবি না।'

'না।'

দশরথ যেন শপথ নিল। টিউবের আলোয় বড়ো অপরিচিত দেখাল ওকে। আদিম যুগের প্রেত যেন। দীর্ঘদেহ, চামড়ায় জমা, চোখে লালসা, মাথা নেড়া, সিক্ত কটিবস্ত্রে ঝাঁজি। চোখ লাল, ঘোলাটে, ক্ষীত। পালবাবুর

ভয়ভয় করল। মনে হল অনেক মদ খেয়ে ওকে একটা গোপন সংবাদ দিয়ে ফেলেন, সাহস হল না।

'কাল সি ওষুধ কোম্পানির দিঘিতে যাব। হোথা মাল আছে।'

'মাল ত সবোই, কী মাল ?'

'পুলিশের খবর আজ্ঞা, ভালো মাল হবে।'

'দেখ।'

'ছেলেটো কবে খালাস হবে বাবু ?'

'দেখি, খোঁজ নেই।'

পালবাবু চোখ নামালেন। অস্বস্তি, ভয়। একটু সময় নিয়ে বললেন, 'ছেলের তরে মন পুড়ায়, দশরথ ?'

'না বাবু। মন পুড়ায় কই। আমার বাপ মোরে দেখে নাই। আমিও রামরে দেখি নাই। আমি আমার দমে জীইব। উ উয়ার দমে জীইবে। মরব যখন, পিণ্ড দিবে।'

'দিবে ?'

'দিবে।' নইলে মোর গতি হবে নাই, তা উ জানে।'

'ন, এখন যা।'

ওষুধ কোম্পানির বাগানে পূর্বতন মালিকদের স্থাপিত নগ্নিকা অপ্সরা দেবশিশুর মূর্তি। প্রতিপদের চাঁদ। রক্ষীটি অদূরে দাঁড়িয়ে অস্বস্তিতে মারা যাচ্ছিল। অভিপ্রেত এক নিখুঁত কঙ্কালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে দশরথ যে কী দেখছে আর দেখছে।

'চল দশরথ, যা।'

'যাই।'

দশরথ মুখ তুলল। ওর মুখে বিচিত্র হাসি, না কী ? হাসি নয় ? কঙ্কালের গলা থেকে অতি যত্নে ও রুপোর হারটা খুলল। একটা পদক। ভবানীপুরের গোপাল স্যাকরা গড়েছিল। দশরথ আঙুল বোলাল। 'রামলাল' লেখাটা এখনো খোদাই করা আছে। হারটা ও গেঁজেয় পুরল।

তারপর, রক্ষীটিকে মূঢ় ও ভীত করে দশরথ বড়ো যত্নে কঙ্কালটিকে কাঁধে ফেলল, হাত বোলাল কশেরুকায়। বলল, বস্তাটা পাশ বরাবর ফেড়ে ঢেকে দাও কেনে ?'

কঙ্কালটি সযত্নে ঢেকে নিয়ে দশরথ পাঁচিল টপকে বেরিয়ে গেল। বুকের

মধ্যে পর্বততুল্য তরঙ্গ আছড়াচ্ছে। দশরথ বলল, 'আমায় বুঝাছিল তু জেলে আছিস বাপ। বাপো আমার আমি জানতাম তু জেলে আছিস।'

যে মাংস-পেশী-রক্ত-শিরা-চুল-চামড়াকে দশরথ এতদিন অপবিত্র বলে জেনেছে, এখন তার জন্যে বুকে অভিশপ্ত প্রেতরা হাহাকার করল। যে কঙ্কালকে মনে হত মানবশরীরের চরম ও পবিত্রতম পরিণতি, এখন তাকেই মনে হল অপচয়। দশরথের চোখে সরযূ নদীর ধারা। আর সে পিণ্ড পাবে না। চরম দৈহিক ভোগসুখে লিপ্ত থেকে মরে যাবার ইচ্ছে ছিল ওর, জেনে যাবার ইচ্ছে ছিল পৃথিবীতে কোথাও ওর নাম বেঁচে থাকবে, কেননা রাম রইল। দশরথ নিষ্ফল শোকে মাথা নাড়ল। আবার বলল, "কখুনো জানি লাই বাপ আমার'। কত স্নেহে ও কঙ্কালটির পাঁজরা জাপটে ধরল, জীবিত পুত্রকে দশরথ এমন করে আলিঙ্গন করেনি।

পালবাবু ওকে একশো এক টাকা দিলেন।

দশরথ নিধিরামকে ডাকল, চৈতন্য মদ কিনল দশ বোতল, লাথি মেরে ও শুঁড়িকে ডেকে তুলল।

কুসি বলল, 'এত রাতে পিঁয়াজ কাটব, সবাই মদ খাবা? তুমি কি পাগল হয়েছে?'

দশরথ বলল, 'চুপ যা মাগী। ই মদ লয়, আমারে আমি পিণ্ডি দিছি। রাম মোরে আবার রাজা করে দিয়্যাছে, তু জানবি কী? ক্যারেও বলতে দিব না দশরথ অপিণ্ডিয়া ছিল।'

## জল

বাকুলি গ্রামটা একটা লাল ডাঙাজমির গামলার পেটে বসানো। হেলিকপটার থেকে দেখে অপারেশন-বাকুলির নায়কদের তাই মনে হয়েছিল। রিপোর্টে লেখা হয়েছিল ভূ-পৃষ্ঠের গড়ন বেসিনের মত। একটা বিশাল বেসিনের পেটের মধ্যে গ্রাম, চারদিকে জমি উঁচু ও গোল। পুবদিকে দেড় মাইল দূরে ক্যানাল। গ্রামে ১৯টি পরিবার বাস করে, জনসংখ্যা ১০৯। উৎপন্ন শস্য ধান। কর্ষণযোগ্য জমি বেসিনের কানার বাইরে। একটি বড়ো তেঁতুল গাছ, কয়েকটি আম, কাঁঠাল শিরীষ ও পলাশ গাছ আছে। এ গ্রামের ধর্মঠাকুরের থান প্রসিদ্ধ। লক্ষ্মণ সামন্ত সবটুকু কৃষিভূমির মালিক। গ্রামের ১৮টি পরিবার লক্ষ্মণের ভাগচাষী। গ্রামে জলের অভাব খুব বেশি। লক্ষ্মণের বাড়ির চৌহদ্দিতে দুটি ইঁদারা ও একটি গভীর নলকূপ আছে। গ্রামের প্রাচীন পুকুরটি বর্তমানে মজা, জলশূন্য। চার মাইল পশ্চিমে খরস্রোতা নদী। আমরা যখন দেখি, লক্ষ্মণের বাড়ি ও ধানের টাল থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে।

তারপর অপারেশন-বাকুলি আকাশ থেকে মাটিতে নেমেছিল। সম্পূর্ণ ব্যবস্থা টেলিফোন-যোগাযোগ ও রেডিও-সিগনালের মাধ্যমে হয়।

গোকুল, নিরাপদ ও তারিণী লক্ষ্মণ সামন্তের ধানের টাল থেকে ধান টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তেঁতুল গাছের নিচে জমা করছিল, গোকুলের বাবা নির্ভরসা ছেলেদের গালাগালি দিচ্ছিল।

গোকুল সরযূকে বলেছিল, রাতে হোক দিনে হোক পালাতে হবে। পালাবার পথ আছে কিনা আজ দেখে আয়।

'আঁধারে আঁধারে যাব।'

সরযূ গিয়েছিল। অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল।

অনেক বাদে ফিরে এসেছিল মুখ শুকনো করে। বলেছিল, 'কোনো দিক হতে বেরাবার পথ নাই। সকল দিক ঘিরা। সক—ল দিক।'

কেননা তখন অপারেশন-বাকুলি অস্ত্র হাতে চলে গিয়েছিল। গ্রাম ঘেরা হয়েছিল, 'দেখবে যেন একটি মাছিও না বেরোতে পারে' নির্দেশ ছিল।

সকালে ১৮টি পরিবার দেখেছিল চারদিক থেকে গোল হয়ে মানুষের, সারিসারি মানুষের বেড়াজাল বাকুলির দিকে নামছে, জালটা ছোটো হচ্ছে।

সরযূর আর কিছু মনে নেই। অনেকগুলি লোক নামছে। এগোচ্ছে, সংকল্পে ভয়াল। পবিত্র শপথে কঠিন। নিঃশব্দ। কাঁকরের ওপর ক্রাঁচ ক্রাঁচ শব্দ, বুটের নিচে কাঁকর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ক্রাঁচ-ক্রাঁচ-ক্রাঁচ শব্দ। ক্রমে বালকরা চুপ করল। শিশুদের চোখে বিস্ময়। গোকুল অস্ফুটে বলল, সরযূ। দিঘির ধারে ঝোপ-জঙ্গল সেথা পলাতে পারলি না?'

না। সরযূর পা নড়ল না। বুটের শব্দ বুটের শব্দ বুটের শব্দ 'হল্ট।' হুকুম। 'কার নাম গোকুল দাশ?' যান্ত্রিক গলা। তারপর সরযূর চেতনায় একটি কালো পর্দা। নিরুত্তর বিদ্বিষ্ট, অবাধ্য একটা পর্দা। 'কার নাম গোকুল দাশ?' পর্দা নেমে এল।

পর্দাটা পড়েছে, পড়েই আছে। সরযূ অনেক চেষ্টা করেছে পর্দাটা তুলে ভালো করে দেখতে. বুঝে নিতে, 'কার নাম গোকুল দাশ?' এই প্রশ্নের পর কী হয়েছিল জেনে নিতে পারেনি। স্মৃতি থেকে পর্দা টা নড়ে না। অবাধ্য, বিদ্বিষ্ট, ভীষণ প্রতিবাদে অনড় হয়ে থাকে। যেন সরযূর স্মৃতিটা কোনো সেন্সর-করা চিঠি। খানিকটা আছে। খানিকটা কালি ঢেলে অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে। বাকিটা পড়া যায়। মাঝখানের অন্ধকার অধ্যায়ের পর সরযূ যখন আবার মনে করতে পারে আবার যখন বিশ্বভুবন ও বাকুলি ওর চেতনায় ধরা পড়ে তখন বাকুলির চেহারা অন্যরকম।

গ্রামে বুড়ো-বুড়ি মেয়ে-শিশুতে বাইশজন লোক। প্রতিটি বাড়ি নিশ্চিহ্ন! আকাশে ছাই। দুটি ইঁদারা ইট ও কাঁকরে বোজানো। গভীর-নলকূপটি উপড়ানো মাটিতে ঘা হয়ে আছে। তেঁতুল গাছটি ছাড়া অন্য ছায়াতরুগুলি জ্বলে ছাই। খরা চলছিলই। সব শুকনো হয়ে ছিল।

অপারেশন—বাকুলি সাকসেসফুল।

গামলার পুব কানায়, ক্যানালের পথ আটকে একটি অস্থায়ী অ্যালুমিনিআমের ঘর। সূর্য যখন ওঠে, পুব দিগন্ত থেকে রাগে জ্বলতে-জ্বলতে সাদা হয়ে থাকে সূর্যের চোখ। সূর্য কোটি-কোটি ফারেনহাইট উত্তাপ ঢালতে-ঢালতে ওঠে। তাই, সূর্য উঠলেই সরযূরা দেখতে পায় অ্যালুমিনিআমের ঘরটি নিখাদ রুপার মত জ্বলছে। ঘরের জানলায় দেবতার মতো গৌরদেহ, তেজস্বী এক যুবক বসে থাকে। তার চোখে দূরবীন।

গভীর নলকূপটি ঘরের নিচে বসানো। ঘর ও টিউবওয়েল কাঁটাতারে ঘেরা। কুলিরা সারাদিন কল টেপে। জল তোলে। ঘরের চালে অ্যালুমিনিআমের ঘরের চালে নির্ভর সার ঘরের চাল ও ছাউনি বসানো। কুলিরা হোসপাইপ দিয়ে চালটি ভেজায় বারদশেক। ঘর ঠাণ্ডা রাখায় অন্য কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি। এ বছর এ অঞ্চলে দুরন্ত খরা। বৃষ্টি নেই ফাল্গুন থেকে। এখন আষাঢ়। সূর্য সব সময়ে কোটি কোটি ফারেনহাইট ঢালছে তো ঢালছেই। আটটা বাজলেই দিগন্তরেখা ও আকাশের মাঝখানে বাতাস উত্তাপে কাঁপে, মনে হয় দিগন্ত ব্যেপে প্রেতপ্রেতিনী নাচছে। বাতাসে কাঁকর ওড়ে, আকাশ ধূমল ও ভয়ংকর দেখায়।

লক্ষ্মণ সামন্তের ছেলে শরদিন্দু ওই যুবকটির কাছে বসে থাকে। ওই ঘরে বাকুলির অস্থায়ী ঈশ্বরকে চলন্ত-সংবাদ পরিবেশন করে।

'এই গ্রামের ওপাশে, ক্যানালের গায়ে যত জমি সব আমাদের। বাবা করেছিল।'

'চাষ হয়?'

'এ বছর হয়নি। জল ছিল না?'

'ক্যানালে জল ছিল না?'

'ক্যানালের জল কে নেবে?'

'ওরা?'

'কার টানা তিন বিঘে জমি আছে? কে খাজনা দেবে? ওদের তো এখানে পাঁচ কাঠা। দেড় মাইল দূরে এক বিঘে। এই হাল।'

'তোমার বাবা জল নিতে পারত।'

শরদিন্দু মাথা নাড়ে। না। টানা জমি ছিল টাকা ছিল কিন্তু বাবা জল নিতে পারত না। কেন পারত না। কেন পারত না। সে কথা বাবা শরদিন্দুকে বুঝিয়ে বলেছিল।

বলেছিল, 'তুইও দেখি খেপা ওই গোকুলের মত। গোকুল এতক্ষণ চেঁচাল। তুইও চেঁচাচ্ছিস।'

বাবা কখনোই চায়নি ভাগচাষীরা জল নিয়ে চাষ করে তাকে বিঘা-প্রতি ধান বেশি-বেশি দিক। নিজেদের খোরাকি পাক। বাবুরাও চায়নি চাষ ভালো হোক, দুর্ভিক্ষ ঘুচুক। কেননা, দুর্ভিক্ষ থাকলে তবে সাহায্য-খয়রাতি আসে।

বাবা বলেছিল, 'ক্যানালের জল এনে বান ভাসাতে পারি। কিন্তু জলে

আমার দরকার কী? ইদারা আমার। চাষের জন্যে টিপা কল সরকার আমারে দেখে দিয়াছে। আমার ঘরে কল বসাছি। জল! জল দিয়ে কী হবে? ধান হবে? ধান দেখাস না শরৎ। ধান বেচে কত পাব? বিশ হাজার টাকা? জল নিব না। ধান বাড়াব না। দেখবি এ বছরেই তোর সামনে বসে বসে পঁচিশ হাজার টাকা দশটা গ্রামে ধার দিব। ধার দিব সুদ নিব। এই সুদ হতে সকল সম্পত্তি করেছি। ক্যানালে জল আছে সে মোর অজানা?'

'ওদের কী বলব?'

'সে তুই ভাব্‌গা যেয়ে। এদিকে আকাল হয় বুঝি, সদরে যেতে হবে। খয়রাতির টাকা আসবে সে কি গোকুলের কথায়? মোরা গ্রাম-প্রধানরা রিপোর্ট দিব তবে আসবে।'

শরদিন্দু বেরিয়ে এসেছিল। কী বলা যায় গোকুলকে দুরন্ত খরা, জলাভাবে পোড়তলায় চারা-ধান খাক হয়ে যায়। জল পেলে তবে ধান নাড়া চলত। ক্যানালে অনেক জল। সকলের চোখের সামনে দিয়ে ক্যানাল দিয়ে জল বয়ে যায় রাতে জলের গর্জন শোনা যায়। জলের অভাবে চাষ হবে না। ক্যানালের দু-তীরে বিঘার পর বিঘা জমি বন্ধ্যাত্বের ক্ষোভে ও বেদনায় ফেটে চৌচির হবে। গোকুলকে কী বলা যায়?

গোকুল বলছিল, 'বাবা কী বললেন?'

'ক্যানালের জল আনতে অনেক হাঙ্গামা।'

'হাঙ্গামা বলতে সদরে আর্জি, বিডিও আপিসে খবর, ক্যানালের খাজনা।'

বাবা বলেন, 'হাঙ্গামা বিস্তর।'

'সব যে মরে গেল, মরে যায়?'

লক্ষ্মণ সামন্ত বেরিয়ে এসেছিল। বলেছিল, 'কে ওখানে? গোকুল? কী হয়েছে বাবা?'

'আপনি ক্যানালের জল নিচ্ছেন না কেন?'

'ক্ষমতা নাই বাবা! তোমাদের ক্ষমতা থাকে নাও গা। আর্জি লিখ। আর্জি তো তুমি আমার ঘরে কল বসাবার সময়েও লিখেছ। আর্জি তুমি ভালই লিখ। খাজনার টাকা জোগাড় কর, আমি বিডিও আপিসে দিয়া দিব।'

'জমি আপনার খাজনা দিব আমরা।'

'আমার ক্ষমতা কী?'

'ক্ষমতা আমাদের আছে ?'

'ক্ষমতা নাই ? ক্ষমতা অনেক। এই কল বসাবার সময়ে তোমার ক্ষমতা দেখি নাই আমি ? বাবা গোকুল! এটা বুঝল না আমার জমি, হলে বা বাড়ির জমি, তাতেই কল বসল। নইলে বিড্ডি তাল তুলেছিল ক্যানাল আছে। কল দিব কেন ?'

'আপনি ক্ষমতাবান লোক, তাই চাষের জন্ম সরকার কল দেয়, আপনার ঘরে কল বসে। বেশ জল নিবেন না। মানুষ যে মরে যায়। তার কী হবে ?'

'বাবা! এই যে মরে যায় কথাটা বললে এটা কি ঠিক বললে ? বাকুলিতে কারেও আমি মরতে দিই ? কখনো দিয়াছি ? টাকা কে দেয় ? ধান-বাড়ি কে দেয় ?'

'জল বিনা চাষ জলে যায়। তবু আপনি জল নিবেন না ?'

'বাবা। আমি সেকালা মানুষ। আমার বুঝ-সম্বিত আরেক রকম। দোষ নিওনা বাবা একটা কথা শুধাই। ভগবান জল না দিলে চাষ হয় খালের জলে ? কখনো হয়েছে ? কোথাও হয়েছে ?'

'কুডাসিমায় হচ্ছে।'

'ঠেঁটা তর্কে লাভ নাই গোকুল। কথায় কুকথা বাড়ে। এখন বল, চির-কাল খরা হলে তোমরা, ঠাকুরথানে পূজা দিয়াছ জল হয়েছে। এবার হল না কেন ?'

'কেন হল না আমি কী বলব ?'

'এবার তোমার চেটাং-চেটাং কথায় মাহাত্ম্য ছেড়ে গেল। ঠাকুরের নামে তুমি চেটাং চেটাং কথা বল। তোমা হতে বাকুলিতে পাপ ঢুকল।'

'তবে এই আপনার শেষ কথা ?'

'হ্যাঁ।'

গোকুল চলে গিয়েছিল। বাবা শরদিন্দুকে বলেছিল চিঠি 'দিচ্ছি। সদরে চলে যা শরৎ। আমার কথা না পেলে আসবিনা। গোকুলের গতিক আমি ভালো বুঝি না। এইজন্তেই তোর মা-বউ সব সদরে রেখেছি। বাস ধরে চলে যাবি। রিপোর্ট লিখাবি সদরে।'

সদরে থাকতেই খবর পেয়েছিল শরদিন্দু। লক্ষ্মণ সামন্ত নেই। ওদের বাড়ি জলছে।

শরদিন্দু সব কথাই বলল এখন। বলল, 'বাবারও জেদ ছিল খুব। ওই জল হতে সব গণ্ডগোল বাধল।'

'ওরা রাতে কোথায় যায়?

'দিঘিতে। দিঘির বুক খুঁড়ে। বিহানে যেয়ে জল আনে। আপনি ভাববেন না সার। বিহান না হতে জল টেনে যায়।'

'তবু ওরা গ্রাম ছাড়ছে না কেন?'

বাকুলিতে বসে সরযূ নির্ভরসাকে সেই কথাই বলল। বলল, 'গ্রাম ছেড়ে যাওনা কেন?'

'কোথা যাব?'

'সদরে যাবে, ভিক্ষা করবে।'

'তোরা?'

'মোরাও ভিক্ষা করব।'

'কেও জল দিল না?'

'না। কুড়াসিমায় মোদের নাম শুনলে ডরায়। সাহেব স্নান করে, জল বহে পড়ে যায়। সে জলও দিল না। তুমি যে মাটিতে কাঠি টেনে জলের হদুক জানতে। তোমারে যে গ্রামে গ্রামে ইঁদারা কাটবার আগে ডেকে নিয়া যেত। তুমি জানতে। ওই ডাঙ্গাজমিতে কল বসালে জল উঠবে? এই এত জল?'

'হোথা কোনোদিন দেখি নাই।'

'হেথা বসে-বসে কল টানে শব্দ শুনি। রাতে ক্যানালে জল বহে যায়, শব্দ শুনি। আজ তেরদিন মাথায় জল নাই। সব যেন জ্বলে গেল।'

নির্ভরসা চোখ বুজে বসে রইল। একটা জালা আঁকড়ে ও বসে থাকে। জালা আঁকড়ে ঘুমোয়। মেয়েরা শেবরাতে মজাদিঘির বুক খুঁড়ে জল আনে। জালায় ঢালে। আজ তেরদিন সেই জল মেপে-মেপে নির্ভরসা সকলকে দেয়। ওরা সবাই পোড়া ধান নখে খুঁটে চাল বের করে খায়। ওরা সবাই তেঁতুল গাছের নিচে বসে থাকে দিনে ও রাতে। সরযূ মাঝে-মাঝে গাছে উঠে তেঁতুল পাতা ছেঁড়ে। সকলকে দেয়। টক তেঁতুল পাতা চিবলে মুখে লালা কাটে। গলা ভেজে। কিন্তু এখন আর শরীরে জল নেই। তাই মুখে লালা তেমন কাটছে না।

নির্ভরসা বলল, 'একবার গেলে আর ফিরতে পারব? নতুন প্রজা বসাকে শরৎ।'

'নতুন প্রজা বসাবে, বাস-পারমিট পেয়েছে, টাকা দিবে সরকার।'

'তবে?'

'তোমারে আর প্রজা রাখে? এখন কারে বা প্রজা রাখবে। কে বা চাষ করবে বল? মেয়েরা বুড়িরা, কোলের ছেলেরা? তুমি বুঝ না কিছু?'

'যে একবার গ্রাম থেকে বেরাবে, তাকে আর ফিরতে দিবে না, নয়ত বেরালে আমি বেবস্থা করতাম।'

'কী করতে? জল নামাতে?'

'বেবস্থা করতাম।' নির্ভরসা অবাধ্য জেদে বলল!

সরযূ নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, 'লোচনের পরিবার, ছিরিপদর মা', সোনা মাঝির পরিবার, এরা চলে যাচ্ছে।'

'চলে যাচ্ছে?'

'সদরে যাবে। হেথা পড়ে জীয়ন্তে মরবে?'

নির্ভরসা চোখ বুজে বসে রইল। তারপর বলল, 'আজ রাতে দেখতে বল।'

'কেন?'

'ধর্মঠাকুরের পূজা আমার হাত হতে হত। জীবনে মিথ্যা বলি নাই, আজ রাতে জল ডেকে দেখি। ঠাকুর জল দেয় কিনা।'

'রক্ত দিবে কে?'

'তুই দিবি।'

সরযূর বুকে শেল বিঁধল। গোকুলের কথা বুকে বিঁধে আছে। গোকুলের যে তার ওপর খুব বিশ্বাস ছিল? সে কেমন করে বুক চিরে রক্ত দেবে। জল ডাকবে?

'পারবি না?'

সরযূর বুক ঠেলে নিরশ্রু কান্না উঠে এল। মাথা নাড়ল ও। গোকুল তো বলেনি, ধর্মঠাকুর মিথ্যে? সে তো বলত, যে-কাজে পাঁচজনের ভালো হয়, সে-কাজ করতে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়? গোকুলের কথা মনে করতে গেলেই কেন কাঁকরের প্রতিবাদ বুটের ক্রাঁচ ক্রাঁচ শব্দ মনে হয় সরযূর? 'কার নাম গোকুল দাশ' কথাটা কেন শুনতে পায় ও? কেন মনে হয়, ওই

'কার নাম গোকুল দাশ?' প্রশ্নটার সঙ্গে-সঙ্গে ওর চেতনা থেকে একটা কালো পর্দা নামিয়ে দিল কে?

সরযূ মাথা নাড়ল। বলল, 'পারব।'

নির্ভরসা যেন ভরসা পেল। বলল, 'অনেক রক্ত লাগে, তাই কারে বলতে পারি নাই।'

সরযূ মাথা নাড়ল বলল, 'তবে সেই কথা।'

'তা বাদ্বে জল হবে।'

'হবে।'

'কখনও বৃথা যায় নাই'

সরযূ চুপ করে রইল। 'অপারেশন-বাকুলি সাকসেসফুল।' সব নিশ্চুপ। কালান্ত হচ্ছে কোথাও, যুগান্ত হচ্ছে। সব নিশ্চুপ। ক্যানালের জল বয়ে যায় তার শব্দ। ওদিকে কলটেপার শব্দ। জল কত জল। নিরশ্রু কান্নাভরা রক্তাক্ত চোখ দুটি দিগন্তের দিকে মেলে দিল সরযূ। দিগন্তে বাতাস কাঁপছে। যেন প্রোতোৎসব, প্রেতপ্রেতিনী নাচছে দিগন্তে আকাশের গায়ে। সূর্য জ্বলছে। আকাশ থেকে কোটি কোটি ফারেনহাইট উত্তাপ ঢালছে। বেলা দশটা হবে।

রাত দশটা বাজল। হঠাৎ অ্যালুমিনিআমের ঘরে বসে যুবকটির মনে হল বাকুলিতে বাইশটি মানুষ যেন কী করছে। নিশ্চয় ক্যানালে অথবা নদীতে যেতে চেষ্টা করছে না? দু-দিকেই পাহারা। তবে কী করছে ওরা?

যুবকটি কোমরে রিভলবার নিল, হাতে দূরবীন। নেমে এল ও সিঁড়ি ধরে। কাঁটাতার পেরিয়ে গামলাটার কানায় এসে দাঁড়াল। চোখে দূরবীন তুলল।

চাপা ও অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না। কিন্তু দূরবীনে সব স্পষ্ট দেখা যায়। মেয়েরা, বুড়িরা, হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শীর্ণ কঙ্কালের মতো চেহারা, চুল রুক্ষ। কোনো-কোনো মেয়ের কোলে শিশু।

একটি মেয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সেই বুড়োটা। দ্যাট গোকুল দাশের বাবা। মেয়েটার বুকের আঁচল নামিয়ে কোমরে জড়িয়ে দিল।

ভয়ংকর, নিষ্ঠুর। এক আদিম দেবতার মতো দেখাচ্ছে বুড়োটাকে। বুড়োটা হাত জোড় করে কী বলল। তারপর, যুবকটি শিস্ দিল উত্তেজনায়। বুড়োটা একটা ছুরি দিয়ে মেয়েটার বুক চিরে দিচ্ছে। হোআট ক্রুয়েলটি।

মেয়েটার বুক দু'টা কেঁপে উঠল। বুড়ো ওর হাতে একটা পাত্র দিল। মেয়েটা দু-হাতে বুকের কাছে পাত্রটা ধরল। রক্ত পড়ছে নিশ্চয়ই। মেয়েটা মাথার ওপর মালসাটা তুলল। তারপর, রাতের জ্যোৎস্না ও ক্যানালের জলের শব্দ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে, কান্নাভরা গলায় ডেকে উঠল, 'জল দাও! দাও গো ঠাকুর।'

মেয়েটা 'জল দাও।' বলতে বলতে ঘুরতে লাগল 'বিশ্বভুবন জ্বলে গেল ঠাকুর, জল দাও।'

যুবকটিকে সব রকম সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা বলে ব্রিফিং করে দেওয়া হয়েছে। ওরা আরো গোলমাল করলে কী করতে হবে, ওরা ক্যানাল বা নদীতে যাওয়ার চেষ্টা করলে কী করতে হবে। সব নির্দেশ পেয়েছেন যুবকটি। কিন্তু তের দিন একটা গ্রামকে এক আঁজলা জলও না দিলে রাতে গোকুল-নিরাপদ-তারিণীর বাবা শুকনো চোখে গোকুলের সঙ্গিনী মেয়েটার বুক চিরে দেবে, মেয়েটা বুকের রক্ত পাত্রে ধরে জল ডেকে ডেকে চেঁচাবে। এর জন্যে কোনো ব্রিফিং তাঁকে করা হয়নি।

ব্রিফিং হয়নি। নির্দেশ পাননি। ড্রিল-প্যারেড করে করে যুবকটির রক্ত-মজ্জা-মন ওপরঅলার নির্দেশ ছাড়া কিছু করতে পারে না। হল্ট—চার্জ—স্টপ—অ্যাড-ভানস এইসব নির্দেশ তিনি চেনেন ও নির্দেশ পেলে কাজ করতে পারেন। এখন এই পরিস্থিতিতে তিনি অসহায়, নির্দেশ নেই বলে অক্ষম ও নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। তাই তিনি সারারাত দাঁড়িয়ে রইলেন। সারারাত, সারারাত মেয়েটি 'জল দাও' বলে ডাকতে লাগল।

তারপর সকাল হল। সূর্য উঠল। সাদা, ক্রুদ্ধ, নির্মম সূর্য কোটি-কোটি ফারেনহাইট। বাতাস জ্বলছে।

তারপর লোকগুলি গ্রাম ছেড়ে বেরোল। যুবকটি ফিরে এলেন। স্বস্তি, বিশাল স্বস্তি। এখন শরদিন্দু নতুন প্রজা বসাতে পারবে। ওরা চলে যাচ্ছে। বুড়ো-বুড়ি মেয়ে-শিশু। কোনো বালক-যুবক-প্রৌঢ় নেই। নেই কোনো কিশোর বা তরুণ। থাকার কথাও নয়।

রুক্ষ ও দগ্ধ প্রান্তর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা সড়কে উঠল। বাস আসবে। বাস ওদের নিলে ওরা বাসে যাবে। নইলে সাত মাইল হেঁটে সদরে যাবে।

বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সরযূ বলল, 'যারা গোকুলদের ধরাল,

তারা বাঁচল না। জল ডেকে বুক চিরে রক্ত ফেলালাম, জল হল না। তারা বা গে'কুলদের ধরাল কেন, আমি বা রক্ত দিলাম কেন?'

কেউ উত্তর দিল না। এ প্রশ্নের উত্তর কারো কাছে ছিল না। ওরা দূরে বাসের ধুলো দেখতে পেল। বাস আসছিল, লাল ধুলো উড়ছিল। বাতাস জলছিল, বাতাসে ক্যানালের জলের শব্দ।

## রং নাম্বার

রাত একটা। তীর্থবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। টেলিফোন বাজছে। মাঝরাতে টেলিফোন বাজলে কেন এত ভয় করে?

'হ্যালো। শুনুন…হাসপাতাল থেকে বলছি…আপনাদের পেশেণ্ট এইমাত্র মারা গেলেন। হ্যালো।'

'আমাদের পেশেণ্ট? হাসপাতালে আমাদের কোনো পেশেণ্ট নেই।'

'আপনার নম্বর?'

'রং নম্বর! ছেড়ে দিন।'

'রং নাম্বারে ফোন করেন কেন? রং নাম্বারে!'

তীর্থবাবু ফোনটা নামিয়ে রাখেন। ভয় করে। ভীষণ ভয় করে।

'হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে কেন? কেন এত রং নাম্বার হয়?'

সবিতা জিজ্ঞেস করেন। আজ অনেকদিন হয়ে গেল সবিতা বা তীর্থবাবু কেউ অনেক রাত অবধি ঘুমোন না। ঠিক বারোটায় তীর্থবাবু একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নেন। খেয়ে চোখ বুজে শুয়ে মনটা চিন্তাশূন্য করে ফেলতে চেষ্টা করেন।

পারেন না। কিছুতে পারেন না তীর্থবাবু। তাঁর চেতনা আর অবচেতনা, প্রথম স্তরের চেতনা আর অতল স্তরের চেতনা, প্রত্যেকটির মাঝ দিয়ে খাড়া খাড়া দেওয়াল উঠে যায়। দেয়ালগুলোর গায়ে পোস্টার আঁটা থাকে।

দীপঙ্করের ছবি। শৈশবের দীপঙ্কর, মাথা ন্যাড়া, ন্যালাভোলা চেহারা। ম্যাট্রিক পাশ করা দীপঙ্কর। গ্রাজুয়েট দীপঙ্কর। লম্বা একহারা, ভাবুক আর শান্ত চেহারা।

দীপঙ্কর। তীর্থবাবুর একমাত্র ছেলে। সন্তান, সন্তান, মানুষ সন্তান কেন চায়? কেন ভালবাসে সন্তানকে? তীর্থবাবু রোজ এই প্রশ্নটা নিজেকে করেন।

তারপর ঘুম আসে। গাঢ়, অথচ অস্বস্তিতে আতঙ্কে বিপর্যস্ত ঘুম। সবিতা বোধহয় তখনও ঘুমোন না। তাই তিনি জিজ্ঞেস করেন কার ফোন?

'রং নাম্বার।'

'কোথেকে?'

'হাসপাতাল থেকে।'

'হাসপাতাল থেকে? ওগো আমাদের ফোন যদি হয়?'

'পাগলামি কোরো না সবু। দীপু নীরেনের কাছে আছে তুমি তো জান। ওখান থেকে নীরেন ওকে দিল্লিতে ভর্তি করে দিতে চেষ্টা করছে। সব জেনেও পাগলামি কর কেন?'

'নীরেনের কাছে যদি থাকবে, তবে দীপু চিঠি লেখে না কেন? নীরেন কেন চিঠি লেখে না আমায়? তোমরা কী ভেবেছ আমি কান্নাকাটি করব? ছুটে যাব নীরেনের কাছে?'

'সবু, অস্থির হয়ো না।'

'আমার যে মনে হয় দীপু নীরেনের কাছে নেই? নীরেন ইচ্ছে করে আমায় কিছু বলছে না?'

'চুপ করো সবু, কেঁদো না। সব ঠিক আছে। তুমি তো জান দীপুর পালিয়ে থাকবার কোনো কারণ নেই।'

'তবে ও আসে না কেন?'

'সবু, অসুখে অসুখে তুমি অবুঝ হয়ে গেছে। দিনকাল খারাপ, এ অঞ্চলটাও ভালো নয় তাই ও আসে না।'

সবিতা এই সময় কাঁদতে শুরু করেন। আস্তে আস্তে, গুমরে গুমরে।

কাঁদতে কাঁদতে এক সময়ে সবিতা ঘুমিয়ে পড়েন। তীর্থবাবুর ঘুম আসতে দেরি হয়। কী হয়ে গেল দেশের অবস্থা। আচ্ছা, রুগী যদি মারা যায়, তবে টু-থি এক্সচেঞ্জের নম্বর দিলে ফোর-সেভেনে ফোন করবি তোরা? রং নাম্বার। যাদের রুগী, তাদের মনের কী অবস্থা হয়?

কিংবা হয়ত কোনো অবস্থাই হয় না। আজকাল নাকি সবাই কুরুক্ষেত্রের অর্জুন, চূড়ান্ত নির্বেদে মৃত্যুকে গ্রহণ করে। লাশ নাকি বিছানাতেই পড়ে থাকে। খরচ বাঁচাবার জন্য আত্মীয়রা চলে যায়, আর আসে না। নাকি পড়েই থাকে ঠাণ্ডা গুদামে। কেউ দেখতে আসে না পর্যন্ত।

তীর্থবাবুর ভয় করে, খালি খালি ভয় করে। এ একটা অন্য কলকাতায় বাস করছেন তিনি, অন্য পশ্চিমবঙ্গে। দেখতে মনে হয় সেই শহর। সেই

গড়ের মাঠ-মনুমেণ্ট-ভবানীপুর-আলিপুর-চড়কডাঙ্গার মোড়। সেই আষাঢ়ে রথের মেলা—চৈত্রে কালীঘাটে গাজন—মাঘে বড়দিনের আলোকসজ্জা।

সে শহর নয়। এ একটা ভুল শহর। রং সিটি। ভুল ট্রেনে চড়ে ভুল শহরে এসেছেন তীর্থবাবু।

নইলে, সবিতাকে বলা সবগুলো স্তোকের কথা ভুলে গিয়ে তীর্থবাবু ভাবেন, নইলে দীপঙ্কর চিঠি লেখে না কেন? কেন নীরেন খবর দেয় না দীপঙ্করের?

কেন, কেন সন্তান চায় মানুষ, কেন ভালবাসে আত্মজকে, আত্মজাকে? মৃত্যুতে মুখাগ্নি করবে বলে? রং আনসার। যতদিন জীবিত আছেন ততদিনই সন্তানকে চান তীর্থবাবু। কাছে থাক তুই, পাশে থাক। আমার জালা যন্ত্রণা নে, ভাগে নে,। আমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে শেখ্।

রং হোপ।

কোথায় একটা এক্সচেঞ্জ আছে যেন, এই শহরে কোথায় আছে একটা এক্সচেঞ্জ? কে সেখানে বসে তীর্থবাবুকে শুধু বলছে রং নাম্বার। রং সিটি। রং হোপ।

কে সে? কোথায় সেই অদৃশ্য অপারেটর? অপারেটরদের দেখা যায় না কেন?

ভাবতে ভাবতে তীর্থবাবু টুপ করে ঘুমের ভেতর ডুবে যান। এই রকমই চলে দিন থেকে রাত, সোম থেকে রবি, সকাল থেকে সন্ধ্যা। রাতগুলোকে ভয় করে তীর্থবাবুর, কেননা ঘুমের মধ্যে শুধু সারি সারি দেওয়াল দেখতে পান তিনি।

দেওয়ালে দীপঙ্করের মুখ আঁকা থাকে। ঘুমের মধ্যেই তীর্থবাবু ভাবতে থাকেন তবে কি মনোজের কাছে যাবেন। মনোজ ওর বন্ধু, মনের রোগের ডাক্তার। তীর্থবাবুর নিশ্চয়ই অসুখ হয়েছে। তোমার অসুখ হয়েছে তীর্থ।

মনোজ রায় দিল। তীর্থবাবুর শুকনো মুখ, কাতর চাহনি আর বারবার কপাল থেকে ঘাম মোছার চেষ্টা ও লক্ষ করছিল।

'কী অসুখ?'

'নার্ভের।'

'নার্ভ তো আমার ভালোই মনোজ।'

'তোমার চিন্তাগুলো অলীক।'

'অলীক !'

'তুমি কী বলেছ তুমি নিজেই শোন।'

মনোজ টেপরেকর্ডার চালিয়ে দিল। মনোজ রোগীদের স্বীকারোক্তি টেপ করে নেয়। তারপর বিচার করে। রায় দেয়। তীর্থবাবু টেপ-রেকর্ডারটা দেখে মনে মনে টাকার অঙ্ক হিসেব করছিলেন। এখন হঠাৎ একটা ক্লান্ত, নিচুগলা শুনতে পেলেন।

'আমার মনে হয় বাড়িটা আমার নয়। কড়া নাড়লে কেউ দরজা খুলবে না—কেননা আমি রং অ্যাড্রেসে এসেছি। পথে ঘাটে চলতে চলতে আমার শুধু মনে হয় কলকাতা এখন কলকাতায় নেই। বাইরের বাড়ি-ঘর-দোর গড়ের মাঠ মনুমেণ্ট সব অন্য একটা শহরকে ধরে নিয়ে কলকাতা উধাও হয়ে গেছে। মনে হয় ইট্‌স এ রং সিটি! কোনো প্রয়োজন নেই তবু এটা যে সেই কলকাতাই তা নিজেকে বিশ্বাস করাবার জন্যে সেদিন ক্যাওড়া-তলা গিয়েছিলাম। দেওয়ালের লেখাগুলো পড়েই বুঝতে পারলাম আমি ভুল জায়গায় এসেছি। সেদিন আমি স্বপ্ন দেখেছি…'

টেপ রেকর্ডার থামিয়ে দিল মনোজ। তীর্থবাবুর দিকে চাইল। বলল—

'কী স্বপ্ন দেখেছ তীর্থ?'

'আমি বলতে পারব না।'

'কী স্বপ্ন?'

'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না মনোজ, আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। স্বপ্নটা আমি মাঝে মাঝেই দেখি।'

'সেইজন্যেই আমার জানা দরকার।'

'না মনোজ।'

'তুমি অসুস্থ তীর্থ। স্বাভাবিক, অসুস্থ হওয়া স্বাভাবিক…'

'কেন? আমার পক্ষে অসুস্থ হওয়া স্বাভাবিক কেন?'

'তোমার ছেলে তো……'

'আমার ছেলে কী?'

'বাড়িতে নেই।'

'মনোজ, আমি জানি না কে তোমায় কী বলেছে। আমার ছেলে দীপঙ্কর। কাজিন নীরেনের কাছে আছে লক্ষ্নৌতে। ওখান থেকে দিল্লিতে পড়বে দীপঙ্কর।'

'গড!'

মনোজ যেন যন্ত্রণায় আর দুঃখে কথাটা বলল। ভেতর থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠে এল একটা। তীর্থ, ওদের সময়ের সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার ভালো ছেলেটা এ রকম হয়ে গেল?

'গড!' মনোজ খসখস করে ওষুধের নাম লিখল। কাগজ ছিঁড়ে ফেলল, তারপর একটা ওষুধের শিশি দিল তীর্থবাবুকে।

বলল—

'রাতে এটা খেয়ো তীর্থ। ঘুম হবে।'

'দাও।'

তীর্থবাবু ওষুধের শিশিটা নিলেন। বেরিয়ে এলেন। মনোজ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল। তারপর বলল—

'বোস তোমার কাছে আর যায়নি তো?'

'না, কেন?'

'আমি ওকে বারণ করেছি।'

'ও এলে আমি ঢুকতে দেব ভেবেছ বাড়িতে? .সবিতাকে সব আজে-বাজে কথা বলে আজেবাজে কথা বলে চলে যায় শুধু! তীর্থবাবু বেরিয়ে এলেন, এখন সন্ধ্যা হয়েছে।

না কি সকাল? রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক।

নাকি জনশূন্য পথ?

নির্জন পথ—মেঘাবৃতা রজনী…ঝড় ঝঞ্ঝা—জয়সিংহ ছুরিতে শাণ দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের ঐ বর্ণনাটা তীর্থবাবুর খুব ভাল লাগত।

দীপঙ্করের পাঠ্য ছিল 'রাজর্ষি'।

তীর্থবাবু বুঝতে পারলেন তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে টপটপ করে।

সন্তানরা এখন ঘাতক, ঘাতক ওরা। পিতামাতাদের নিয়ত হত্যা করে থাকে। তীর্থবাবু ওষুধের শিশিটা যত্ন করে নিয়ে যেতে লাগলেন। যেন অলিম্পিকের পবিত্র অগ্নিশিখা নিয়ে যাচ্ছেন।

আজ রাতে শুয়ে শুয়ে তীর্থবাবু সেই স্বপ্নটা আবার দেখলেন। শুয়ে দেখলেন চৌরঙ্গী রোডটার দু'পাশে লক্ষ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারা সবাই নিশ্চল। পথের দুপাশে বড়ো বড়ো শাদা উজ্জ্বল আলো। পথের মাঝখানটা রক্তাক্ত। সেখানে দাঁড়িয়ে একটি প্রৌঢ়া রমণী আলুলায়িত

চুলে বুকে হাত চাপড়ে প্রবীর! প্রবীর! প্রবীর! বলে বিলাপ করছে। মেয়েটিকে দেখেই তীর্থবাবু বুঝতে পারলেন ও পুরাণের সেই জনা।

দূরে—দূরে—ভীষণ প্রান্তরে
মরুভূমে—দুরন্ত শ্মশানে—
হেথা তোর নাহি স্থান।
দুর্গম কান্তারে, তুষার-মাঝারে,
পর্বত-শিখরে চল।
চল পাপ রাজ্য ত্যজি,
পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা।
চল পুত্র-শোকাতুরা—

রমণীটি আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। এই সময়—ড্রপ ফেলে দাও। ঘণ্টা বাজাও! বলে কারা চেঁচিয়ে উঠল। কে বলল এটা মাহিষ্মতীপুর নয়। চলে যাও।

তৎক্ষণাৎ তীর্থবাবু বলতে গেলেন শী ইজ ইন্ দি রং সিটি! কিন্তু ঘণ্টা বাজতে শুরু করে দিল।

ঘণ্টা বাজছে। ফোন বাজছে।

তীর্থবাবু উঠে বসলেন। টেলিফোন মানুষ রাখে কেন? ভাড়া দিতে জিভ বেরিয়ে যায়, নাভিশ্বাস উঠে যায় যখন?

তীর্থবাবু রিসিভার তুললেন।

'ফোর সেভেন...নাইন?'

ঠিক ঐ নাম্বারটাই তীর্থবাবুর সামনের টেলিফোনটার গায়ে লেখা আছে। তীর্থবাবু বললেন, 'নো'।

'এটা তীর্থঙ্কর চ্যাটার্জির বাড়ি নয়?'

'নো।'

'তীর্থবাবু, আমি! বোস। হ্যাঁ সেদিন যা বলেছিলাম। ...দূরে রেল লাইনের পাশের বডিটা, হ্যাঁ দীপঙ্করের। ডায়েড অফ ইনজিওরিস! আপনি তো এলেন না। বডি হাজ বীন ক্রিমেটেড। হ্যালো! শুনতে পাচ্ছেন?'

'না।'

'এটা তীর্থঙ্কর চ্যাটার্জির বাড়ি নয়।'

'না।'

'এটা ফোর সেভেন···নাইন নয়?'

'না, রং নাম্বার।'

তীর্থবাবু ফোন নামিয়ে রাখলেন। কী ভেবে রিসিভারটাই নামিয়ে রাখলেন। তারপর বিছানায় ফিরে গেলেন। স্বপ্নটা আবার দেখতে হবে। যেমন করে হোক আরেকবার দেখতে হবে। স্বপ্ন দেখে তবে তীর্থবাবু জানতে পারবেন কেমন করে উন্মাদিনী জনা রং সিটি থেকে পালিয়ে গেল। স্বপ্ন ছাড়া তীর্থবাবুর হাতে আর কিছুই নেই আজ। জেগে জেগে কলকাতার পথ ঘুরলে একটাও বেরোবার পথ দেখতে পান না তীর্থবাবু। এখন তাঁকে জনার পেছন পেছন যেতে হবে। প্রবীরের মৃত্যুর পর প্রবীরের বাপ থেকে সবাই যখন ঘাতকদের নিয়ে বিজয়োৎসব করছিল, একা জনা পালিয়ে গিয়েছিল।

তীর্থবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

## উর্বশী ও জনি

উর্বশীকে কোলে নিয়ে বসেছিল জনি, জনির কোল না হলে উর্বশী বসতে পারে না। ঠাস-ঠাস করে আছাড় খায়। এ কী ন্যাক্‌রা বলো দেখি? ডাক্তারের সামনেও জনির কোলে বসবে উর্বশী? ডাক্তার মোটেই খুশি হচ্ছিল না। শেষ-বেশ বলল, 'উঠে এস এদিকে।'

উর্বশীকে চেয়ারে সযত্নে বসিয়ে জনি উঠে গেল। ডাক্তার উর্বশীর দিকে চেয়ে জনির সঙ্গে কথা বলতে লাগল। জানা কথা উর্বশী মুখ খুলবে না। যত কথাবার্তা, সব ওর জনির সঙ্গে।

'প্রথমে গলায় কি কষ্ট হত?'

'গলা ভেঙে যেত।'

'তারপর?'

'কাশি হত।'

উর্বশীর দিকে ডাক্তার চাইলে জনির চোখ হিংসেয় হলদে হয়ে যায়, তবু উর্বশীর দিকে চেয়ে ডাক্তার বলল, 'আগে কিছু বোঝনি? কোনো ডাক্তারের কাছে যাওনি?'

জনি হেসে বলল, 'আমার জানটা, বুঝলেন ডাক্তারবাবু, এই মেয়েছেলে খেয়ে নিলে। মেয়েছেলে তো জানেন, কিছু হলে বলবে না। এখনও তো দেখেছেন কী ছুরৎ, দেখলে মাথা ঘুরে যায়। গিছলাম ডাক্তারের কাছে।'

'কার কাছে?'

'হেকিমি, কোবরেজি সব করিয়েছিলাম।'

'হোসেন ডাক্তারের কাছ থেকে চিঠি এনেছ? উনিও দেখেছেন?'

'উনিই পাঠালে। বললে, ভাল বুঝি না জনি। তোকে এই উর্বশীতে খেলে। ওর জন্যে তোর জনম ভোর য্যাত খোয়ার।'

'কী হয়েছে, কিছু বললেন?'

জনির মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। যেন ঝড়-জলে চটে-ফেটে গেল কোনো চেনা পুতুল অথবা মূর্তির প্রাচীন মুখ। জনি বলল, 'আপনি তো জানেন ডাক্তারবাবু, উর্বশীকে ছাইলে সকল খেলা কানা। ও গান গাইবে, বাতচিত করবে,

নাচবে, কোমর দোলাবে, হাসবে। পাবলিক বলবে, হ্যাঁ উর্বশী, কেমন আছ? ও বলবে, বড়ো সুখে আছি গো! আমি সুখের রানী! জনি মোকে বড়ো সুখে রেখেছে।'

'আরে, কাজের কথা বলো?'

জনি ফিশফিশ করে বলল, 'হোসেন ডাক্তার যা বলল, তা শুনে তো মোর হাত-পা পেটে সাঁদিয়ে যাচ্ছে ডাক্তারবাবু।'

'কী বললেন?'

'বললেন, সব বন্ধ হয়ে যাবে জনি। তোর উর্বশী আর হাসবে না, গাইবে না, কথা বলবে না।'

'কেন বললেন, বুঝলে কিছু?'

'গলায় জানি কী হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

'কী জানি হয়েছে।'—জনি ঘাড়টা এদিক থেকে ওদিক ঘোরাল, যেন বলির পশু টের পেয়েছে কাছেই হাড়কাঠ।

'গলায় ক্যানসার হয়েছে জনি।'

'ওষুধ দেন, সুঁই দেন।'

'এখন আর লাভ হবে না জনি। ক্যানসার হাসপাতালেও তো গিছলে। তারা কিছু বলেনি?'

'বলেছিল।'

জনির গলা ভেঙে এল, কান্না ঠেলে উঠল গলায়। বলল, 'উ কথাই বলেছে সার। আপনার ব্যাগ্যতা করি। উর্বশী না-গাইলে নাচলে মরে যাব না-খেয়ে।'

জনি কাঁদছিল। উর্বশী নির্বিকার মুখে বসেছিল। ডাক্তারের হঠাৎ ভয় হল। কিসের ভয় তা তিনি বলতে পারবেন না। মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন তিনি, মৃত্যু কত রকম হয়। মরণ, নিধন, অন্ত। এন্ড অফ লাইফ। বিয়িং কিল্ড। সীজিং টু বি। সেই বস্তু মৃত, ছাট হ্যাজ সীজ্‌ড টু বি। উর্বশী মৃত, নিহত, বরবাদ। কেন না যে-গলায় উর্বশী কথা বলে, গান গায়, হাসে, সে-গলার গ্রাসনালী, স্বরগ্রন্থি, ঝিল্লী, গলবিল, কলা, স্বরকক্ষ, সর্বত্র ক্যানসার সিংহাসন পেতে স্থায়ী রাজত্ব করতে বসে গেছে। সেই গলাটি ক্যানসারের সিংহাসন। রাজ্যকাল ফুরোলে ক্যানসার স্বীয় সিংহাসন নিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু উর্বশী নির্লিপ্ত, ভুবনমোহিনী, অপরূপা, পীনদ্ধ বুক, লাল ঠোঁট, চোখ স্থির-স্থির। কাঁদছে শুধু জনি। জনির আকুলতা, উর্বশীর নির্লিপ্ততা দেখে তরুণ ডাক্তারের ভেতরে সব হিম হয়ে এল। যেন তিনিই মরে গেলেন, হিম-হিম হয়ে গেলেন। কিন্তু ভয় হচ্ছে কেন? মরে গেলে তো আর কোনো ভয়-নির্ভয় থাকার কথা নয়।

'কিছু বলেন, ডাক্তারবাবু!'

'জনি, হাসপাতালে গেলে, ক্যানসার হাসপাতালে...'

'ক্যানচার হাসপাতালে কিছু জানে না ডাক্তারবাবু, পেটের নাড়িতে ক্যানচার হয়, বুকে হয়, গলায় ক্যানচার হয় কখুনো?'

'ওখানে ভর্তি হলে পরে বরং...'

'উর্বশী একা রইবে না যে!'

'জনি, পাগলামি করছ তুমি। উর্বশীর কি ক্ষতি হবে?'

'সে আপনি বুঝবে না।'

নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল জনি। চোখ মুছে বলল, 'চল্ উর্বশী, ঘরকে যাই।

'জনি, তোমায় অনেকদিন দেখছি, তাই ভালো কথা বলি শোনো। হাসপাতালে যা হয়, ঘরে তা হবে না।'

'হোথা গেলে উর্বশী ফের নাচবে, গান গাইবে, কথা কইবে?'

'না জনি।'

'যে-গলায় ও গান গায় কব্ সে মুহব্বত, লোলিতা—। সে-গলা ঠিক হয়ে যাবে?'

'না জনি।'

'তবে?'

জনি হঠাৎ খেপে গেল। বলল, 'সব শালা কানীর দলে গিয়ে সই হয়েছে। মোকে উর্বশীর কাছ হতে হটাতে চাও। চোপরাও শালা, ফের হাসপাতাল—হাসপাতাল বাতাবে তো চাকু ভুঁখে দিব।'

জনি চেঁচাতে লাগল। শালা থেকে শুরু করে খারাপ কথার বান ছুটিয়ে দিল। নার্স, আর্দালি, হাসপাতালের লোকজন ছুটে এল। সবাই সন্ত্রস্ত।

'সব শালা হটকে—হাঁ বাবা, তফাত যাও। নয় তো দনাদন্ মেরে দিব। সবাই কানী মোতির দলে যেয়েছে। আমি বুঝি না? চল্ উর্বশী।

তোকে মোর কাছ হতে ছাড়ব না। শালা ডাক্তার হয়েছে! তোতে-মোতে ছাড়াছাড়ি করাবেই।'

ডাক্তার বলল, 'যেতে দাও, যেতে দাও, মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'তোমা—র মাথা খারাপ হয়েছে। এতক্ষণ দেখছিলে না ওকে? শালা অসুখের কথা বলবে, তো ওর বুক পানে চেয়েছিলে কেন? আমি বুঝি না কিছু?'

ডাক্তার উঠে এল। জনির কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চেঁচাবে না জনি। একদম চেঁচাবে না। আস্তে কথা বলো, চলে যাও!'

'উর্বশীর গলা বন্ধ হয়ে যাবে বলছ, আমি চেঁচাব না?'

'না। চেঁচাবে না!'

জনি সভয়ে গলা নামাল। বলল, 'চেঁচাব না?'

'না।'

জনি কাঁদতে লাগল। বুড়ো, ঢোলা ও তালিমারা প্যান্ট পরনে, গায়ে রঙিন গেঞ্জি, গলায় রঙিন রুমাল, পায়ে ঢবঢবে জুতো, মাথায় পালকের টুপি, ওকে কাঁদুনে-বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে। যেন বাড়ির দেয়ালে সাঁটা পোস্টার থেকে সার্কাসের ক্লাউন কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে ও উর্বশীকে সযত্নে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এল।

হাসপাতালের বাইরে, যেখানে ওষুধের শিশি বিক্রি হয়, সেখানে বসে মুলো রামাম্মা চা বেচছিল। জনি ওর সামনে বসল, উর্বশীকে বসাল প্যাকিং বাক্সের ওপর।

রামাম্মা বলল, 'কী গো মেরিজান! চা খাবে? আজ যে লাল ঘাগরা দেখি!'

জনি বলল, 'চুপ যা মুলো।'

'লে, তু খা।'

'দে।'

'আদা দিই?'

'দে।'

'কী বুলল ডাক্তার?'

'ক্যানচার।'

'কোথা?'

'গলায়।

'হোঃ!'

গলায় তাচ্ছিল্য ঢেলে রামান্না বলল, 'গলায় ক্যানচার হয়? মোকে ক্যানচার দেখাস না জনি। আমি মড়া দেখে দেখে হদ্দ হইছি। ক্যানচার হলে বাবা জ্যান্তে মড়াপচা গন্ধ বেরোবে। আরে সেলুকটার কুথা মনে নেই। শালাকে গাড়ি হতে নামাচ্ছে তো হেথা অব্দি গন্ধ ছুটছে। মরতে, বুল্লি জনি, শালাকে অগুরুতে চোবালে, তবু গন্ধ মরেনি।'

'মনে আছে।'

'মরতে সব সিকি ছড়িয়েছিল শালা।'

'তু কুড়োতে যেয়ে আছাড় খেলি।'

'তু শালা সে ফাঁকে আমার পয়সার কৌটো লিয়ে ভেগেছিলি। ছ টাকা বাট পয়সা।'

'পরদিনকে মাল খেলি কার পয়সায়?'

'না বলিছি?'

জনি চা খেল। তারপর বলল, 'কী করি বুল্ তো?'

'লেংড়ির কাছে যা।'

'কেন?'

'এ বাবা, কানী মোতির কাম লয়। লেংড়ি বলে দিবে।'

'এ কুথা কেন বলছিস?'

রামান্না মুলো- কনুই দিয়ে পেট চুলকে বলল, 'আমি যেয়েছিলাম লেংড়ির কাছে। মেয়েলোকটার খাঁই খুব। বলে ভাল বিড়ি লিয়ে আয়, ভেজিটেলি চপ। একটা মড়ার বালিশ চেয়েছিল। সধ্বার মড়ার বালিশ। বলেছি এনে দিব। তা, বিড়ি খাওয়ালাম, চপ খাওয়ালাম...'

'নিজের পয়সায়?'

'পয়সা আবার কার নিজের হয় বাবা? পয়সা তুমি কার? যার কাছে রই তার! না, নিজের পয়সা নয়। সেদিন কী হল জানিস?'

'কী?'

'ভগীরথ ওষুধ বেচেছিল। পার্টির ওষুধ। পেশেন্ মরতে পার্টি খাট আনতে গেছে। ভগীরথ তখনি ওষুধ-হর্লিক, সব লিয়ে হাওয়া। ও টাকা দিয়েছিল।'

'লেংড়ি কী বলে ?'

রামান্না গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'কানীরে তু বেকার দুষছিস জনি। ও তোকে মুহব্বত করে।'

'ধুস্! কানী, ধুমসি। ওর মুহব্বত কে চায় ?'

'না রে! সাচ্চা মুহব্বত খুব ভাল জিনিস রে! তোরে খাওয়ায়, দেখে, ঘরের ভাড়া লেয় না সকল সময়ে। এই সেদিন আমার কাছকে বসে কত কাঁদল। বলল, জনি একবার বললে ওরে জন্মভোর পুষব। তবে হ্যাঁ, উর্বশীকে ছাড়তে হবে।'

'তু কী বুললি ?'

'বুললাম, উ কথা তু বেইমাদ হয়ে যা কানী। জনি উর্বশীকে ছাড়বে না, অন্য বাত বল্।'

'লেংড়ি কী বুলে ?'

'বুলে, কেউ বুঝি উর্বশীকে চায়। তাই বান মারা করেছে। নইলে গলায় ক্যানচার হয় না। আমিও বললাম, জনি আমার চিক্কে দোস্ত্। লেংড়ি, ওর কথা আমি জানি। মোকে বল্।'

'কী বুলল ?'

'বুলল, আসতে বলিস রেতের বেলাকে।'

'আজ যাব ?'

'আরে আজ উই লুকটার চৌথা। লেংড়ি তো পাত কুড়োবার কাপ্তেন। দল নিয়ে হোথা থাকবে! সব জায়গায় শালা বেজায় গোলমাল! চিরকাল, জানা কুথা। লক্কার মাঠের বাঁ-পাশে বিয়ে-ছরাদ্দ-পইতে-ছেলের ভাতে পাত কুড়োবে লেংড়ির দল। ডান পাশে মাগনদাসের দল। এ শালা ভিখমাঙাদের ধম্ম-কম্ম সব গেছে, জানলি ? লেংড়ি কখুনো ডান পাশে যায় না। মাগনদাসের দল বাঁ-পাশে চলে আসবে, হাংনামা করবে। লেংড়িকে জানে না। আজ লেংড়ি বদরি আর হামিজাকে লিয়ে যাচ্ছে। হাংনামা করলে মাগনদাসকে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে।'

'বদরি আর হামিজা আসবে ?'

'আসবে না মানে ?...যে-যার ওয়াড়ে থাক। হাংনামা নেই। বদরিকে লেক-বাজারের ফুটপাতর, হামিজাকে কমলাবাড়ির ফুটপাতর কে দিয়েছে ? লেংড়ি দেয়নি ? বদরি এখন খায় কত! বাজার থেকে পাঠায় লাড়,

মাছের লাড়ি, কুমড়োর বুকো, বদরির গতর খুব। বদরি বুলল, মাসি, বদরি রইতে তোমার ডাস্‌বিনের কলাপাত মাগনদাস লিতে পারবে না।'

'আজ ওরা খাবে খুব!'

'ধুস্‌। বাংগালীর ছরাদ্দ? যে মাছ মাংস খাবে? তবে লেংড়ি বুলল, এ হচ্ছে হক্কের লড়াই। ছেড়ে দিলে মান থাকবে না। লেংড়ি লড়াই খুব বোঝে। উ চলে গেলেও লড়াকু বুলে লাম রইবে। উর লামে শালা ফুটপাতের লাম দিয়ে দিব।'

'তবে আজ যাব না?'

'কাল যাস। পুন্নিমের দিন, ভাল দিন।'

'ওষুধ দিবে?'

'দিবে না? লেংড়ির জবান্‌ খেলাপ নাই। সকালে যাস না যেন। আজকাল সকালে হাপ পেণ্টুল পরে ট্যাক্সি পোঁছে। কামাচ্ছে দু-হাতে। রাতে যাস। যা খায়, বুতল লিয়ে যাস।'

'কানী মোতি নিদুষী?'

'হ্যাঁ রে।'

'লে, রিকশা ডাক্‌ একটা।'

'ঘর যাবি?'

'হ্যাঁ। রোদে-তাতে উর্বশীকে লিয়ে ...'

'জনি!'

'বল্‌?'

'আমি তোর চিক্কে দোস্ত মানিস?'

'জরুর।'

'সেই উদোম বেলা হতে।'

'লিচ্চয়।'

'উর্বশীকে তু ছেড়ে দে।'

জনির বুকের ভিতর সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভয়ে। রামাম্মা, রামাম্মা! কত দিনের বন্ধু ওর! ওর মুখেও একই কথা? জনির বুকের ভেতর লাশঘরের ঠাণ্ডা। জনি কি মরে যাবে ভয়ে? মরে গেলেই কি? কিন্তু মরে যাবার পর কি এত ভয় থাকে, এত আতংক? মরলে তো মানুষ সব ভয়-অভয়ের বাইরে চলে যায়? তাই তো যাবার কথা?

'এ কথা কেন বুলছিস রামান্না ?'

'ও তোকে খেয়ে লিবে।'

'জানি।'

জনির মুখ বিষণ্ন হয়ে গেল। যেন বাড়ির দেয়ালে সাঁটা পোস্টার থেকে চেয়ে-থাকা ক্লাউন ঠিক করল, শহরকে আর হাসি মুখ দেখাবে না। বিষণ্ন, বৃদ্ধ, বাঁদরের মত শোকাকুল মুখে জনি বলল, 'জানি রে রামান্না। কিন্তু তুই বুল্ রামান্না, ওকে, আমার সনমকে মুহব্বত করে হাসতে ভি রোতে ভি এতকাল কেটে গেল। এখন ওর আঁখ, বদন, হাসি না-দেখলে আমি মরে যাব।'

'জানি।'

'কেউ বাঁচবে, তু বল ? তু তো জানিস, কী সুন্দর জিন্দ্‌গী, সবাই সুখ চায়। পাবলিক ওকে বুলে, ক্যায়সা হ্যায় উর্বশী ? ও বুলে 'বহুত সুখ মে'। পাবলিক বুলে, হম্-লোক ক্যায়সা হ্যায় ? ও বুলে, বহুত সুখ মেঁ। পাবলিক বুলে, তবু তু সুখ্‌কে গানা গা। ও গায়, ও জীনেবালে। হাস্‌তে-হাস্‌তে জীনা !'

'জানি।'

রামান্নাও বিষণ্ন হয়ে গেল। বলল, 'উর্বশী জাদুগব্‌নী, শয়তানের বান্দী, জিন্। ও যার কাছে গেছে তাকে খতম করে ছেড়েছে। তুকেও খাবে। আবার কাকে খাবে ঠিক কী ?

জনি বলল, 'আমি ওকে তার আগে খতম করে দেব।'

'তুই।'

'হাঁ রে।'

রামান্না নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, 'রাতে লেংড়ির কাছে যাস। যা খায়, লিয়ে যাবি। লইলে কিছু বুলবে না।'

'লিচ্চয় লিয়ে যাব। উর্বশী লাচবে, গান গাইবে, বেরিলি কা বাজার মেঁ ঝুমকা গিরা রে। লেংড়ি দাওয়া দিবে। লয়তো নিজের বুকেও চাকু ভুঁখে দিব, ওর বুকেও।'

রামান্না চুক্ চুক্ শব্দ করল মুখে। বলল, 'ওই বুকে চাক্ চালাবি ? যাঃ শালা, তবে তুর ছরাদ আমি করব না।'

জনি ঘোলাটে চোখ মটকে হেসে বলল, 'ছরাদ পরে, কবর দিবি, না লাশ জালাবি? জানিস?'

'ছুস্ শালা, ধম্মের ঠিক নাই।'

'কবরও দিস, জালাসও।'

'ছুস্ শালা, তুর কি দুটো মড়া হবে?'

'মোকে আর উর্বশীকে, বুল্‌লি, ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ বাজিয়ে, আসিটিলিং বাতির চেরাগ দিয়ে লিয়ে যাবি ফুলে ঢেকে, স—ব ফুল কিনে লিবি শহরের। তা-বাদে পহেলা জালাবি। তা-বাদে ছাই লিয়ে কবর দিবি। ছরাদ করবি খুব শোর মচিয়ে। লেংড়ির দল, মাগনদাসের দল, বদরির দল, হামিজার দল, স—বকে ফুটপাতরে বসিয়ে খাওয়াবি। ক্যাটারিন্ হতে উদিপরা ব্যায়রা আনবি।'

'পয়সা কে দেবে?'

'আরে সব ফিরি করবে ছুটকে এসে। জনি মরেছে, উর্বশী মরেছে, সব দেখবি মিনি মাংনা, ফিরি! শালা, লয়লা-মজনু চলে যাচ্ছে। কেউ পয়সা চাইবে? আমরা মরে গেলে দেখবি আর কেউ হাঁস উঠাবে না। গান বাতাবে না, সব আয়্‌! হমেঁ গম্-দিল! আয়্‌! হমে গম্ দিল দিল! বলে বুক চাপড়ে রোতে-রোতে মরবে! শালা, শহরের সব হাঁস্-খেল্ লিয়ে চলে যাব।'

মুলো রামান্না আর জনি হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে জনি উর্বশীকে রিকশায় তুলল। উর্বশীর রেশম-রেশম চুল বাঁচিয়ে জনি বিড়ি ধরাল। রামান্নার দিকে চেয়ে চোখ মটকে ধোঁয়া ছাড়ল।

রাস পূর্ণিমার আশ্চর্য চাঁদের আলো কলকাতাকে সপ্রেমে স্নান করাচ্ছিল। যেন জ্যোৎস্না স্বয়ং লয়লা, কলকাতাটা দিওয়ানা মজনু, জ্যোৎস্নার প্রেমে পাগল হয়ে নোংরা হয়ে আছে, তাই এই প্রেমময়ী জ্যোৎস্নার গঙ্গাবতরণ।

রাত এখন অনেক। সময় এখন প্রহর-চেতনাহীন। জ্যোৎস্নায় উন্মত্ত কয়েকটি কুকুর ছাড়া কেউ এত প্রেমপ্লাবনের সুযোগ নিচ্ছে না। কেন না কলকাতার মানুষ প্রেম ও ভালবাসার দরকার বড়ো কম বোঝে। তারা ঘুমিয়ে পড়ে, নয়তো নেশার সন্ধানে ফেরে, নয়তো জ্যোৎস্নার প্রবেশপথ জানলাগুলি বন্ধকরে দিয়ে অপ্রেমে শরীর খোঁজে।

এমন জ্যোৎস্নায়, প্রেম-প্লাবনে স্নান করতে করতে জনি থামে হেলান দিয়ে কাঁদছিল। মনে বড়ো দুঃখ ওর। এখন ও-ই লয়লী ওই মজনু। 'আশমাঁওয়ালে তেরি দুনিয়া হামে ঘবড়া দিয়া, সারে দুনিয়া মেঁ চান্দনী কিঁউ মেরে লিয়ে বাদল হো গিয়া?'

বড়ো দুঃখ ওর। ওর দুঃখে লেংড়িও চুক্-চুক্ শব্দ করছিল। সত্তরে পৌঁছে লেংড়ি যেদিন বোঝে ওকে ফুটপাথের দখল রাখবার জন্যে চণ্ডিকা হতে হবে, সেদিনই ও শাড়ি ছেড়ে ফেলে। শাড়ি বলতে কানি। তখনি ও হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরে, আবক্ষিলম্বিত সাদা চুল কেটে ফেলে বব ছাঁটে। কোমরে একটা লম্বা গেঁজে পাকে-পাকে জড়িয়ে রাখে, গলায় একটা কালো কারে বাঁধা আরশি।

আরশি হাতে। গেঁজে থেকে আঁতুড়ে শিশুর নখ, ধনেশ পাখির ঠোঁট, মক্ষে পোয়াতির মড়ার চুল, জেঁওচ পোয়াতির মড়ার সিঁদুর, সব নিয়ে গুনে গেঁথে ও বলল, 'কিছু হবার নয় ধন আমার। বান মেরেছে কুনো পিচাশ। আমার আর সেদিন নাই, যে তার বানকে উলট বানে বেকল করি। তোমার বুতল তুমি লাও ধন। তোমার দুঃক্ষে মোর বুক ফাট-ফাট করছে মানিক আমার। যদি এলে, য্যাখন হতে যে-গলায় উর্বশী গাওনা করে, কথা কয় সে-গলার জখম ধরতে এলেনি কেন?'

জনি বিস্ময়ে কাঁদছিল। পরনে ঢোলা প্যান্ট, রঙিন গেঞ্জি, গলায় রঙিন রুমাল জড়ানো। পায়ে চবচবে জুতো, মাথায় পালকের টুপি। ওকে মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। যেন বাড়ির দেয়ালে সাঁটা সার্কাসের পোস্টার থেকে নেমে এসেছে কোনো ক্লাউন। আর সে হাসবে না, হাসাবে না বলে নেমে এসেছে। বিদ্রোহ করে। কেন না তার বুক ভেঙে গেছে।

ভাঙা বুকের, চিড়খাওয়া হৃদয়ের বড়ো দুঃখ গো। চিন্তায় বুক পোড়ে। চিতার আগুনের চেয়ে চিন্তার আগুনে জ্বালা বেশি, দগ্ধে মারে। জনি, পোস্টারের ক্লাউন হয়ে গিয়ে কাঁদছিল। আর সে হাসবে কেন? প্রেমধারার জ্যোৎস্না ওর বুক জুড়োতে পারছিল না। ভাঙা বুক নিয়ে ও কোথায় যাবে? য়ে দিল কাঁহা লে যাউঁ, অব কৌন্ ঠিকানা হায়?

যে গলায় উর্বশী, আকুল-অঞ্চলা, বিদ্যুৎ-চঞ্চলা, ঈষণী, অনন্ত-রঙ্গিণী, বন-সঙ্গিনী গান গাইত, দুখিয়া জিয়ারা রোতে নৈনা—গাইত, লাভ মি ডার্লিং-

গাইত, তোমার গলায় গান ছিল—আমার গলায় সুর ছিল—গাইত, বাঁশকা খিড়কি বাঁশকা দুয়ারা আও বনায়ে ঘরোয়া প্যারা, সে গলা থেমে যাবে গো। অস্তে যাবে সে গৌরবশশী—মুঝে ভি লে চলো ঘপ্পোকা পার—জনি তাই কাঁদছিল।

ওর কান্না দেখে জ্যোৎস্না হাসছিল, কুকুরগুলো ভালবাসাবাসি করছিল। লেংড়ি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে চেয়ে ঘোলাটে চোখ থেকে জল ফেলেছিল আর বলছিল, 'তুমি রামাম্মার চিকে দোস্ত্‌, বাপ আমায়। তোমার জন্তে উলট বান মারি এমন খ্যামতা মোর নাই বাপ। চোখেও দিশে না ভাল। তাই আরশিতে তার ছেঁয়া দেখি নাই।'

'তবে কানী মোতি লয় ?'

'না বাপ। ও তোমারে বড় ভালবাসে।'

'উর প্রেমে ডর লাগে যে ?'

'ডর কিসের ? উর্বশীরে ছাড়। ওরে নিয়ে ঘর কর। উ রাঁধবে, বাড়বে, খেতে দিবে, তুমিও বুড়া হলে।'

'কিন্তু উর্বশীরে ছাড়ি কী বলে ? ও কোথা যাবে ?'

'কেউ কিনে লিবে।'

'কে ?'

'তাই তো দেখলাম না মানিক। কে বুঝি ওরে চায় বলে বানমারা করেছে।'

'মোর তাই সন্দ। উর্বশীর চ্যায়রা দেখে সবার রিষ।'

'তুমি পাগল হয়েছ বাপ।'

'পাগল ছিলাম না মাসি, ও মোরে পাগল করল। তখন আমি জোয়ানটা। ওরে কোলে বসিয়ে ট্যাক্সা চেপে ঘুরো মরেছি কত। ঢোলপুর, বান্দা, ঝাঁসী, লাল্‌থাপুর, হাসিরপুর। সে-খেলা কী-খেলা মাসি। তখন ও গাইত, আঁখিয়া মিলাকে, জিয়া ভরমাকে চলে নহী যানা! আমি বলতাম, কভি নেই প্যারী! ও গাইত, জানসে না জানে দুংগি, যাকে রাস্তা রোখ্‌ লুংগি, সাঁইয়াকে পাইয়া পর পড় জাউজি, রোকে কহংগি—আঁখিয়া মিলাকে!'

'সব জানি মানিক।'

'মোদের ট্যাক্সার পিছে ছেলেরা ছুটত, কাগজ কুড়াতে। পিছে বলে

ওই রামাম্মা ঢোল পিটাত, উর্বশী কি খেল্! জনি কা খেল্! তখন সব অন্য রকম দিনকাল ছিল। ঢোলপুরে এক শেঠের ছেলে বলে, 'হাজার টাকা দিব, ওরে তুই বেচে দে। শাটিনের চিআরে ওরে বসিয়ে রাখব।'

'সব জানি।'

'কিন্তু সব লাশ হয়ে গেল মাসি। যে-গলায় ও গান গায়, কথা কয়, সেথা ক্যানচার।'

'ক্যানচার লয় সোনা, বান মেরেছে কেউ।'

'কারেও জান?'

'কারে জানব?'

'উলট বান মারতে পার?'

'না বাপ। টেরিটি বাজারে আনসারী ছিল—'

'মরে গেছে।'

'এখন যেয়ে খোদায় দোয়া মাঙ।'

'হায় খোদা!'

জনি চাঁদের দিকে একবার চেয়ে মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগল। কানী মোতি ওকে ভালবাসে? প্যার করে? মুহব্বত করে? প্যারসে কিঁউ তুম খবড়াতা দিল্? উর্বশীর জন্যে, উর্বশীর জন্যে। হঠাৎ মনে হল উর্বশী একা আছে। কানী মোতি জনিকে দেখে, আর দু বেলা উর্বশীকে ক্যাওড়াতলা পাঠায়। জনি ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে ও অনাথাশ্রম থেকে পালানো ছোট্ট জনি হয়ে গেল।

অনাথাশ্রমের দোরগোড়ায় কে ওকে ফেলে গিয়েছিল? কিছু মনে পড়ে না। অনাথাশ্রমটা ছিল পুরনচাঁদজীর। আশ্রমের ছেলেদের সঙ্গে জনিও ব্যাণ্ডের পথে পথে 'দীনে দয়া কর গো' গান গেয়ে-গেয়ে ফিরত। দলীপ সিং ওর গানের গলা শুনেই ওকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়।

দলীপ বলত, 'চল্ তোকে দুনিয়া শিখাব।'

দলীপ যে আরেক পুরনচাঁদজী, তা জনি বোঝেনি। ভিক্ষের চাল পয়সা পুরনচাঁদজী নিয়ে নিত। বাচ্চাদের লেংড়া, লুলো, লুঠে করত। রামাম্মাকে

পুরনচাঁদজই মুলো করেছিল জনি গাইতে পারত বলে ছাড় পায়।

পালাবার সময়ে রামান্না আর জনি দুজনেই পালায়। দলীপ রামান্নার হাতে একটা মাটির হাঁড়ি দিয়েছিল। রামান্না মুলো হাতের চাপে হাঁড়িটা গায়ে চেপটে ধরে অন্য হাতে টকাটক বাজাত। জনি গান গাইত। ট্রেনের কামরায়।

ছোট বেলাতেই জনি জেনে গিয়েছিল মানুষ বড়ো সুখ ভালবাসে। পথে দেখতে পেত মানুষকে সুখে রাখবার জন্যে কত আয়োজন। রাজ-জ্যোতিষী—বিনা অস্ত্রে ক্ষত আরোগ্য—সিনেমার কথা লেখা কাগজ বিলোতে-বিলোতে ঘোড়ার গাড়ি চলে যায়। গাড়ির ছাতে বসে বাজনদার বাজনা বাজায়। সব সুখী-সুখী সুরের গান?

সুখী-সুখী গানের সুর বাজিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ছুটত, পেছনে ছুটে ছেলেরা রঙিন কাগজ কুড়োত। জনি বুঝত, সবাই বড়ো সুখ ভালবাসে। অনাথাশ্রমের পুরনচাঁদজীও সুখ ভালবাসত। ওর মা-বাবার জন্মদিনে ও জনদের মিঠাই দিত। যাদের মুলো, লেংড়া, কুঠে করে দিত, তারাও বাদ পড়ত না। পুরনচাঁদজী একটা বড়ো টেবিলে উঠে জোড়াসনে বসত। শিবপুজো না-করে জল খেত না, কপালে চন্দনের ত্রিশূল আঁকাই থাকত। এক ঝুড়ি লাড্ডু আর গজা নিয়ে ও ছেলেদের পালের মধ্যে ছুঁড়ে দিত আর হুকুম করত, 'লে! উঠা! খা! হাঁস্ উঠা, গানা গা, নাচ কর।'

জনিরা খুব হাসত, গাইত, নাচত। লেংড়া-মুলো-কুঠে-কানারা সব চেয়ে বেশি হাসত। জনি জেনে গিয়েছিল মানুষ আসলে সুখ ভালবাসে। শহরে তখন গোলাপী কাগজ বাতাসকে গোলাপী করে রাখত। কোনো কাগজ বলত, জ্যোতিষী সুখের ভঁড়ারের ভাঁড়ারী। কোনো কাগজ বলত, কোনো কষ্ট না দিয়ে বিচ্ছিরি সব ঘা সারানো চলে। পথের ধরে তোতাপাখি নিয়ে বসে আবদাল্লা সুখ বিলোত। সিনেমায় গেলে তো দুশো মজা। শেষে সব নায়ক সব নায়িকাকে পেয়ে যেত।

দলীপ যখন আরেক পুরনচাঁদজী হয়ে জনি আর রামান্না ট্রেনের কামরায় গান গেয়ে যে পয়সা পেত, সব নিয়ে নিত, তখনো তাই জনি সুখের গান গাইত। ও জানত মানুষ সুখ চায় বলে সিনেমা যায়। যত কাঙালি-কেরানি-ক্যানভাসার-ফিরিঅলা-ফড়ে-পাইকার-হকার সবাই সিনেমা যায়

সুখের খোঁজে। দুঃখের সীন, দুঃখের গান, তারা সয়, পরে সব দুঃখ সুখ হয়ে যাবে বলে।

তাই দুঃখের গান, যে দিল কঁ.হা লে যাউ আগে গেয়ে নিয়ে জনি পরে ময়য় বন কী চিড়িয়া গেয়ে সকলকে সুখ দিত। বড়ো সহজে সুখী হতে পারে মানুষ। সিনেমা যারা দেখে না, পয়সা থাকে না তারা দর্শকদের লাইন দেখে সুখ পায়। যে কাঙালিরা মিষ্টির দোকানে ঢুকতে পারে না, তারা ফেলে-দেয়া ভঁড় আর খুরি চেটে সুখ পায়। হাত-পা নুলা ভিখিরিরা চৌরঙ্গীতে গলন্ত পিচে গড়িয়ে পুরনচাঁদজীদের জন্যে পয়সা চাইতে-চাইতে আপেলমার্কা মেমদের দেখে সুখ পায়।

তখন ও বুঝে গিয়েছিল দলীপের থাবা ছাড়িয়ে পালাতেই হবে। ও একা-একা সুখ বেচবে দেশ জুড়ে।

রামান্না পালায়নি, কলকাতায় থেকে যায়। কানী মোতি তখন কানা হয়নি। ও তখন বাড়িউলির বোনঝি। রামান্না আর জনি কিছুদিন ফুটপাথ থেকে চাঁদিনী-রেশমী-বেদানা দাসীদের জন্যে খদ্দের আনত।

জনি দিন ভোর সিনেমার টিকিট বেলাক করত। ফুটপাথে ঘুমোত। পয়সা থাকলে হবিবের দোকানে শিককাবার খেত। মাঝে-মাঝে গ্র্যান্ড, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে সায়েব-মেমদের ট্যাক্সি ধরে দিত। রামান্না বলত, 'তুই ভাল আছিস জনি।'

ফুটপাথে ঘুমিয়ে, সিনেমার টিকিট বেলাক করে, খুব সুখে থাকা যায়। পকেটে চার আনা থাকলে যে-সব ভিখিরিরা কলকাতাকে দিনেরাতে কিনে নেয়, জনি তাদের দলে ছিল। চির সুখী, স্বাধীন। সেই জন্যেই ও বাড়িউলির কথা শুনত না। মোতিকে বিয়ে কর, সংসারী হও, এ-সব কথা ওর ভালো লাগত না। কে মোতিকে বিয়ে করে? কে চায় আরেকটা পুরনচাঁদজী, আরেকটা দলীপ হয়ে বেদানা-চাঁদনীদের গতরখাটা রোজগারের পয়সায় ধনী হতে?

কলকাতার বাতাসে সুখ উড়ত। জনি বলেছিল, 'তুই হেথা পড়ে থাক্ গা।'

'তুই কী করবি?'

'সুখ নিয়ে আসব দুনিয়া লুট, সব কোই কো দেগা—হরির লুট, করে দেব শালা। কত সুখ চাস সবাইকে দেব। বলব সব শ‍ালা ফুটপাতকে

শো, ছাতু খা, গলায় রুমাল বেঁধে মেয়ে-ছেলে দেখ্। গানা গা, হাঁসতে থাক। জিন্দ্গী মেঁ সুখ সবসে বড়া জুয়েল। সবার হাতের মুঠোয় জুয়েল ধরিয়ে দেব শ্লা।'

'আমি কি শ্লা হেথা পড়ে রইব?'

'না রে! আমি আগে সুখ খুঁজে লিই, উসকে বাদ তুকে ভি লিয়ে যাব।'

'তু তবে মোতিকে সাদি করবি না?'

'ধুস্‌শ্লা—'

'উ বেটি আমাকে সাদি করবে না '

'তু লুলা যে!'

'তু চলে গেলে আমার দিল টুটে যাবে।'

'আরে! তু আমার চিরে দোস্ত। চলে গেলে ভি ফের ডেকে লিব।'

'তু হেথা থেকে যা!'

'ঠিক বলছিস।'

'সাচ্চা জবান।

'সব মনে আছে তো?'

'স—ব!'

'আমি মরলে তু মোর ছরাদ করবি। তু মরলে আমি তোর ছরাদ করব।'

'খুন্ সে বাত পাক্কা কর।'

'লেঃ শালা!'

ছুরি দিয়ে, একই ছুরি দিয়ে দুজনের হাতে চিকে চিরে দিয়েছিল দুজনে। খুব হেসেছিল দুজনে। একসঙ্গে গলা জড়িয়ে সিনেমা দেখেছিল। হবিবের দোকানে শিক কাবাব খেয়েছিল। তারপর জনি হাওড়া চলে গিয়েছিল। যে ট্রেন সামনে পেয়েছিল, তাতেই চেপে বসেছিল। টিকিট কাটেনি, বেঞ্চির নিচে শুয়ে পড়েছিল।

ভোর না হতে রাঁচি।

জনি তখনই ঠিক করে ফেলেছিল জীবনের নক্‌শাটা কেমন ঢঙে ছকবে।

মাস্টার জনির ওয়ান ম্যান শো।

রাঁচি, ডালটনগঞ্জ, আরো উত্তরে গিয়ে পশ্চিম ধরে কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ।

একেক জীবন একেক খেলা। জীবনের নকশা খেলার নকশার মতো রকম-রকম। যখন যে ছবি চলত, সেই ছবির নকশা দেখতে জনি।

হাটে, চৌরাস্তায়, চকে। মজনুর গলায় গাইত, চলতি হ্যায় কারোয়াঁ। লায়লীর গলায় গাইত, আশমাঁওয়ালে তেরি দুনিয়া মুঝে ঘবড়া দিয়া! ভিলেন হয়ে বলত, বাচ্চোঁ, মেরা চাকুসে তেরা কলিজা নিকাল দুংগি! ভাঁড় হয়ে প্যাণ্টের পেছনে বালিশ গুঁজে নাচত।

ঝমাঝম পয়সা পড়ত থালায়। যাদের সবচেয়ে বেশি সুখ দরকার, তাদের হাতে টিকিট কেনার পয়সা থাকে না। তারা সবাই জনির খেলা দেখত। জনি বলত, 'দুনিয়া বালোঁ! দুনিয়া মেঁ সুখ চিড়িয়াঁ। উড়তে-ফিরতে রহে। হাম চিড়িয়াঁ পাকড়কে তু-লোককে দিয়ে দিচ্ছি।' তানসেন হয়ে সায়গলের গলায় গাইত, 'বিনা পংখে পঞ্ছী হুঁ ম্যায়!' আকবরের গলায় বলত, 'তানসেন! তুম এ গানা কিঁউ গায়া তানসেন?' তানসেনের গলায় বলত, 'য়ে গানা নহীঁ শাহানশা! য়ে টুটে হুয়ে দিল কা পুকারা হ্যায়!' তানসেন হয়ে ও শুয়ে পড়ে বলত, 'মেরা পিয়াস বুঝাও!' তারপরই উঠে পড়ে তানী হয়ে যেত। আকাশ পানে হাত তুলে গাইত, 'বরসো রে! কালে বদরিয়া, পিয়া পর বরসো!'

সকলকে সুখ দিয়ে ও ফিরে যেত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। একলা পড়ে থাকত বেঞ্চিতে। যে-জীবনের যে-নকশা! সায়েব মেমরা কুকুর নিয়ে সিমলা যেত। ওর খুব সাধ যেত একলা জীবনে একটা নেড়ি কুত্তা পোষে। নাম দেয় রোভার। কুকুরটার গলায় চেন বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। সকলকে বলে, অ্যালছেছিহান। মাংস দিতে পারি না বলে বেঁটে হয়ে আছে।

আরো অনেক সাধ যেত। নৌটঙ্কীর ফুলকলিয়াঁকে পাশে বসিয়ে ট্যাঙ্গা চেপে ঘোরে। বাজারের আনারকে সঙ্গে নিয়ে নাচ দেখায়। চা-দোকানের পান্নাকে নিয়ে রাত কাটায়।

কিন্তু জীবনের নকশা বড় বিচিত্র। ফুলকলিয়াঁ-আনার-পান্না এ-সব কথা জনির চেয়ে অনেক রইস-রইস লোকের কাছে শুনে, সেইমতো কাজ-করে, হদ্দ হয়ে গিয়েছিল। সবাই শুধু বলত, সাদী করবি? ঘর দিবি?'

জনি বলত, 'ধুস্। আজাদী মানুষ বান্দাগিরি করে না। সাদী করে

মরে গাধারা। আমি বলছি তুদের হাতে দুনিয়া লুটে সুখ এনে দেব।'

মেয়েরা হেসে লুটোপুটি খেত। বলত, 'মিনি মাংনায় অত সুখ হয় না জনি!'

'মিনি মাংনা কিসে? আমি তুদের চুড়ি দিব, কাপড়লত্তা দিব, রোজ হোটেলে লিয়ে গোস্ খাওয়াব।'

'সে ত সবাই বলে। কাজে করে কি?'

নৌটঙ্কীর ফুলকলিয়াঁর মাসি খড়ি পেতে শুনত। বলত, 'তোরা মিছা ওরে বাঁধতে চাস। এক লায়লী আছে ওর। সে ওকে ঠিক ঢুঁড়ে লিবে। ওকে মজনু করে দিবে।'

বয়সের গরমে জনি চির স্বাধীন। সে সেই আনন্দে, হা-হা করে হাসত। বলত, 'ছুঁড়িয়া না-রাজ মৌসি। তব্ তু চলে চল্। তু মোর লায়লী হবি?'

'মর গা যা!'

'মরবি তো তুই।'

'তুই আগে মরবি।'

'আমি মরলে আমার চিকে দোস্ত্ ছরাদ করবে। খুন্ মে খুন মিলাকে পাক্কা বাত। আমার মড়ার আগে পিছে গ্যাস বাত্তির রোশনাই যাবে, ব্যাণ্ডো বাজবে, যত লোককে আমি সুখ দিয়েছি, সবাই বুকে হাত চাপড়ে, হায়! গমে দিল! হায়! দুনিয়া কেঁ খুশিকি রোশ্নি বুত গইল্। বলে কাঁদতে-কাঁদতে যাবে। তু মরলে মেহ্তর এসে ফেলাবে।'

বুড়ি ওকে মারতে যেত। জনি হেসে পালাত। কিন্তু একদিন ফুলকলিয়াঁ ওর কাছে এসে পা ধরেছিল। বলেছিল, 'তুঝসে মেরি মুহব্বত হয়ে গেল জনি। তুকে বিনা কিছু ভাবতে পারি না। ঘর চাই না, সাদী চাই না, তু মোরে লিয়ে চলে চল্।'

'কোথা?'

'যেথা যাবি?'

বড় ডরন্ত-পুরন্ত মেয়ে ছিল ফুলকলিয়াঁ। মুখে বসন্তের দাগ ছিল, রং মাজা-মাজা, কপালে উলকি। শরীর যেন দুধভরা কলসি, হাঁটলে পরে উছলে-উছলে পড়ত।

জনি বুঝেছিল, ফুলকলিয়াঁর চোখের দিকে চেয়েই বুঝেছিল, ছুরি চলে গেছে মেয়েটার কলিজায়। সাদী না করলে যে জনির পাশে বসে টাঙ্গা চেপে শহরে ঘুরতেও রাজি নয়, সে যেখানে নিয়ে যাবে জনি, সেখানে চলে যেতে চাইছে ?

জনির ভয় হয়েছিল। বলে কি মেয়েটা? জনি বাউণ্ডুলে ভবঘুরে। আজ এখানে, কাল সেখানে ঘুরে বেড়ায়। জনির কোনো স্বাধীন হবার স্বপ্ন নেই। জন্ম থেকেই ও স্বাধীন। জনি জানে সুখ এক পাখি। সে পাখি রঙিন পালক সূর্যে ঝলকে উড়ে বেড়ায়। জনি বারবার সেই পাখি ধরে এনে দেয় ক্যাংলা উদোমপারা মানুষদের হাতে। জনি কি করে নৌটঙ্কীর ফুলকলিয়ার ভরন্ত-পুরন্ত শরীর, প্রেমার্ত রক্তাক্ত হৃদয়ের দায়িত্ব নেবে ?

জনি পালিয়ে গিয়েছিল। ফুলকলিয়াঁর মাসির অভিশাপ বোধহয় ওকে তাড়া করছিল। নইলে কেন ও যাবে বোম্বাই? কেন ভুলেশ্বরের চকে হামিদ ওকে বলবে, 'কিসের মাস্টার জনির ওয়ান ম্যান শো? আমার উর্বশীর খেল্ দেখেছিস ?'

'দেখালে দেখব।'

'দেখবার আগে পীরের মন্তরপড়া ফিরোজার তাবিজ পরে লিবি জনি। নইলে উর্বশী তোকে দিওয়ানা করে দিবে।'

'আরে ছোঃ, অমন অনেক উর্বশী দেখেছি।'

'এমন দেখিস নাই।'

'কি আছে তার ?'

'কি না !'

'হোঃ। অমন বাত সবাই করে।'

উর্বশী সেদিন পেশোয়াজ-কাঁচুলি-ওড়না পরেছিল। সিঁথির পাশে ঝাপটা, গলায় মালা, কানে ঝুমকো। হামিদের কোলে বসে উর্বশী গান গাইছিল। বাত করছিল। উর্বশীর গায়ের রং আপেলের মত, বুক যেন পুরন্ত নাশপাতি, চোখ পদ্মের পাপড়ির মত, ভুরু আকাশে উড়ন্ত চিল, ঠোঁট ফুটন্ত গোলাপ—

দেখে জনির মাথা ঘুরে গিয়েছিল। এমন উর্বশী, তবু ওর খেলায় ভিড় হয় কেন? উর্বশী ক্যাঁশ-কেঁশে গলায় গান গাইছিল, বাত করছিল। ভাঁড়ামি করছিল।

খেলা ভাঙতে হামিদ জনিকে বলেছিল, 'মোর সাথে আয়।'

'কেন ?'

'উর্বশী মিঠা গাইবে।'

'আমার কোলে বসবে ?'

'আমার কোলে, তোর কোলে।'

নতুন-নতুন খেলার নকশা জনিই বানিয়েছিল। অনাথাশ্রমে জনি সামান্ত লেখাপড়া শিখেছিল। তারপর সুখের পাখি ধরবার নেশায় দেশে-দেশে ঘুরতে-ঘুরতে কাজ চালানো হিন্দি, ইংরিজি, মারাঠি, গুজরাতি শিখেছিল। সিনেমার বই কিনত হরদম। বলত, 'আ বে হামিদ, ইনভেস না করলে বিজনেস হয় ?'

বলত, 'খেলার নকশা হবে কমেডি ফিনিস। হ্যাপি এন্‌ডিং। দেখ, বরসাত মেঁ পয়লা হিরো পয়লা হিরোইনে কমেডি। দুসরা পার্টিতে টাজিডি। টাজিডি ফিনিসে মানুষের মন ভারি হয়ে যায়। কমেডি ফিনিসে মানুষ হাতের মধ্যে সুখ কি চিড়িয়াঁ পেয়ে যায়। কমেডি ফিনিসে মজা।'

এখনো আধো ঘুমে, উর্বশীর পাশে শুয়ে জনি হামিদকে দেখতে পায়। হামিদ কাঁদছে হা-হা করে। বলছে, 'মদের নিশায় তুর কাছে উকে বিকে দিলাম জনি। উকে লিস না। ওর মুখ না দেখলে আমি মরে যাব। তাঁবু বেচে তোকে টাকা দিব। উকে তু লিস না'

'ভাগ শালা, টাকা কে চায় ?'

'তোর বুকে চাকু ভুখে দিব জনি। ও জাদুগরী, জীন্। আমি ওকে লাহোরীর কাছ হতে আনি। আমার কাছ হতে তু উকে নিলি ? আমার জান খেয়ে জাদুগরী তোকেও সাজা দিবে রে।'

জনি কি তা জানত ? আহা হা। কি-রূপ, কি-রূপ। তেরি গোরে বদন মে গোরী কালে কালে আখিয়াঁ।

সেদিনই বোম্বাই ছেড়ে পালায় জনি উর্বশীকে নিয়ে।

কানপুর, ঝাঁসি, আগ্রা, দিল্লি, পেশোয়ার, লাহোর, করাচি, ভূপাল, কত-কত জায়গা। সব জায়গায় ক্যাঙাল উদোমপারা লোকরা চকে-বাজারে-ফুটপাথে-পথে সুখ কি চিড়িয়াঁ হাতে ধরতে চায়। ফুটো পয়সার কারবারী সব। পকেটে পয়সা থাকলে মাল খায়, গাঁজা খায় জনির খেলা দেখে। পয়সা না থাকলে দুনিয়ার নামে কোনো মামলা দায়ের না করে মরে যায় পথে।

কিন্তু দিন কারো সমান যায় না। সেদিনে, যৌবনের দিনে, জনি রামায়াকে ডেকে এনেছিল। রামায়া বাজনা বাজাত এক হাতে। নুলো হাতে যন্তর চেপে। টাঙ্গায় বসে জনি আর উর্বশী শহর ঘুরত। জনি গোলাপী কাগজ বাতাসে উড়িয়ে বাতাসকে সুখের পাখির গোলাপী পালকে রঙিন করে দিত। তদ্দিনে সারা লোক জেনে গিয়েছিল জনি উর্বশীর মহব্বতে দিওয়ানা। উর্বশী গুলিস্তাঁ, জনি উসকে বুলবুল। সুখ-পাগল ক্যাঙাল ছেলেরা গাড়ির পেছনে দৌড়ে-দৌড়ে কাগজ ধরত।

রাসপূর্ণিমার প্রেমময়ী জ্যোৎস্নায় নির্জন পথে ছুটতে-ছুটতে জনি বুড়ো হয়ে যেতে লাগল। ওর চারপাশ থেকে সুদিন ঝরে খসে পড়তে লাগল। শীতের হাওয়ায় ঝরা পাতা আমলকী ডাল যেন। সকল পাতা খসে পড়ে এক সময়ে যেমন নিষ্পত্র ন্যাড়া ডাল শুধু থাকে, তেমনি করে সুদিন খসে ঝরে পড়ে জনিকে ন্যাড়া করে রেখে গেছে।

একদিনে সুদিন যায়নি। ক্রমে জনির খেলা আর তেমন লোক টানত না। তখন বড়ো-বড়ো জাঁক জাকালো শহর ছেড়ে বর্ধমান, কেষ্টনগর, সিউড়ি, বোলপুর, বহরমপুর, রামপুরহাট। ছেঁড়া তাঁবু, ঢবঢবে বাজনা। জনির ঢোলা প্যান্ট, রঙিন গেঞ্জি, ঢবঢবে জুতো, পালক বসানো কাগজের টুপি হলে চলে।

কিন্তু এ খেলা ভালবাসার খেলা। জনি না হয় উর্বশীকে তিরিশ বছর ভালবেসে-বেসে দিওয়ানা, মজনু। লায়লীর তো চাই ঝুটো মোতির হার, বেলোয়ারী চুড়ি, শাটিনের ঘাগরা। তারপর কলকাতা। তাঁবুতে ঢুকে পড় উনিশ পয়সায় খেল্ দেখ। চড়কের মেলা, রাসের মেলা, তারকেশ্বরের মেলা, গাঁজা পার্ক, ধাপার মাঠে খেল্।

মোতি এখন এক চোখ মা শীতলাকে দিয়ে কানী মোতি। মোতির অবস্থা পড়েছে। রেশমী-চাঁদনী-বেদানাদাসীরা একে একে ক্যাওড়াতলা সই হয়েছে।

কানী মোতিই ওদের বেকবাগানের পেছনে বস্তিতে এনে তুলল।

জনি দুঃখ করে বলল, 'তোরও এই হাল?'

—'হবেনি?'

—'এমন হল?'

—'হল।'

কানী মোতির চেষ্টায় রামায়া হাসপাতালের সামনে ফুটপাথে চায়ের দোকান দিল। প্যাকিং বাক্সের দোকান, প্যাকিং বাক্সের তক্তার নিচে ইট পেতে বেঞ্চি। গরমাগরম চা আর লেড়ো বিস্কুট। ভাঁড়ে খাও, ফেলে দাও।

কানী মোতি জনি আর উর্বশীকে ঘর দিল। পিসবোর্ডের টুকরো আর পচা পাকিং ব্যাক্সের তক্তায় পার্টিশান করা তিনখানা ঘর। কানী মোতি বলল, 'দশ টাকা ভাড়া দিস জনি।'

বস্তি বাড়ি। গলা পচা ঘর। একটা খাটা পায়খানা বাইশটা পরিবার ব্যবহার করে। মোতির মত আরো বহু ঘর, বহু ঘরওলী আছে বস্তিতে। ছোটো ছেলে মেয়ে, বুড়ো-হাবড়ারা দোরগোড়ায় বসে। ময়লার গন্ধে বাতাস ভারি।

জনির বুক ভারি হয়ে এল। এই ঘরে উর্বশী থাকবে? উর্বশী নির্বিকার। জনির বুক আরো ভারি করে দিল কানী মোতি। খেল দেখাবার পর কাশতে কাশতে জনি মরে যায়।

কানী মোতি মিছরির ক্বাথ এনে দেয়। হেকিমী দাওয়াই, সত্যপীরের মাদুলি।

'কেন এত করিস মোতি?'

কানী মোতি বলল, 'ওই উর্বশী তোকে খেল জনি। ওকে ছেড়ে দে তুই।'

—'কিঁউ, ক্যা মতলব?'

—'মোর সাথে থাক্।'

—'দূর হ ডাইনি।'

কানী মোতি কেঁদে উঠে গেল। কিন্তু আজ সাত বছর ধরে জনির কাছে ভাড়া চায় না, দিলে পরে নেয়। চা-বিস্কুট-পাউরুটি-মিছরি ও বচের ক্বাথ নিয়ে আসে। জনি ওকে ডাইনি বলে। মোতি বলে, একদিন ওই ডাইনিকে আমি পুড়াব'

কানী মোতি যখন রেগে কথা বলে, জনির ভয় করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে কানী মোতির বুক কান্নায় ভেঙে গান উঠে আসে। কানী মোতি সেই সব রাতে পা ছড়িয়ে বসে হাজায় ওষুধ দেয় আর গান গায়। জনির যেমন

সব গান পুরনো, কানী মোতির সব গানও তেমনি প্রাচীন, আদিম। সকল পতিত পতিতার বুকচেরা কান্না। কানী মোতি বিস্বরে গায়,

"চাঁদের আলোর সমান
রূপসী ছিলাম
তোমাদেরি সমান রঙে গো!
বাড়িতে পরিতাম
বেনারসী শাড়ি
দোরেতে দাঁড়াত
কত জুড়ি গাড়ি
বাবুরা আসিয়ে
কত ভালবাসিয়ে
চাঁদমনি বলে
ডাকিত গো!"

এমন গান শুনলে জনির বুক ভাঙে। কলকাতায় আজীবন থাকল কানী। সুখের দরকার বুঝল না?

ঘরে পৌঁছে গেল জনি।

বাতাসে দুর্গন্ধ। চাঁদের আলো, সূর্যের রোদ এ বস্তিতে ঢুকতে মানা। জনি লম্ফো জ্বালাল। উর্বশী ওর দিকে চেয়ে বসে আছে বিছানায়, বালিশে ঠেস দিয়ে। একা জনি বুঝল উর্বশীর চোখ অভিমানে ভারি।

'আ গিয়া মেরি জান!'

জনি উর্বশীকে চকাস করে চুমু খেল। উর্বশী সাড়া দিল না। একেবারে চুপচাপ।

জনি বুঝল, উর্বশীর চোখে কি প্রশ্ন।

'লেংড়ি কিছু জানে না রে। বলে তোর তরে কেউ বানমারা করেছে। লেঃ,…গুলি মার্ ফজুল বাতে। কাল খেল্ আছে। আজ তোকে লিয়ে প্যার করব।'

লেংড়ি যে বোতলটা ফেরত দিয়েছিল, সেটার ছিপি খুলে জনি উর্বশীর দিকে তুলে বলল, 'চিআর্স'! আজ রাতে শুধু প্যার করব। কা চাঁদনী রাতী। মোকে দিওয়ানা করে দিল।'

ক্যাওড়া ধূপ জেলে দিল এক্ গোছা। লাল প্যান্ট আর সবুজ কোট

পরল। বোতল গলায় ঢেলেছে। মাথার ভেতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরপাক খাচ্ছে। মাথায় টুপি পরতে-পরতে চোখ টিপে জনি বলল, 'কি জানে লেংড়ি? কি জানে ডাক্তার? আমার কোট-পেণ্টুল পুরনো, টুটাফুটা? তোকে কদ্দিন নতুন ঘাগরা কিনে দিই নি। কোন্ জানে নতুন জামা কিনি বল্?'

উর্বশীর বুকে হাত বুলিয়ে জনি বলল, 'কাল থেকে দেখবি সব বদলে যাবে। এমন খেল্ দেখাবি, এমন গানা গাইবি না, লোকে বলবে ফিন্ খেল্ দেখা!

উর্বশী কথা বলল না।

'আজ রিয়াস্সাল করি। কাল আবার শহরটা জিনে লিব উর্বশী, তু মোরে ছেড়ে যাবি না বল্?'

উর্বশী নিরুত্তর।

'কাল সেই গানাটা হবে। শুরুতে আমি বলব, উর্বশী কা খেল্। উ মোর লয়লা, আমি ওর মজনু। আপোনারা ওর লক্ষ্মী। আপোনারা যা বলবেন, উ জবাব দিবে। যে গানা বাতাবেন, উ গাইবে। যে যা বলবে, স— করবে।'

উর্বশী নির্বিকার।

জনির চোখের সামনে সব ধোঁয়া ধোঁয়া। মাথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চক্কর খাচ্ছে। পুরনচাঁদজী, দলীপ, রামান্না, হামিদ, ফুলকলিয়া মোতি, লেংড়ি, ডাক্তার, সবাই হাসছে। আঙুল দেখিয়ে বলছে, 'তু হেরে গেলি জনি।'

'কভি নেই!' জনি গর্জে উঠল। রঙিন কোট-প্যাণ্ট, চকচকে জুতো, মাথায় টুপি, জনি বলল, 'মোরে হারায় কে? বাতাও? হাঁ, হাম জনি হায়। বেজন্মা, বেধন্মা! আমি তুদের সুখের চিড়িয়া ধরে এনে দিই নি?'

সবাই হাসছে, অবিশ্বাসের হাসি।

জনি বলল, 'আরে হাম কৌন? উর্বশী মেরা মালিক, আমি উস কী বান্দা। উর্বশী গানা গায়, আমরা আনেবালা! তুরা জানিস না? উ গায় ফল ইন্ লাভ এগিন! তুরা জানিস না? খেল্ খতম হলে তুরা ওরে শুধাস না? তুম ক্যায়সা হায় উর্বশী? আরে উ বাতাতী নেই। সুখ মেঁ হুঁ? আমি সুখে আছি, ভাল আছি গো! জনি মোরে রানী করে রেখেছে। তুরা বুলিস না, মোরা কেমন আছি উর্বশী? ও বুলে না, তুমরা সুখে আছ গো, ভাল আছ?'

ওরা চলে গেল। হঠাৎ জনি দেখল ঘরে শুধু ও আর উর্বশী। জনি

উর্শীকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'বল্ মোরে ছেড়ে যাবি না? বল্ উর্শী, তুকে না দেখতে পেলে আমি মরে যাব।'

উর্শী নির্বাক।

'লম্ফো নিবাব? আঁধারে তো তু মোর সাথে বাত করিস? সব শুনতে পাই আমি। লম্ফো নিবাব?' উর্শী কথা বলল না।

জনি কাঁদতে লাগল। গলা পচা ঘর, লম্ফোর আর ধূপের ধোঁয়া। উর্শী একা ভুবনমোহিনী হাসি হাসছে।

জনি কাঁদতে লাগল।

উর্শীর খেল্! জনি আর উর্শীর খেল্! এ সিজ্নে লাস্ট শো! উনিশ পয়সা টিকিট। কেন, আর ঢুকে যাও।

পর্দা সরে গেল জনি ঢুকল, চেয়ারে বসল, কোলে উর্বশী।

আজ জনি মুখে রং মেখেছে। সকালে টুপিতে নতুন পালক গুঁজেছে।

উর্বশীর পরনে আজ রোলেক্সের বেনারসী, মাথায় ঝুটো মোতির মুকুট গায়ে রোলেক্স জরির গয়না।

জনি বলল, 'আজ উর্বশী এমন খেল্ দেখাবে, যেমন আপোনারা দেখেন নি। উর্বশী, পাবলিককে হ্যালো বল্।'

'হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো পাবলিক! আমি উর্শী! আই অ্যাম উর্শী। ম্যয় হুঁ উর্শী।'

'গানা গাই, নাচ করি, বাতচিত করি।'

পাবলিক বলল, 'তুমি কি-কি করতে পার।'

'গলাটা ভাঙা-ভাঙা কেন গো।'

'তুমি যে লাগর সেজে আইসকিম খাওয়ালে।'

হাসির হর্‌রা উঠল।

'উর্শী, একটা গান গাইবে।'

'কেয়া গানা? কি গান? হুইচ সং?'

'এক হিন্দি, এক বাংলা, এক ইংলিশ।'

উর্শী হাসল, মাথা নিচু করল। ঘাড় হেলিয়ে জনিকে কি-যেন বলল। জনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

উর্শী বলল, 'এক লাগর আইসকিম খাওয়াল, এক লাগর ঠাণ্ডাই শরবৎ, গলাটা তেমন যুতে নেই। নরম-নরম গাইব?'

'না না, গরম-গরম গাও।'

উর্বশী গাইতে লাগল,

"চলতে চলতে আল্‌বিদা মত্‌
বোলে"।
"ঝিলিমিলি কাচের চুড়ি
সোহাগ রানী গো!"
"ডো রে মি!"

'বাহা রে বাহা! গলা ভেঙে বসে গেছে যে গো আজ!'

'নাগরদের উৎপাতে।'

'তবে বাত কর।'

'তোমরা শুধাও।'

'আরে উর্বশী! হাজার টাকা পেলে কি করবে গো?'

'আমি আর জনি ফুর্তি করব।'

'লাখ টাকা পেলে?'

'তোমাদের লিয়ে আমি আর জনি ফুর্তি করব।'

'দশ লাখ টাকা পেলে?'

উর্বশী ফিশফিশ করে বলল, সুখের চিড়িয়া ধরে এনে তোমাদের হাতে ধরিয়ে দিব।'

'কি হল? চুপ করলে কেন?'

'তোমরা বল না।'

'গলা এত নিচু কেন? লাজ লাগছে?'

'লাজ লাগছে।'

'জনি কানছে কেন।'

'ও বোকাটা, বুড়ো ভামটা।'

'উর্বশী, তুমি কেমন আছ? আমরা কেমন আছি? তুম ক্যায়সা হ্যায়? হম্‌লোক ক্যায়সা হ্যায়? জোরে বাতাও, য্যায়সা বাতাতে হো? পয়সা দিয়ে ঢুকিছি, তোমার কথা শুনতে পেছি না জান?'

উর্বশী চুপ করে রইল। জনির চোখে আতঙ্ক। উর্বশী কথা বলে না কেন?

'ক্যা হুয়া উর্বশী?'

উর্বশী নিরুত্তর।

'কা হুয়া? খেল্ খতম তো করো!'

উর্বশী তার অভ্যস্ত, কোমল মধুর গলা ভুলে গেল। সহসা উর্বশী চেঁচিয়ে উঠল। বড় বিস্বর, ফ্যাঁশফেঁশে, কান্নাভরা আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল উর্বশী।

'আমি ভাল নেই গো? মোর গলা বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমি হাসব না গো, গান গাইব না। বাতচিত করব না গো পাবলিক। সুখের চিড়িয়া যে ধরে এনে তুমাদের দিত, যে ধরে আনত সুখ কি চিড়িয়া, সে উর্বশী আর সুখে নাই গো! কেন জান? মোর গলা বন্ধ হয়ে গেল, গলায় আওয়াজ বেরাবে না আর! সব বন্ধ হয়ে গেল গো পাবলিক? আমি ভাল নাই গো, সুখে নাই, তোমরা কি করে ভাল থাকবে বাতাও? তুমাদের সকল সুখ কেড়ে লিলে মোর গলা?'

পাবলিক হতবাক।

রুদ্ধপ্রায়, বিস্বর গলায় উর্বশী বলল, 'মোর গলা যে চলে গেল, আমি আর ভাল নাই! ভাল নাই! ভাল নাই!'

'ভাল নাই গো!' বলে উর্বশী বুক ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ কান্নাটা, চীৎকারটা থেমে গেল। পর্দা পড়ে গেল। সন্ত্রস্ত, আতংকিত পাবলিকের ঠেলাঠেলি, চীৎকার। ভীষণ, ভীষণ, ভীষণ চীৎকার করল সকলে, 'কি হল? কি হল?'

ভেতরে কি ভাঙছে, চুরছে, দমাস দমাস শব্দ। বিভ্রান্ত, কৌতূহলী, আতংকিত জনতা স্টেজে উঠে পড়ল, পর্দা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর সব কোলাহল থেমে গেল।

নৈঃশব্দ্য, নৈঃশব্দ্য, নৈঃশব্দ্য।

পাবলিক সভয়ে দেখল ভেনট্রিলো কুইস্ট জনি, ওর কথা কওয়া পুতুল উর্বশীকে দলে-মুচড়ে ভাঙছে আর হা-হা-হা করে কাঁদছে।

জনির মুখ ও বুক চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে, ঠোঁট নড়ছে। ঠোঁট বলছে, 'আমি ভাল নাই গো। কেন না আমার গলা বন্ধ হয়ে গেছে।'

কিন্তু গলা দিয়ে একটুও আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

## বাঁয়েন

ভগীরথ যখন খুব ছোট তখনি ওর মা চণ্ডীকে বাঁয়েনে ধরেছিল। বাঁয়েনে ধরবার পরে চণ্ডীকে সবাই গাঁ-ছাড়া করে দিল। বাঁয়েনকে মারতে নেই, বাঁয়েন-মরলে গাঁয়ের ছেলে-পিলে বাঁচে না। ডাইনে ধরলে পুড়িয়ে মারে, বাঁয়েনে ধরলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

তাই চণ্ডীকে সবাই গাঁ-ছাড়া করে রেলের ধারে চালা তুলে দিল।

ভগীরথ বড় হয়েছে অন্য মা-র কাছে, অন্য মা-র আদরে-অনাদরে। নিজের মা কাকে বলে ভগীরথ জানে না। শুধু মাঠের ওপারে ছাতিম গাছের নিচে একটা চালা ঘর দেখেছে, শুনেছে ওখানে চণ্ডী বাঁয়েন একলা থাকে।

কখনো মনেও হয়নি চণ্ডী বাঁয়েন কারো মা হতে পারে। দূর থেকে দেখেছে ঘরের মাথায় লাল নেকড়ার ধ্বজা, মাঝে মাঝে দেখেছে উদ্‌ভ্রান্তের মত ধান-ক্ষেতের আল ধরে চৈত্রের চষা দুপুরে লালকাপড় পরে কে যেন কাঠি দিয়ে টিন বাজাতে বাজাতে মজা পুকুরের দিকে যাচ্ছে, পেছনে একটা কুকুর।

বাঁয়েন যখন যায় তখন টিন বাজিয়ে সাড়া দিতে দিতে যায়। বাঁয়েন যদি কোন ছোট ছেলে বা যুবা পুরুষকে দেখে তখনি চোখের দৃষ্টিতে তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে।

তাই বাঁয়েনকে একলা থাকতে হয়। বাঁয়েন যাচ্ছে জানলে যুবা বুড়ো সব পথ ছেড়ে সরে যায়।

একদিন, শুধু একদিন ভগীরথ তার বাবা মলিন্দরকে বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল।

'চক্ষু নামা ভগীরথ, ওর বাবা ধমকে বলেছিল।'

বাঁয়েন পা টিপে টিপে পুকুর-পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ভগীরথ এক পলক দেখেছিল পুকুরের জলে লাল কাপড়, তামাটে মুখ, জটাবাঁধা চুল।

দেখেছিল দুই চোখে কি ক্ষুধিত দৃষ্টি, যেন ভগীরথকে চোখ দিয়ে মেরে ফেলবে।

না, ভগীরথের মুখের দিকে চায়নি বাঁয়েন। ভগীরথ যেমন করে কালো

জলে ডাঁয়েনের লাল ছায়া দেখেছিল, ডাঁয়েনও ঠিক তেমনি করেই ভগীরথের ছায়াটাকে দেখছিল। ভগীরথ শিউরে উঠে চোখ বুজেছিল, বাবার কাপড় চেপে ধরেছিল।

'কেন এসেছিস ?' ভগীরথের বাবা হিসহিসিয়ে উঠেছিল।

'মোর মাথায় তেল নাই গঙ্গাপুত্ত, ঘরে কেরাসিন নাই। একলা মোকে ভয় লাগে গো!'

ডাঁয়েন কাঁদছিল, চণ্ডী ডাঁয়েন। জলের ওপর ওর ছায়া-চোখে জল পড়ছিল।

'কেন, এ শনিবার বারের ডালা দেয় নাই ?'

শনিবার শনিবার ডোমপাড়ার একজন বারের ডালা নিয়ে যায়, চাল, ডাল, লবণ, তেল নিয়ে গিয়ে ছাতিম গাছের কাছে রেখে ছাতিম গাছকে সাক্ষী রেখে 'ডাঁয়েনের বারের ডালা দিলাম গো' বলে ছুটে চলে আসে।

'কুকুর খেয়ে দিলে।'

'টাকা লিবি ? টাকা লে।'

'আমায় কে জিনিস বিচবে ?'

'দেব, আমি কিনে দেব, তুই এখন যা।'

'আমি একলা থাকতে পারি না।'

'তবে ডাঁয়েন হলি কেন ? যা বলছি।'

ভগীরথের বাবা পুকুর-পাড় থেকে একদলা কাদা তুলেছিল।

'গঙ্গাপুত্ত, এ খোকাটা কি...'

একটা বিশ্রী গালি দিয়ে ভগীরথের বাবা কাদার দলাটা ছুঁড়ে মেরেছিল। তখন পালিয়ে গিয়েছিল চণ্ডী ডাঁয়েন।

'বাবা, তুমি ডাঁয়েনের সঙ্গে কথা বললে ?'

ভীষণ ভয় পেয়েছিল ভগীরথ। ডাঁয়েনের সঙ্গে কথা বললে তার মৃত্যু অবধারিত। ভগীরথের মনে হয়েছিল ওর বাবা মরে যাবে আর বাবা মরে যাওয়ার কথা ভাবলেই ভগীরথের মনে হত মাথায় বুঝি বাজ ভেঙে পড়ল, বাপ মরলে সৎ-মা যে তাকে তাড়িয়ে দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

'এখন ডাঁয়েন বটে, কিন্তু উ তোর মা।'

বাবা আশ্চর্য গম্ভীর গলায় কথাটা বলেছিল। গলার কাছটায় ডেলা আটকিয়ে গিয়েছিল ভগীরথের। মা! ডাঁয়েন কারো মা হয়! ডাঁয়েন কি মানুষ ? ডাঁয়েন তো মাটি খুঁজে মরা ছেলে বের করে, আদর করে, দুধ

খাওয়ায়, বাঁয়েনের দৃষ্টিতে একটা গোটা গাছ অব্দি চড়চড়িয়ে শুকিয়ে যেতে পারে। ভগীরথ তো একটা জল-জীয়ন্ত ছেলে। সে কেমন করে বাঁয়েনের পেটে জন্মাল? ভগীরথ ভেবে পায়নি।

'আগে মানুষ ছিল, তোর মা ছিল।'

'তোমার বউ?'

'আমার বউ।'

মলিন্দর কি ভেবে যেন নিঃশ্বাস ফেলেছিল। বলেছিল—'তোরে সব বলে যাব ভগীরথ, তোর কোন ভয় নাই।'

ভগীরথ অবাক হয়ে ওর বাবার দিকে চেয়ে চেয়ে আল দিয়ে হাঁটছিল। মলিন্দর গঙ্গাপুত্রের গলায় এমন স্বরও কখনো শোনেনি। শুধু ডোম নয় ওরা, শ্মশানের ডোম। শ্মশানে এখন মিউনিসিপ্যালিটি শুধু একজন ডোম থাকতে দেয়। ভগীরথরা বাঁশবেতের কাজ করে, সরকারী মুরগী খোঁয়াড়ে কাজ করে, ময়লা ফেলে সারমাটি করে। একা মলিন্দর ছাড়া এ অঞ্চলে কোন ডোম নাম সই করতে জানে না। সেইজন্য মলিন্দর কিছুদিন আগে মহকুমার লাশঘরে কাজ পেয়েছে।

সরকারী কাজ। মলিন্দর গঙ্গাপুত্র লিখে বেয়াল্লিশ টাকা মাইনে নেবার কাজ। ভগীরথ জানে বাবা মাঝে মাঝে বেওয়ারিশ মড়া চুন আর ব্লিচিং পাউডারে পচিয়ে হাড় বের করে। হাড়, যদি গোটা মানুষের হাড়, নয়তো খুলি, নিদেনপক্ষে পাঁজরা-খাঁচাটা পাওয়া যায়, তাহলে অনেক লাভ।

সরকারবাবু কলকাতার হবু ডাক্তারদের কাছে খুলি-হাড়-কঙ্কাল মোটা লাভে বেঁচে দেয়। বাবাকে দশ-পনের যা দেয় তাতেই বাবা খুশি। এই উপরি টাকা সুদে খাটিয়ে খাটিয়ে বাবা কয়েকটা শুয়োর কিনেছে।

মলিন্দর গায়ে পিরান পরে, পায়ে জুতা পরে মহকুমা যায়, পাড়ায়ও সম্মানী মানুষ।

সেই মলিন্দর চোখ লাল করে অনেকক্ষণ চণ্ডী বাঁয়েনের ঘরের ওপরে গেরুয়া আকাশের কপালে এতটুকু একটা সিঁদুর-ফোঁটার মত লাল নেকড়ার নিশানটুকুর দিকে চেয়েছিল। বিড়বিড় করে বলেছিল—'আঁধারুরে ডর খায়, অন্ধকারে থাকতে নারত তারেই বিধাতা বাঁয়েন করে ছাড়ল? এখন মলে বাঁয়েন শান্তি পায়, কিন্তু বাঁয়েন নিজে না মরে তো কেউ ওর জান নিতে নারবে, জানু বাপু?'

খুব দুঃখু না পেলে মলিন্দর এত কথা বলে না।

'কে মানুষকে বাঁয়েন করে বাবা?'

'বিধাতা।'

মলিন্দর ভাল করে চেয়ে দেখেছিল ভগীরথের আশ-পাশ দিয়ে দুপুরের রোদে কোন ছায়া চলেছে কিনা? বাঁয়েনরা ঠিক হাট-বাজারের ফুল, গোলাপ, মাখন-বালার মত, নানা ছলাকলা জানে। ধর কোনো ছোট ছেলেকে বাঁয়েন নিতে চায়, সে যখন হেঁটে যাবে চারদিক রোদে পুড়লেও তার মুখে ঠিক ছায়া থাকবে। অদৃশ্য হয়ে বাঁয়েন আঁচলের ছায়া ধরে ছেলেকে আড়াল করে নিয়ে যাবে। ছেলেটা মরে গেলে কেউ যদি দোষ দেয় তাহলে বাঁয়েন মুচকি হেসে বলবে—'তা কি জানব বল? খর রোদ দেখে এট্টু ছেঁয়া দিতে গেলাম তা তোমার ঠোকাটা যেনু ননীর পুতুল।' এট্টু তাতে মরে গেল?'

ভগীরথের আশপাশে কোন ময়লা, গন্ধওঠা লালচে আঁচলের ছায়া দেখতে না পেয়ে মলিন্দর যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বলেছিল—'তোর কি ভয় বাপ? তোর কুনো অনিষ্ট উ করবে না।

তবু ভগীরথ ভরসা পায়নি।

শুধু ঐদিকে মন চলে গিয়েছিল ওর। ধানক্ষেতে যাক, গরু নিয়ে যাক, কেবল মনে হত, রেললাইন ধরে ছুটে চলে যায় ওখানে। গিয়ে দেখে আসে একলা থেকে থেকে বাঁয়েন কি রকম ভয় পায়। দেখে আসে বাঁয়েন মাথায় তেল মেখে চুলের জল কেমন করে চৈত্রী বাতাসে শুকোয়।

যেতে পারত না ভগীরথ, ভয় পেত।

মনে হত যদি আর না ফিরতে পারে কোনদিন? যদি ওখানেই ভগীরথকে একটা গাছ করে, একটা পাথর করে রেখে দেয় বাঁয়েন?

কয়েকদিন ভগীরথ শুধু চেয়ে দেখত।

দেখত ছাতিমগাছ আর চালাঘরের মাঝামাঝি আকাশটা যেন কার কপালের মতন। সেই কপালে এক ফোঁটা সিঁদুর-টিপের মত লাল নেকড়ার নিশানটা কখনো স্থির হয়ে থাকে, কখনো দোলে। মনে হত ছুটে চলে যায় একবার, আর পাছে ছুটে যায় সেই ভয়ে উলটোদিকে ছুটে ভগীরথ বাড়ি চলে আসত।

আশ্চর্য, বাঁয়েনের ছেলে বলে ওকে কেউ হেনস্তা করত না, বরঞ্চ বেশি খাতির করত। বাঁয়েনের ছেলেকে খাতির করলে বাঁয়েন সে কথা জানতে পারে। সে ভাল খাতির দেখায়।

তার কচিকাঁচা ভাল থাকে। যে দূর ছাই করে তার ঘরে শুধু মরতেই থাকে ছেলেপুলে।

ভগীরথের এখনকার মা-ও কিছু বলেনি। সতীনের ছেলের ওপর ওর অনুরাগ আছে, না বিরাগ, দ্বেষ না ভালবাসা, তার কোনটাই ও কোনদিন প্রকাশ করেনি। তার প্রধান কারণ ওর নিজের ছেলে নেই। গৈরবী আর সৈরভী দু'টো মাত্র মেয়ে। পুত্রসন্তান না থাকলে স্বামীর ওপর জোর থাকে না। তাছাড়া এখনকার মা-র ওপরের ঠোঁট ফাঁক, মাড়ি বের করা। বাড়ি থেকে বেরোতে চায় না বেশি। বলে—'কুন মুখ দেখাতে যাব সি বল দেখি? মুখ মোটে বুজে না যি।' না হাসলেও মনে হয় মাগী হাসতেছে।—দেখ গঙ্গাপুত্ত, মলে পরে মুখখানা গামছা দিয়ে ঢেকে দিও—জানলু? লইনে মানুষ বলবে দাঁতী ডোমনী চলল।

যশি শুধু কাজ করে, ঘর নিকোয়, ভাত রাঁধে, কাঠ কুড়োয়, গোবর চাপড়া দেয়, শুয়োর তাড়ায়, মেয়েদের মাথার উকুন বাছে, ভগীরথকে 'বাপ' বলে কথা বলে, খেতে এস বাপ, লাইতে যাও বাপ, যেন ওদের মধ্যে কুটুমের সম্পর্ক, বাঁয়েনের ছেলেকে যত্ন-আত্তি না করলে বাঁয়েন তার মেয়ে দুটোকে বাণ মেরে দিতে পারে। যশি জানে। আরো জানে, একদিন ভগীরথের ভাতের ওপরই তাকে নির্ভর করতে হবে।

মাঝে মাঝে মাড়ি বের করেও সভয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, কে জানে ভর দুপুরে বাঁয়েন ওর মেয়ে দুটোর কথা মনে করে মাটি দিয়ে পুতুল গড়ছে কিনা, বান ফুঁড়ছে কিনা। তখন যশিকে যত কুচ্ছিত তার চেয়েও কুচ্ছিত দেখায়। অনেক দুঃখে মলিন্দর ডোমপাড়ার সবচেয়ে কুৎসিত মেয়েটিকে সাঙা করেছে। কয়েকটা গাঁয়ের ডোমপাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি বাঁয়েন হয়ে যাবার পর মলিন্দর আর রূপসী মেয়ে দেখতে পারে না।

মলিন্দর বউকে নাকি খুব ভালবাসত।

হয়তো সেই ভালবাসার কথা মনে করেই একদিন মলিন্দর ভগীরথকে চণ্ডী বাঁয়েনের কথা বলল। দুজনে রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। মলিন্দরের হাতে মাংসের পোঁটলা, এই এক আশ্চর্য দুর্বলতা মলিন্দরের, নিজের হাতে পালা শুয়োরগুলোকে ও কাটতে পারে না। শুয়োর পোষে, বড় করে, তারপর কাটবার দরকার হলে গোটা শুয়োরটা কাউকে বেচে দেয়। যে কেনে সে মলিন্দরকে একটু মাংস দেয়।

'এট্টু গাছের ছেঁয়ায় বসি ?'

যেন তের বছরের ছেলের অনুমতি নিল মলিন্দর, বটগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। ভগীরথ জিজ্ঞেস করল—'এখান হতে ডাকাতরা যায়, না কি বাপ ?'

ভগীরথ এখন বুনিয়াদী ইস্কুলে যায়। এই সরকারী স্কুলের দেয়ালে ওদের মাস্টারমশাই এক সময়ে দেয়াল-পত্রিকা লিখিয়েছিলেন ছেলেদের দিয়ে। নিজে হরফগুলি লিখে এনেছিলেন। ভগীরথ সেগুলি কালি দিয়ে ভরেছিল। সেই লেখাটি পড়ে ভগীরথ জানতে পেরেছিল উনিশ শো পঞ্চান্নর অচ্ছুৎ আইনের পর থেকে ওরা কেউ আর অচ্ছুৎ নয়।

জেনেছিল ভারতীয় সংবিধান বলে একটা জিনিস আছে, তার প্রথমেই একটা মৌলিক অধিকারের কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে, তারা নাকি সবাই সমান।

দেয়াল-পত্রিকাটা এখনো টাঙানো আছে। কিন্তু ভগীরথরা জানে সহপাঠিরা বা মাস্টাররা ওদের একটু দূরে বসাই পছন্দ করেন। এই ইস্কুলে অন্য জাতের ছেলেরা নেহাত গরিব বা অপারগ না হলে আসে না। আসবে কেন ? এখন চারদিকে ইস্কুল।

যা হোক, ভগীরথ এখন একটু অন্য রকম ভাষায় কথা বলে। মলিন্দর ওর কথা শুনতে ভালবাসে ও ভগীরথের পাশে প্রায়ই ওর নিজেকে এক অযোগ্য বাপ বলে মনে হয়।

ভগীরথ ডাকাতদের কথা জিজ্ঞেস করল। এখন এই সোনাডাঙা, পলাশী, ধুবুলিয়া জায়গায় জায়গায় সন্ধ্যার ট্রেনে ডাকাতি খুব বেড়ে গিয়েছে। ডাকাতি সবাই করে বলতে গেলে। ভদ্রলোক গরীব ছাত্র কলোনির বাসিন্দে পাকা বাড়ির মালিক—নানা রকম পরিচয় তারা বাইরে দেয়, কামরায় ওঠে। তারপর ঠিক সময়ে চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দেয় অন্ধকার মাঠে। অন্ধকার থেকে সেথোরা আসে। তারপর সবাই মিলে যা পারে নিয়ে থুয়ে মেরে ধরে চম্পট দেয়। বিশেষ করে এই বটগাছটা সন্ধের পর বড় ভয়ের হয়ে উঠেছে।

তাই ভগীরথ ডাকাতের কথা জিগ্যেস করল। মলিন্দর কিন্তু সে কথা বিশেষ গায়ে মাখল-না। শূন্য মাঠের দিকে চেয়ে আকাশে ও মাঠে কি যেন খুঁজল, তারপর বলল—আমি আগে নিমায়া-নিদায় ছিলু জানলু বাপ। তোর মা ছিল তুষু তুষু ক্যানেকে কানত। বিধেতার বিচার।

যেন ভগবানই একদিন ডোমপাড়ায় এসে পাশা উল্টে দিলেন। চণ্ডী হয়ে গেল বাঁয়েন নিষ্ঠুর নির্দয় শিশুহন্তা। আর মলিন্দর হয়ে গেল তুষ্প্রাণ। হতেই হবে।

একজন যদি অমানুষ হয়, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অলৌকিক জগতের অদৃশ্য দরজা খুলে ঢুকে যায়, তাহলে আরেকজনকে মানুষের মত মানুষ হতেই হবে।

ভগীরথ এই সময়ে বুঝতে পারল, ওর বাবা ওকে কিছু বলতে চায়! ভগীরথ একটু আশ্চর্য হল। সেই একদিন বাবা বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বলেছিল, আর বলেনি। আজ আবার বাঁয়েনের কথা কেন?

মলিন্দর ভগীরথের হাত চেপে ধরল। বলল—'ভয় কি? সবাই জানে আর তুই তোর মায়ের বিত্তান্ত জানবি না?'

ওরা গঙ্গাপুত্র। ওরা ডোম, মলিন্দর বাঁশ বইত, কাটত আর চণ্ডীর ছিল কাঁচা ভাগাড়ের কাজ।

ওর বংশগত উত্তরাধিকার। এই গ্রামের উত্তরে বিলের ধারে বটগাছতলে কাঁচা ভাগাড়। পাঁচ বছরের নিচে শিশু মরলে এখন পোড়াতে হয়, তখন সবাই পুঁতে দিত। ঐ ভাগাড়ে চণ্ডীর বাবা খন্তা দিয়ে গর্ত খুঁড়ত, কাঁটা গাছ দিয়ে গর্ত ঢেকে রাখত, শেয়াল তাড়াত। হই হই হইয়া···ওর প্রমত্ত কণ্ঠের ভয়ঙ্কর ডাক রাতে বিরেতে হরদম শোনা যেত।

শুধু মদ আর গাঁজা খেত চণ্ডীর বাবা। আর শনিবার একটা ডালা হাতে গাঁয়ে বেরুত। বলত—'আমি আপোনাদের সেবক গো, আমি গঙ্গাপুত্ত, আমার ডালাটা দিয়ে দেন গো।'

সবাই ওকে ভয় পেত। ওর চোখ থেকে ছোট ছেলেমেয়েকে সরিয়ে রাখত। একটাও কথা না বলে ওকে ভিক্ষে দিয়ে চলে যেত।

একদিন একটা ফর্সা মেয়ে, কটা চোখ, লালচে চুল, এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—'আমি চণ্ডী, অমুক গঙ্গাপুত্তের বিটি, বাপ মরে গেল। বাপের ডালা এখন মোকে দেন।'

'বাপের কাজ তুই করবি?'

'করব।'

'তোকে ভয় লাগে না।'

'মোর ভয়ডর নাই।'

এই ভয়ডরের কথাটা চণ্ডী বুঝতে পারত না। ছেলে মেয়ে মরলে মা বাপ কাঁদে সে শোকের অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু মরাকে কি কেউ বাড়িতে ধরে রাখে, না রাখতে পারে? তার সৎকার করাটা তো চণ্ডীর কাজ; অন্তত্র জীবিকা। এতে ভয়ের কি আছে, নিষ্ঠুরতাই বা কি? যদি থাকে সেও তো বিধাতার নিয়ম। সে নিয়ম তো গঙ্গাপুত্ররা তৈরি করেনি। তবে তাদের এত ঘেন্না করে কেন মানুষ, কেন ভয় পায়?

এই চণ্ডীকে মলিন্দর বিয়ে করেছিল। তখন মলিন্দর সরকারবাবুর সঙ্গে হাড় বেচার কাজ করত। গো-ভাগাড়ের হাড় থেকে সার হয়, সে হাড়ের দাম আছে। হাতে পয়সা ছিল মলিন্দরের, বুকে সাহস, রাতে মাঠ দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ও ফিরত—'কিসিকো নেই ডরতা, হাম আগুন খাতা। কিসিকো নেই ডরতা!'

সন্ধেবেলা লণ্ঠন হাতে একা চণ্ডীকে বটগাছতলায় ঘুরতে দেখে ও বলেছিল—'এই, তু আঁধারে ডরিস না?'

'না। হাম আগুন খাতা জানিস?' চণ্ডীর হাসি দেখে মলিন্দর খুব অবাক হয়েছিল। সেই বৈশাখেই ও চণ্ডীকে বিয়ে করে। আরেক বৈশাখে চণ্ডীর কোলে ভগীরথ এসেছিল।

চণ্ডী ভগীরথকে কোলে নিয়ে একদিন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিল, বলেছিল—'মোকে ওরা ঢেলা মেরেছিল গঙ্গাপুত্ত। বলল আমার নজর মন্দ।'

'কে ঢেলা মারল?'

'লাও! তাকে কি তুমি মারবা?'

'ঢেলা মারল কেন?'

মলিন্দর উঠোনে বেড়া পুঁততে পুঁততে প্রায় নাচতে শুরু করেছিল চটকা রাগে। 'আমার বউকে ঢেলা মারে কে? কার এত আস্পর্ধা?' গালাগালি দিতে শুরু করেছিল মলিন্দর।

চণ্ডী ওর দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে বসেছিল। তারপর বলেছিল—'মোর মন চায় না গঙ্গাপুত্ত, খন্তা ধরতে মন চায় না, কিন্তক বিধাতা ই কাজ মোকে দিয়ে করাবে, তা আমি কি করব বুল?'

চণ্ডী আশ্চর্য হয়ে ঘাড় নেড়েছিল, নিজের হাত পা দেখেছিল। ওর বংশে ভাই-কাকা-দাদা থাকলে বংশের কাজ করত, কিন্তু কেউ নেই। ওরা সেই আদিম যুগের শ্মশানে দাস, যখন হরিশ্চন্দ্র চাঁড়াল হয়েছিলেন তখন চণ্ডীদের

পূর্বপুরুষ ওকে কাজ শিখিয়েছিল। আবার যখন হরিশ্চন্দ্র রাজা হলেন তখন সসাগরা পৃথিবী ওঁর, দান করতে লাগলেন ভারে ভারে।

'মোদের কি বেবস্থা ?'

সেই আদিম গঙ্গাপুত্র রাজসভা কাটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল। ওদের কানের ভেতরে রাবণের চিতা শোঁ শোঁ করে, তাই ওরা প্রতিটি কথাই চেঁচিয়ে বলে, মৃদুকণ্ঠ শুনতে পায় না।

'কিসের বেবস্থা ?'

'বামুন গাই-বলদ পাবে, সন্নেসীর নিত্য ভিক্ষা, মোদের কি বেবস্থা ? মোদের কি দিলে ?'

'পৃথিবীর সকল শ্মশান দিলাম।'

'কি দিলে ?'

'সসাগরা পৃথিবীর সকল শ্মশান তোমাদের দিলাম।'

'দিলে ?'

'দিলাম, দিলাম, দিলাম।'

তখন সেই আদি গঙ্গাপুত্র দুই হাত তুলে ভীষণ নেচেছিল। উল্লাসে বলেছিল—'হা, মোরা শ্মশান পেয়েছি গো, সকল শ্মশান পেয়েছি! এ পিথিমীর সকল শ্মশান মোদের।'

সেই মানুষটির বংশের একজন হয়ে চণ্ডী কেমন করে জাতকর্মে লাথি মারত ? মারলে যে সে দেবরোষে পড়ত না তার ঠিক কি ? অথচ, চণ্ডীর ভীষণ ভয় করত ইদানিং, খন্তা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ও মুখ ফিরিয়ে নিত। গর্তে কাঁটা ঝোপ চাপা দিলেও ওর ভয় যেত না। মনে হত যে-কোন সময়ে মুখে আগুন নিয়ে একটা শেয়াল বটগাছের মত বড় বড় থাবা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করবে।

ভগমান—ভগমান—ভগমান···চণ্ডী গুনগুন করে কাঁদত। একছুটে চলে আসত বাড়ি। ঘরে বাতি জ্বেলে বসে থাকত আর ভগীরথের দিকে চেয়ে ঠাকুরকে ডাকত। এই সময়ে চণ্ডী সব সময়ে কামনা করত গ্রামের প্রতিটি শিশু যেন অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে বেঁচে জীয়ে থাকে, কেন না আগে তার যে দুর্বলতা ছিল না এখন সেই দুর্বলতা হয়েছে।

ভগীরথের কথা মনে করে ওর প্রতিটি শিশুর জন্য কষ্ট হয়, নিদারুণ কষ্ট হয়। যদি বটতলায় বেশি সময় থাকতে হয় ওর বুক দুখে টনটন করে। মুখ

নিচু করে ও গর্ত করে। বাপকে মনে মনে দোষ দেয়। মেয়েকে কেন সে এই নিষ্ঠুর কাজে ব্রতী করে গেল ?

'আপনারা অন্য মানুষ দেখে লাও, মোর মন উঠে না।'

চণ্ডী একথাও বলেছিল একদিন। কিন্তু ওর কথা কেউ কানে নেয়নি। মলিন্দর ওর কথা বিশেষ বুঝত না, কেন না, অন্য মানুষ যা দেখে ভয় পায়, ঘৃণা করে, সেই অশুচি শবদেহ, হাড়, চামড়া নিয়েই ওর জীবিকা। চণ্ডীর কথাবার্তা শুনে ও বলত—'ধুস্ যত মিছা ডর !'

চণ্ডী বেশি কাঁদলে বলত—'তো মানীর বংশে তো কেউ লাই, কে আসবে শুনি ?'

এই সময়েই সেই নিদারুণ ঘটনাটা ঘটেছিল। গ্রামে বেড়াতে এসেছিল মলিন্দরের এক জ্ঞাতি বোন। তার মেয়েটা ক'দিনেই চণ্ডীর ন্যাওটা হয়েছিল। গ্রামে সেবার খুব বসন্ত হচ্ছে। চণ্ডীরা কোনদিনই টিকে নেয় না, শীতলাতলায় যায়। ননদের মেয়েটিকে কোলে নিয়ে ছিল চণ্ডী। ননদকে নিয়ে পুজো দিয়ে এসেছিল শীতলাতলায়। রেললাইনের ধারে বিহারী কুলীরা যখন কাজ করত ওরা একটি শীতলাথান বসিয়ে গেছে। সেখানে পাকাপাকিভাবে বিহারী পুরোহিত থাকেন একজন।

কয়েকদিন পরে সেই শিশুটিই, কি আশ্চর্য, মায়ের দয়ায় মারা গেল। চণ্ডীর বাড়িতে নয়, অন্যত্র, কিন্তু মেয়ের মা-বাবা-পিসী-কাকা সবাই বলতে লাগল চণ্ডীই ওকে নিয়েছে।

'আমি ?'

'হাঁ গো তুমি !'

'আমি লয় গো আমি লয়।'

চণ্ডী ওদের সমাজের মেয়েপুরুষগুলির দিকে চেয়ে সকাতরে বলেছিল।

'হাঁ তুমি !'

'কখুনো নয়।' চণ্ডী সাপের মত ফুঁসে উঠেছিল। বলেছিল—'আমা হতে কারো মন্দ হবার লয়। জান আমি কার বংশ ?'

ভীরু কুসংস্কারে অন্ধ মানুষগুলি ভীত চোখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল—'টুক্‌নিকে মাটি দিবার কালে তোমার বুক হতে দুধ মাটিতে পড়ল কেন ?'

হা রে বোকার সমাজ !

চণ্ডী কিছুক্ষণ ঘৃণা ও বিস্ময়ে সকলের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল—'ঠিক আছে। পিত্তিপুরুষের শাপ মোকে লাগুক, ডর করি না। উ কাজ ছেড়ে দিলাম আজ হতে।'

'কাজ ছেড়ে দিবি?'

'দিব। যা, যেয়ে বীরপুরুষ সব, পাওয়া দেগা। মোর মন ইকাজে বহুদিন লাই, গঙ্গাপুত্ত গোরমেণ্টের ঘরে সরকারি কাজ পাবে, ই কাজে আমি মরতে যাব কেন?'

সমাজের সকলকে বোবা করে দিয়ে চণ্ডী ঘরে চলে এসেছিল। মলিন্দরকে বলেছিল—'কাজ যিখানে সিখা ঘর মেলে না? সিথা চলে যাব। উরা মোকে কি বলে তা জান?'

মলিন্দর চণ্ডীকে ঠাট্টা করে অবস্থাটা সহজ করে নেবার জন্য স্বভাবসিদ্ধভাবে চেঁচিয়ে হেসে বলেছিল—'কি বুলে উরা? তু বাঁয়েন হছিস?'

বলেই মলিন্দর আর্তনাদ চেপে নিয়েছিল। কি বলল! মলিন্দর একি ভয়ানক কথা উচ্চারণ করল?

চণ্ডী কাঁপতে শুরু করেছিল বাঁশের খুঁটি ধরে। উত্তেজনায়, দুঃখে, রাগে, চতুর্গুণ চেঁচিয়ে ও বলেছিল—'ঘরে বন্‌শধর রইতে কেউ উ বাক্য মুখে ল্যায়? আমি বাঁয়েন? আমি ঘরের ছেলে ফেলে, মরা ছেলেরে দুধ দেই, মরা ছেলে লিয়ে সোহাগ করি? আমি বাঁয়েন?'

'চুবো!'

মলিন্দর ওকে ধমক দিয়ে উঠেছিল, কেন না তখন ভর দুপুর। এ সময়ে মানুষের কুকথা-দুঃসংবাদ বাতাসের মুখে ধায়। এ সময়ে মাথায় তেল, ভাত না থাকলে মনে ভয়ঙ্কর হিংসে-রাগ-আক্রোশ সহজে ধুইয়ে ওঠে। মলিন্দর ওর সমাজের লোকের স্বভাব চরিত্র জানত।

'আমি বাঁয়েন লই গো আমি বাঁয়েন লই!'

চণ্ডীর কান্না চিল ছোঁ মেরে বাতাসকে পৌঁছে দিয়েছিল। বাতাস নিমেষে সে কান্নার খবর ঈশান থেকে অগ্নি আকাশের সবকটা কোণে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

ঐ একবার কেঁদেই চুপ করে গিয়েছিল চণ্ডী, আর কোন কথা বলেনি, মলিন্দরকে নাকি বলেছিল—'মোরা আঁধারে চলে যাই কুথা?'

'কুথা যাবি?'

'পালাবা?'

'কুথা ?'

'জানি না।'

চণ্ডী মলিন্দরের কাছে এসে ভগীরথকে কোলে নিয়ে বসেছিল, বলেছিল—'কাছে গুইড়ে এসো, বুকে মাথা রাখি।'

বলেছিল—'মোক বড়ো ডর লাগছে। পিত্তিপুরুষের কাজ করব না বলে এলাম থিকে ডর লাগছে। এতদিন তো ডরি নাই ? আজ অ্যামন ডর লাগছে, তুমাকে আর দেখব না, ভগীরথকে আর দেখতে দিবে না, ভগমান ?'

এই কথাটি বলে মলিন্দর চোখ মুছল। বলল—'এখুন মনে ল্যায় বাপ, সিদিন ভগমান উর মুখ দিয়ে কথাটা বুলিয়েছিল, জানলু ?'

'তাপর ?'

তারপর চণ্ডী কয়েকদিন আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকছিল। অল্প কাজকর্ম করে আর ভগীরথকে কোলে নিয়ে বসে থাকে, গান গায়। ঘরে খুব ধুনো জ্বালে পিদিম জ্বালে আর মাঝে মাঝে কান পেতে শোনে।

একটানা দুটো মাস খুব ভাল কেটেছিল। আর চণ্ডীকে ডাকতে আসেনি কেউ। আর দরকারও হয়নি। খুব শান্তিতে ছিল ওরা সেই কটা দিন চণ্ডীও খুব শান্ত হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল—'ই—কাঁচাকচিদের অন্য বেবস্থা হতে হয়। ই বেবস্থা খুব মন্দ।'

'হবে, বেবস্থা হবে। দিকে দিকে হচ্ছে!'

চণ্ডী বলত—'ভাল করলাম কী মন্দ করলাম কে বুলে দিবে ? দেখ, মোক মন বুলে নিশি য্যাখন শুনলাম ত্যাখন জানি মোক বাপ হাঁকুর দেয়।'

'তুই শুনলি।'

'মন বুলে যেমন হই-হই-হইয়া ডাক উঠে, বাপ কি শেয়াল তাড়ায় নাকি ?'

'চুপ যা চণ্ডী!'

মলিন্দর ভয় পেত। মাঝে মাঝে কি তারই মনে হত না চণ্ডী বাঁয়েন হয়ে যাচ্ছে, চণ্ডী রাতে চমকে উঠে বটতলায় কাদের কান্না শোনে ? হয়তো সমাজ যা বলছে সে কথাই সত্যি। মনে হত এর চেয়ে দেশ-গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়া অনেক ভাল।

সমাজও চণ্ডীকে ভোলেনি। চণ্ডীর ওপর চোখ রাখছিল। চণ্ডী তা বুঝতে পারত না এই যা! সমাজ যখন চায় তখন লক্ষ্যে চোখ রাখে, যখন চায় না তখন অলক্ষ্যে চোখ রাখে। সমাজের অসাধ্য কাজ নেই।

তাই একদিন ঝড় বাদলের রাতে, মলিন্দর যখন মদ খেয়ে নেশায় টুপটুপে হয়ে ঘুমোচ্ছে, ওর উঠোনটা মানুষে মানুষে ভরে গিয়েছিল। ওকে ডেকে তুলেছিল কেতন, চণ্ডীর কি রকম মেসো। বলেছিল, 'তোর বউ ডাঁয়েন কিনা দেখে যা!'

ঘুম ভাঙা চোখে মলিন্দর বোকার মত ওদের দিকে চেয়ে বসে ছিল কিছুক্ষণ।

'দেখে যা শালা দেখে যা, ঘরে ডাঁয়েন পুষ্যে মোদের ছেলেগুলোকে সায়া করছিস ত্যাতদিন ধরে!'

মলিন্দর দেখতে গিয়েছিল। দেখছিল—বটতলায় মশাল জ্বলছে, লণ্ঠন। সমাজের বেটাছেলেরা ভিড় করে চাক বেঁধে আছে, কেউ কথা বলছে না।

'চণ্ডী রে!'

মলিন্দরের আর্ত চিৎকারটা কে শূন্যেই ছুরি দিয়ে কেটে ফেলেছিল। সবাই স্তব্ধ, সবাই দেখছে এরা কি করে।

'চণ্ডী!'

চণ্ডী দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে একটা দা, পাশে লণ্ঠন, এক পাঁজা কাঁটা গাছের ডাল পাশে উঁচু করা।

'ডাল ঝোপ এনে আমি গর্ত ঢাকছিলাম গো।'

'কেন, তু উঠে এলি কেন?'

'শিয়ালগুলো চেঁচাতে যেয়ে য্যামন থেমে গেল ত্যামন মোক মন বুলল—উরা গর্তে যেয়ে খাবলাচ্ছে, মরা তুলবে।'

'তু ডাঁয়েন!' গ্রামের লোকেরা মন্ত্রধ্বনির মত বলল, সভয়ে।

'ক্যাও পাওরা দেয় না খি।'

'তু ডাঁয়েন!'

'মোক বংশকাজ। উরা কি জানবে?'

'তু ডাঁয়েন!'

'আমি ডাঁয়েন লই গো, বুকে কচি ছেলা, মোক বুক দুধে ফেটে যায়। ডাঁয়েন আমি লই! গঙ্গাপুত্ত তুমি বুল না গো, তুমি তো সব জান?'

লণ্ঠনের আলোয়, বৃষ্টিতে লেপটানো বুকের আঁচলটা দেখছিল মলিন্দর মন্ত্রমুগ্ধের মতো। বুকের ভিতর ফেটে যাচ্ছিল মলিন্দরের। কে বলছিল, 'ও মলিন্দর সাপ দেখলে তু কাছে যাস, আগুনে যেয়ে হাত ঢুকাস, এখন যাস না

তু ? তুদের কত ভালবাসার বিয়ে, ভালবাসার ঘর। তু গেলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

মলিন্দর কাছে গিয়েছিল, রক্ত চোখ দিয়ে চণ্ডীকে ভাল করে দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠেছিল জন্তুর মত—'আরি ই-ই-ইহার! তু বাঁয়েন। বটতলায় এসে কারে দুধ দিচ্ছিলে রে ? আরি ই-ই-ই-ই-গো।'

'গঙ্গাপুত্ত…হায় গো।'

চণ্ডীর ভীষণ ও বুকফাটা কান্না মাটির মৃত শিশুদের, চণ্ডীর বাবার অশান্ত আত্মাকে, ওর আদিমপুরুষ সেই আদিম ডোমকে অব্দি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। মানুষের জগৎ থেকে অমানুষটি অতিলৌকিক লোকে নির্বাসনের সময় মানুষের আত্মা বুঝি অমনি করেই কাঁদে। অমনি আকাশ-মাটি-পাতাল কাঁপিয়ে।

কিন্তু মলিন্দর ছুটে ঘরে এসে ওর শ্বশুরের শনিপুজোর ঢোলটা নিয়ে আবার বটতলা চলে গিয়েছিল। ঢোলে কাঠি দিয়ে গ্রাম কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—'আমি মলিন্দর গঙ্গাপুত্ত শোহরৎ দেই। আমার বউ বাঁয়েন হয়্যাছে গো বাঁয়েন হয়্যাছে!'

'তাপর ?' ভগীরথ জানতে চাইল।

'তাপর সমাজ উকে বেলতলা লিয়ে গেল বাপ। জানলু, একেল হতে সি য্যামন ডরাত, সি একেবারে একেল হয়ে গেল। উই উই শোন বাঁয়েন গান গায়।'

অনেক দূর থেকে টিনের কৌটোর শব্দ আর এক আশ্চর্য গানের সুর ভেসে এল। সে গানে শব্দ নেই। কথা নেই বলে মনে হয়, কিন্তু কথা ধীরে ধীরে শোনা গেল।

ঘুম এস ঘুম এস রে সোনা, ঘুম এস রে যাদু…

গানটা ভগীরথ জানে গানটা গেয়ে ওর এখনকার মা ভৈরবী-সৈরভীকে ঘুম পাড়ায়।

'চল, ঘরকে যাই বাপ!'

মলিন্দর অভিভূত ভগীরথকে নিয়ে ঘরে ফিরে চলল। ভগীরথ বুঝতে পারল—বাঁয়েনের গানটা ওর ভেতরে ঢুকে গেল, ওর রক্তে মিলে গেল, একটা দুর্বোধ্য বেদনার মত ওর কানের ভেতর বাজতে থাকল।

তার কয়েকদিন পর ভগীরথ দুপুরবেলা একলা চলে এল মজা বিলের পাশে। অনেক দূর থেকে ও টিনের শব্দ শুনেছে, শুনে ছুটে ছুটে এসেছে।

জলে বাঁয়েনের ছায়া। বাঁয়েন ওকে দেখছে না। চোখ নিচু করে জল ভরছে মাটির কলসীতে।

'তোমার আর কাপড় নাই ?'

বাঁয়েন চুপ ; বাঁয়েন মুখ ফিরিয়ে আছে।

'তুমি ভাল কাপড় পরবে ?'

'গঙ্গাপুত্তের বেটা ঘরে যাক্।'

'আমি, আমি এখন ইস্কুলে পড়ি। আমি ভাল ছেলে।'

'মোক সঙ্গে কথা বুলে নারে। আমি বাঁয়েন।'

'আমি ছেঁয়াকে বলছি।'

'মোক ছেঁয়াতে পাপ আছে ইকথা গঙ্গাপুত্তের বেটা জানে না ?'

'আমার ভয় নাই '

'ঘরে যাক্, এখন ত্যতস্পর তাত। ইকালে দুধের ছেলে বাইরে ঘুরে না।'

'তুমি…তুমি একলা থাকতে ভয় পাও ?'

'একলা ? না বে মোক কুনো ভয় নাই। একলা থাকতে বাঁয়েন ডরে ?'

'তবে তুমি কাঁদ কেন ?'

'কে বুলে ?'

'আমি শুনেছি।'

'গঙ্গাপুত্তের বেটা শুনেছে ! আমি কাঁদি ?'

জলে লাল ছায়াটা কাঁপছে। বাঁয়েনের চোখে জল, বাঁয়েন চোখ মুছল, বলল—'ঘরে যেয়ে গঙ্গাপুত্তের বেটা য্যান ফিরে কাড়ে, বাঁয়েনের ধারে কুনোদিন আসবে না, লয় তো…লয় তো আমি গঙ্গাপুত্তকে বুলে দিব।'

ভগীরথ দেখতে পেল আল ধরে বাঁয়েন চলে যাচ্ছে। চুলের গোছা উড়ে পড়ছে, কাপড়ের আঁচল লাল। অনেকক্ষণ বসে রইল ভগীরথ, বিলের জল স্থির হওয়া অব্দি বসে রইল। কিন্তু আর কেউ গান গাইল না—ঘুম এস ঘুম এস সোনা, ঘুম এস রে যাদু।

ঘরে গিয়ে বাঁয়েনও অনেকক্ষণ বসে রইল। বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকল। ভেবে ভেবে শেষে উঠে অনেকক্ষণ বাদে একটা ভাঙা আরসি টেনে বের করল।

'চ্যাহারার কিছু লাই।'

অস্ফুটে বলল বাঁয়েন। চুলগুলো একবার আঁচড়াতে চেষ্টা করল। ভীষণ জট।

টোকাটা কাপড়ের কথা বলল কেন? উর তো কিছু মনে থাকার কথা নয়। ফর্সা কাপড়, ভাল চ্যাহারার কথা? ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল বাঁয়েন। অনেকদিনই ও মানুষের মত গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারে না। ভাববার কিছু নেইও ওর। শুধু গাছের পাতার শব্দ, বাতাসের ডাক, রেলের আওয়াজ নিয়ে কত কথা আর ভাবা যায়!

কিন্তু আজ ওর মনে হল টোকাটার সর্বনাশ হয়ে যাবে। হঠাৎ মানুষের বউয়ের মত অবিবেচক মলিন্দরের ওপর রাগ হল। টোকাটাকে সামলে রাখা কার কাজ? বাঁয়েনের নজর থেকে আড়াল করা কার দায়িত্ব?

উঠে, লণ্ঠন জ্বেলে ও হনহন করে রেললাইন ধরে ধরে এগোতে লাগল। লাইন ধরে এগিয়ে গেলে ঐ দূরে গুমটি ঘর, লেভেল ক্রসিং। ওখান দিয়ে আসে মলিন্দর। এসে আলপথ ধরে ঘরে যায়। লাইন ধরে যেতে যেতে ও লোকগুলোকে দেখতে পেল। লোকগুলো লাইন থেকে কি সরাচ্ছে।

না, লাইনের উপর বাঁশ গাদা করছে এনে এনে।

আজ বুধবার রাতের ফাইভ-আপ লালগোলায় মেলব্যাগ আসবে। অনেক টাকা। অনেকদিন ধরে ওরা এই জন্তে তৈরি হচ্ছে।

'তোরা কে?'

বাঁয়েন লণ্ঠন তুলল, নিজের মুখের পাশে দোলাল। লোকগুলো মুখ তুলছে। ভয়ে সাদা, চোখ বিস্ফারিত। ওর সমাজের মানুষদের এত ভয় পেতে বাঁয়েন কোনদিন দেখেনি।

'বাঁয়েন!'

'তুরা বাঁশ-গাড়ি দিচ্ছিস, তুরা গাড়ি মারবি? আবার পালিয়ে যাচ্ছিস, হা রোক ভরে? ই বাঁশ ফেলা আগে, সর্বনাশ হবে।'

ওরা বাঁশ নামাতে পারে না লাইন থেকে, সর্বনাশ ঠেকাতে পারে না। সমাজ চিরকাল এই করে, সমাজের এই কাজ। ওদেরই একজন একদিন ঢোল মহরৎ দিয়ে ওকে বাঁয়েন করে দিয়েছিল। বাতাসে বৃষ্টির ঝাপট, চণ্ডী লণ্ঠনটা হাতে নিল। অসহায়, কি অসহায় চণ্ডী। ও যদি বাঁয়েন হয় তো ওর পোষা অন্ধকারের দানবগুলো এসে ঐ ট্রেনটাকে থামিয়ে দিচ্ছে না কেন? সমাজ তো এই পারে। শুধু এইটুকু। কি অসহায় চণ্ডী, চণ্ডী এখন কি করে?

লণ্ঠন হাতে চণ্ডী লাইন ধরে ছুটতে লাগল। এক হাত তুলে মানা করতে লাগল—এসো না আর এসো না-গো, এখানে পাহাড়-প্রমাণ বাঁশ গাড়া।

ট্রেন দুরন্ত ছেলের মত কোন বাধা না মেনে একেবারে চণ্ডীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রাণ দিয়ে ট্রেনটাকে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাবার জন্যে চণ্ডীর নাম অনেক দূর পৌঁছে গিয়েছিল। বুঝি বা সরকারের ঘরেও।

লাশ ঘর থেকে ওরা যখন চণ্ডীকে নিয়ে চলে গেল তখন দারোগাবাবু মালন্দরদের গ্রামে এলেন। সঙ্গে বি. ডি. ও।

'রেল কোম্পানি চণ্ডী গঙ্গাদাসীকে মেডেল দিবে মলিন্দর, তা তোদের বেত্তান্ত তো আমি জানি। বললাম, ওর কেউ নেই তবু মুকাবিলা করে দেওয়া দরকার তাই ইনি এসেছেন।'

'সাহসের কাজ, খুব সাহসের কাজ করেছে, সবাই ভাল বলছে মহকুমার। তোমার পরিবার?'

সবাই চুপ করে। সমাজের লোকগুলি এ ওর দিকে চাইল, ঘাড় গলা চুলকে মাটির দিকে চেয়ে কেউ বলল, 'আজ্ঞা আমাদেরি জাতি।'

ভগীরথ অবাক হয়ে গেল। সকলের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

চণ্ডীকে ওরা জাতি বলল? চণ্ডীকে ওরা স্বীকার করে নিচ্ছে?

'তোমাদের সকলের হাতে তো ওর মেডেল দেবেন না সরকার।'

'আজ্ঞা আমাকে দেন।'

ভগীরথ এগিয়ে এল।

'তুই কে?'

'উনি আমার মা।'

'বটে, তোর নাম কি—কি করিস...'

বি. ডি. ও. লিখতে লাগলেন। ভগীরথের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল...

ভগীরথ গলা ঝেড়ে বলল—আজ্ঞা আমার নাম ভগীরথ গঙ্গাপুত্র।

বাপ পূজা মলিন্দরের পুত্র। নিবাস ডোমপাড়া।

মা ঈশ্বর চণ্ডী গঙ্গাদাসী...

ভগীরথ বংশপরিচয় দিতে লাগল।

# আত্মীর

'নামে তুমি পাতন হে, তার আত্মীরের* বংশ। তুমারে আমি মিঞা দিব নাই হে!'

একথা বলে পাতনকে চৈত্রের দুপুরে বের করে দিল সজনলাল। সজনলালের বাড়িঘর বলতে লালমাটির টোঙাঘর।

টোঙাঘরের নিচের খোঁড়লে ছাগল থাকে, ওপরে মানুষ। চাল বলতে তালপাতার টোপ চাল।

সজনলাল সেই টোঙাঘরের দরজায় বসে গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলল, 'তুমি যাও হে পাতন।'

পাতন সজনে গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভীরু মিনতিতে বলল, 'আমি আর কার ঠেঙে যাব বল?'

'তা আমি জানি?'

'মোরে কেও মিঞা দেয় না যি!'

'দিবে কেন?'

'কেন দিবে না বল?'

সজনলাল কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ওর বউ ভুবনদাসী ছাগলের খোঁড়ল থেকে মুখ বের করে বলল, 'কিছু বুঝ না হে তুমি! ডাও পিচাশ বট! ই ত্যাতপ্পর তাতে মানুষকে বের করে দেয়? দেখ না, মাথায় তাতে লাগরের বুদ্ধি হয়ে গেছে? লাও, উকে ঘরে বসাও। তুমি উঠ গো পাতন। ঠাণ্ডা হও। সম্‌ঝে হল্যে ঘর যাবে।'

ভুবনদাসীর মনটা বড় নরম। ও পাতনের মতো নিরীহ মানুষের দুঃখ দেখতে পারে না। তা ছাড়া ওই পাতন, ওর শুঁড়ি মনিবের কাছ থেকে চুরি করে এনে ওকে এক নম্বর খাওয়ায় মাসে একবার। সজনলাল কি! মানুষ? মেয়ে বিয়ে দিবি না, না দিলি। তা বলে এই তাতে মানুষকে বের করে দেয়?

পাতন কিন্তু গুটিগুটি ভুবনদাসীর খোড়লে এসে ঢুকল। ভুবনদাসীর কাশের রোগ। কাশিতে ছিট ছিট রক্ত বেরোয়, রাতভোর জ্বরে শোষে ভুবনদাসী।

---

* আত্মীর: অতি অল্প অর্থের জন্য আত্মবিক্রয়কারী।

তাই পাকুড়ঠাকুরের থান থেকে মাদুলি এনে পরেছে ভুবনদাসী। রামছাগলের বাতাস ভাল। ভুবনদাসী একটা দেড়ে বোকা পাঁঠা আর তিনটি ছাগলের নাদির পাশে চাটাই পেতে শোয়। ভালো থাকে শরীরটা।

সেই চাটাইয়ের এক কোণে বসল পাতন।

চাটাইয়ের অন্যদিকে শুয়ে ছিল ভুনি। সজ্জনলালের চোদ্দ বছরের ডাগর মেয়ে।

পাতন নিঃশ্বাস ফেলল। বয়স হয়ে গেল কত। চুলে পাক ধরে গেল। ভুনিকে যদি সজ্জনলাল বিয়ে দিতে ওর সঙ্গে! পাতনের সংসার হত।

'জেবনটা, বুঝলে ভুনির মা, সোমসার না হলে বেরথা যায়। না কি বল?'

'আজ্জীর বংশে মিঞা দিয়ে আমার লাভ?'

'মনিব মা বলে, সোমসার কর পাতন।'

'তা তুমি কেনে আজ্জীরের মিঞা দেখ না?'

'আর আজ্জীর কুথা?'

'তা দেখ পাতন, উ আজ্জীরপাট্টা মনিব ছেড়ে দিবে—বলে দেখেছ?'

'না। দিবে না।'

'তবে তুমার জেবন বেরথা যাবে।'

'বড় কষ্ট ভুনির মা!'

'জানি।'

ভুবনদাসী নিঃশ্বাস ফেলল। সংসার করা মানে পরনে ত্যানা, স্ত্রী পুরুষে একবেলা ভাত জুটবে না, যে যখন ক্ষেতে খাটবে, তখন অন্ন পাবে। নইলে উপোস, বারো মাস উপোস।

সেইজন্যেই সংসার করা দরকার। স্ত্রী-পুরুষের দরকার পরস্পরের গায়ের তাপের। ভাঙা টোপচালের নিচে কঙ্কালের মতো দু-চারটে শিশুর। নইলে কি নিয়ে থাকে ভুবনদাসীর মতো, পাতনের মতো মানুষরা?

প্রত্যহ অন্নের আশা কে করে? ভুবনদাসীরা করে না। ওরা জানে এ পৃথিবীতে কিছু মানুষ রোজ খায়, কেউ একবেলা, কেউ মাঝেমধ্যে।

ওরা তৃতীয় দলে। ভাত কে চায়? ভাত কে পায় রোজ? শশীবাগ্দী আমানি বেচে, আমানি খাও। শরীরে ডাগদ থাকে, বাদরাস্তায় গিয়ে ভাজের

হোটেল থেকে কেন চেয়ে খাও। নইলে নইলে জঙ্গলে যাও। জঙ্গলবাবুদের পাহারা এড়িয়ে কন্দ খোড়, বাঁশের কচিপাতা সেদ্ধ করে খাও।

জীবন এইরকমই। সে জীবনে বউ বড় দরকার। ভুবনদাসী তা জানে। তাই ও বলল, 'ই দেশ ছেড়ে ভিনদেশে যেতে পার? ভিন গাঁয়ে? যিখানে ক্যাও তুমারে চিনে না? সিথা গেলে বউ পাও।'

'যাব কুথাকে? মনিব পুলুস দিয়ে আনা করাবে।'

'সিবার আনা করছিল বটেক।'

'আবার আনা করাবে। যিথা যাই, এ ভোবন সিচে আবার আনা করাবে গো! আত্মীরের কেও নাই।'

'বুল না হে! তুমার কথা শুনে মোর বুক ফাটে।'

'বড় কষ্ট গো!'

'লাও! ই কষ্টের উপায় তুমার হাতে নাই।'

'না। মনিবের পা ধরে কেন্দ্যেছি কত। বল্যেছি, আত্মীয়পাট্টা দেন মাশায়, মোরে খালাস দেন।

'উ বা কি করে বল?'

'তাই বলে মনিব। বলে তুর পিত্তিপুরুষকে মোর পিত্তিপুরুষ কিনেছিল, সি কি আমি নিদান করতে পারি? তাল্লে পিত্তিপুরুষের কোধ হবে বিষম।'

'লাও! তবে আর কি করবে বল?'

'কিছু না। বড় দুঃখ আমার হে! বেথা বুঝ, তাই বললাম।'

'ই কি? উঠ কেন? যাও কুথা?'

'যাই। কবিরাজ শওরে যাবে, তা মনিব মার তরে তেল লিয়ে যাই।'

'কি তেল গো?'

'মাথার তেল। মনিব মার মাথার ব্যামো ভুনির মা! উ তেল দিলে থাকে ভাল।'

'মনিব মা তুমায় স্নেহ করে বেস্তর।'

'তা করে। কুনঅ সামগগি মোরে না দিয়ে খায় না। খরা বল, বরা বল, মাংস আমি আনব, উনি রাঁদবে। তা মোর তরে আগে সাপোটে রাখবে।'

'খুব খাও, তাই না?'

'খু—ব!'

'নিত্য ভাত খাও?'

'বিয়েনে খাব, দুপুরে খাব, সাঁঝে খাব। তা বাদে মুড়ি খাব, পিঁয়াজ খাব, গুড় খাব। খাই খুব।'

'বস্তর দেয় না কেন?'

'দিবে, এবার দিবে।'

'ভাল আছ হে, ভাতের সুখে।'

'কিন্তু মনে বড় বেথা যি '

'মনিব শালোমালো বলে, গেওাই-মেওাই করে! বলে যা শালা, বউ ধরে আন, বিয়া কর। তা আমি বলি মাশায়, আজীরকে কেও মিঞা দেয় না যি! উ বলে বলবি—তিন সম্ঝে ভাত দুধ, বছরে দুখানা বস্তর। তাতে বউ মিলে না?'

ভুবনদাসী কি ভাবল। তারপর বলল, 'হোথা যেয়েছিলে?'

'কুথা গো?'

'শৌশানতলা? মায়ের কাছে?'

'না।'

'উনির পা ধরে পড়গা! উনি দেবাংশী মানুষ। জানলে উনি জানবে।'

'উনিকে ভয় করে যি!'

'কেন?'

'মোরে রাতে যেতে বলে যি!'

'তা যাবে।'

'ভয় করে।'

'কেন?'

'রাতে গেলে যদি…'

'যেতে বলে, দেবভাবে বলে। মানুষ ভাব উনির নাই। ভয় কি তুমার?'

'যদি মোরে বাণ মেরে এখে দেয় বরা থরা করে?'

'না। তুমার ভয় নাই হে। যেয়ে দেখ।'

'উনি নিদান দিবে?'

'দিতে পারে। পারলে উনি পারে।'

'দেখি!'

'তুমি বড় অভাগা হে। আজীর হয়াছিল তুমার পিত্তিপুরুষ। তুমি তুমার মালিক লও। তুমার মালিক উ মাতং শুঁড়। তুমার দুঃখে মোর বুক ফাটে।

পাতন একবার সতৃষ্ণ চোখে ঘুমন্ত ভুনির দিকে চাইল। বলল, 'চুরি করে পাতকি করে কত মদ, চাল, গুড় খাওয়াছি গো! মিঞাটা দিল না ভুনির বাপ।'

'আজীর যি।'

'তা দেখ, যেয়ে দেখি হোথা!'

'হ্যাঁ। যেয়ে পা ধরে পড়বে। আর দেখ, উনি কী বলে মোরে বলে যেয়ো।'

পাতন উঠল। তালপাতার ছাতাটি মাথায় দিয়ে ও বেরিয়ে এসে হাঁটতে থাকল। এখন কবিরাজবাড়ি যাবে, তেল নেবে।

মনিব-মা বন্ধ্যা। তায় যুবতী। শরীরে নানা রোগ তার। পাতনকে ছাড়া তার একটি দিন চলে না। পাতন পা টিপে দেবে। মাথা টিপে দেবে। উঠোনে মূর্ছা গেলে পাতন তাকে পাঁজাকোলা করে ঘরে তুলবে। আর কেউ তাকে ছুঁলে মনিব মা অজ্ঞান অবস্থাতেও টের পাবে। চেঁচাতে থাকবে।

পাতনের মনিব মাতঙ্গ শুঁড়ি বলে, 'খাস কুথা ? মনিব-মার কাছে থাকবি। তু গোলাম, ঘরের গোলাম। উর কাছে থাক, আঁসগুলান দেখ, গরুগোয়াল কাড়্।'

বলে, 'তু মোর সাথে হারামি করবি না কখুনো।'

পাতনও জানে সে কথা। মনিব মাকে পা টিপে দিলে, মাথা টিপে দিলে পাঁজাকোলা করে তুললে, ওর রক্ত চঞ্চল হয়। চামড়ায় চড়কতলার আগুন জ্বলে।

চড়কের রাতে ভক্ত্যারা গনগনে কাঠকয়লার আংরা আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটে। পাতনও হেঁটেছে। পাতন যখন পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে, আগুনের আঁচে শরীর পুড়ে গেছে ওর।

আবার ভক্ত্যা হলে সেই আগুনেই তখন ভোরবেলার শেতল বেলেমাটির পথ।

সেই আগুন পাতনের শরীরে মনিব-মা জ্বালায়। পাতন মনে মনে ভক্তি এনে সে আগুনকে শীতল করে নেয়। মনকে বলে, 'উনি মনিব-মা গো! উকে মাত্তিভাবে দেখতে হবে। কুনঅ পাপ ভাবতেই নাই।'

ও আজীর, বংশানুক্রমে ক্রীতদাস।

কবিরাজবাড়ি থেকে তেল নিল পাতন। তারপর এগিয়ে এসে বসল দিঘির

ধারে। নামে রাজার দিঘি। জল এখন তলাক্ষি। চৈত্রে এই, বৈশাখে দিঘির বুক ফুটিফাটা হবে।

তখন গাঁয়ের পাঁচজন এসে দিঘির বুক খুঁড়ে রেখে যাবে সন্ধেবেলা। রাতভোর সেই গর্তে চুঁয়ে চুঁয়ে জল জমবে। ভোর না হতে নিলে পরে জল পাবে না কেউ।

অগ্নিবর্ণ ধোঁয়ার মতো তাতে জল শুকিয়ে যাবে।

তখন সবাই যাবে চার মাইল দূরে ব্লক আপিসে। সেখানে কুয়ো শুকোয় না। কুয়োতে জল মেলে।

যাবে মাস্টারবাবুর বাড়ি।

এ জেলাটা অনাবৃষ্টি আর খরা দুর্ভিক্ষের জেলা। বছরের পর বছর সরকার রিলিফের টাকা দেবে।

সেই রিলিফের টাকা নেন মাস্টারবাবু। এ অঞ্চলের পাঁচখানা গ্রামের রিলিফের টাকা উনি বছর বছর নেন, জানা কথা। যেটা নিয়ম দাঁড়িয়ে যায়, সেটাকেই মেনে নেয় পাতনা? কখনেরা কেউ বলে না, 'কেনে? রিলিফের টাকা মোদের লেগে, মোরা পাই না কেনে? ধান কুথা যায়? বীজ কুথা যায়?'

রিলিফের টাকা থেকে মাস্টারবাবু বাড়ির চারদিকে পুকুর কাটিয়ে, কুয়ো খুঁড়ে আবাদ করেছেন। ধানভানা কল, শহরে বাড়ি, একখানা বাস, কী করেননি?

জল উনি মানুষকে দেন। খাওয়ার জল, রান্নার জল। তবে স্নান করতে দেন না কাউকে।

পাতনের মনিবেরও দুটো কুয়ো বাড়িতে। রাতেভিতে জল পাহারা দেওয়া পাতনের একটা বড় কাজ। বড় পাপী মানুষগুলো। রাতে জল হেন জিনিস চুরি করে।

যতদিন না সময়মত খরা নামছে, ততদিন রাজার দিঘিতে জল থাকে
-। পাতন দিঘির ধারে বসল। অশ্বথ গাছের ছায়ায়। মা যদি বেঁচে
'হলে ওকে চৈত্রমাসে সন্ধেবেলায় অশ্বথগাছের ছায়ায় বসতে দিত
সময়ে প্রেতিনীরা তৃষিত আকাঙ্ক্ষায় আকাশে অলক্ষ্য আঁচল
আঁচলের বাতাস লাগলে মানুষের মরণ হবেই হবে।

সাত ভাই ছিল। তারা সকলেই আত্মীয়।

সকলেই কাজ করত মনিবের পিতামহের কাছে। মনিবের পিতামহ শুঁড়িখানায় টাকা করেছিল, আবার ধানজমি করেছিল বিস্তর। এখানে নয়, দশখানা গাঁ পেরিয়ে, বাঁধের ধারে।

আত্মীয়রা সাত ভাই সেখানে থাকত। চাষবাস করত, ধান বয়ে আনত মনিবের গোলায়।

তাদের একজনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। বিয়ের বর, হলুদ ছোপানো ধুতি পরে বাঁধের জলে স্নান করে উঠে চৈত্রমাসের সাঁঝবেলা অশ্বত্থ গাছের নিচে বসে।

সেই যে বসল, আর সে ওঠেনি। সবাই যখন খবর পেয়ে ছুটে এল, তখন শূন্য থেকে খলখলিয়ে হেসে প্রেতিনী বলেছিল, 'কাঁচা ছেলা আমার গাছের নিচে চত্তিরে সাঁঝে বসল কেনে? না ছ্যামায় বসব। তা আঁচল দিয়ে ছ্যায়া দিতে ঢলে পড়ল? চিনির পুতুল।'

সে সব আত্মীয়দের বংশ নেই। পাতনের পিতামহের বংশ না থাকলে পাতন জন্মাত না। জন্মটা এত দুঃখে কাটত না তার। বড়ো কষ্ট তার মনে।

প্রেতলোকে বসে সেইসব আত্মীয়রা বংশজের হাতে পিণ্ড চায়, জল চায়। পাতন জানে সব। কিছুই করতে পারছে না ও।

আত্মীয়। ওকে কেউ মেয়ে দিতে চায় না। যে কোনো কাঙালি, গরিব, ভিখিরিরও বিয়ে হয়, ওর হবে না। ওর পূর্বপুরুষ ওকে এইরকম ভীষণ শাস্তি দিয়ে গিয়েছে।

২.

সে অনেকদিনের কথা। এই খরা-আকালের দেশে সেবার যে খরা হয়েছিল সে নাকি অসম্ভব খরা। ঘাস পাতা, খেতের শস্য তো বটেই, জঙ্গলের বড়ো বড়ো গাছও নাকি শুকিয়ে জ্বলে যায়।

আকালে খরায় যা হয়, মানুষ ঘর ছাড়তে শুরু করে।

পাতনের পিতৃপুরুষের জোতজমি ছিল না। বড়ো গরিব ওরা, গ্রামের একান্তে বাস। এমনিতেই তখনকার দিনেই ওরা একমুঠো ভাত খেত কি খেত না, খরার সময়ে আরো কষ্টে পড়ল স্বামী স্ত্রী।

ওরা শুনেছিল আত্মীয়িপাট্টা লিখিয়ে কারা যেন এ সময়ে মানুষ কিনে নেয়। ওরা তাই।

—'আমাদের কিনবে গো? মোরা স্তিপুরুষ, যামন রাখবে, ত্যামন থাকব, শুধু দু মুঠ ভাত চাই।'

ডেকে ডেকে গৃহস্থদের দোরে দোরে ফিরছিল। তখন এই মাতঙ্গ শুঁড়ির পূর্বপুরুষের জাঁকের সংসার, খেত-খামার। ওদের এমন করে ঘুরতে দেখে ও ডেকে আনে।

বাড়িতেই রাখে ওদের, ভাতজল দেয়, পরনে কাপড়। তারপর একদিন আকাল ফুরোয়। আকাশ থেকে ইন্দ্ররাজার হাতিটা শুঁড় থেকে জল ঝরায় ঝম-ঝমিয়ে। আবার খাল, পুকুর, কুয়ো ভরে ওঠে। চারদিক ঢেকে যায় সবুজে। তারপর আসে আমন ধানের মাস, কার্তিক। সেই সময়ে পাতনের পিতৃপুরুষ বলেছিল।

'আমরা বাড়ি যাই মাশায়।'

মাতঙ্গের পূর্বপুরুষ বলেছিল, 'বাড়ি যাই। ঘরে এখন আছে কী? খাবে কী?'

'কিছু নাই।'

'এসেছিলে নিজকে বিচে দেবে বলে।'

'কে কিনে মাশায়?'

'ধর যদি আমি কিনি?'

'তাহলে ত বেঁচে যাই।'

'বল ত পাট্টা লিখাই, সাক্ষী ডাকি।'

'ডাকেন। শুধা দেখেন—'

'কি?'

'মোরা স্তিপুরুষে বান্দা হব। মোদের সন্তান?'

'সেও বান্দা হবে।'

'তার বংশ?'

'সবারে কিনে নিব।'

'মাশায় তুমার বড় দয়া হে। তবে ত আর ভাতের চিন্তা রইবে না কারো।'

দু হাত তুলে পাতনের পূর্বপুরুষ আনন্দ করেছিল। যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। যেন পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রকে অনন্তকাল দুধেভাতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছে। মাতঙ্গের পূর্বপুরুষ তুলট কাগজ এনেছিল, হীরেকষের

কালি, ধাগের কলম। পাট্টা লিখেছিল বংশীধর পণ্ডিতুণ্ড। সাক্ষী হয়েছিল গ্রামের পাঁচজন।

পাট্টা লেখা হয়েছিল।

'মহামহিম শ্রীযুক্ত রাবণ শুঁড়ি মহাশয় বরাবরেষু লিখিতং গোলক কুড়া ওলদ্ চেতন কুড়া সাকিনা মৌজে মামুদচক মামুলে পরগণা অযোধ্যা সরকার বাজুহায় কস্য মুনিস্য আত্মীরি পাট্টাপত্রমিদম্ কার্য্যঞ্চ আগে আমি আর আমার স্ত্রী গৈরবী নাম্নি দাসী এই দুইজন কহত সালিতে ভবিষ্যৎ বংশসহসামিল অন্নোপহতী ও কর্জোপহতি ক্রমে নগদ পণ তিন রূপেয়া পাইয়া তোমার স্থানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় হইলাম—ইতি তাং ১১ কার্ত্তিক সন ১১০১ বাঙ্গালা মোতাবেক ১৫ সহর রবি-নীয়ন সন ৩৯ জলুষ।'

শ্রীমতি গৈরবীনাম্নি দাসী

কস্যঃ

সম্মতিঃ

শ্রীগোলক কুড়া

কস্য

ছাপ সহি

পাট্টার ওপরে দশমাষ ওজনের রূপোর টাকার মোহর ছিল। পাট্টার নিচে পাঁচজন সাক্ষীর ছাপসই ছিল। অন্য কাঙালিরা বলেছিল 'ই কী করলি গোলক? বংশটা শুঁড়ির পায়ে বাঁধা দিলি? আত্মীর হলি?'

গোলক কুড়া বলেছিল, 'আত্মীরের অন্নচিন্তা থাকে না হে। তু শালোরা বুঝিস কী? ই কালদেশে আবার খরা হবে, আকাল হবে। মোদের আর চিন্তা থাকে না কুনও। ই আমি কপাল বেন্ধে কাজ করলাম।'

'ধুর শালো। আত্মীর হলি!'

সেই থেকে পাতনরা এই বাড়ির গোলাম। দিন এল, দিন গেল। সেই যে পাট্টা, তার আর নড়চড় হল না কিছু। তিনটে টাকা দিয়ে মাতঙ্গের পূর্বপুরুষ আত্মীরের বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যৎ কিনে নিল।

এমন অমোঘ সে পাট্টা, যে তার আর নড়চড় হয় না। মাতঙ্গ বলে, 'তড়পাস কেন? যা না। যেয়ে দেখ না কাছারিতে। মানুষ জমি কিনে, পুকুর কিনে, সে পাট্টা সময় গেলে নষ্ট হয় না। মানুষ কিনা পাট্টা নষ্ট হয়?'

পাতন একবার পালিয়ে গিয়েছিল।

তখন পাতনের বয়সকাল। সবে তিন সাল খেউরি হচ্ছে। মাথায় দু মণ ধানীবস্তা নিয়ে ও স্বচ্ছন্দে দু-ক্রোশ পথ হেঁটে যায়।

সেই সময়ে ভরদুপুরে এক নির্লজ্জ বেদেনী রাজার দিঘিতে স্নান করে ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে কাপড় ছেড়ে পরেছিল। হাতছানি দিয়ে মস্করা করেছিল।

পাতন বলেছিল, 'হা রে! তুরা ত জাতগোত্তর মানিস না। আমায় বিয়া করবি?'

'ধুর। বেদের জাত লই মোরা?'

'বিয়া করলে তোকে টাকা দিব।'

'পাবি কুথা?'

'যিথা হয়।'

বেদেনী হেসে আর বাঁচেনি। এ সব কথাবার্তার পরদিন ও পাতনের মনিববাড়ি গিয়ে উঠেছিল। বাঁশের ও বেতের ঝুড়ি, কাঠের চিরুনি পলার মালার সওদা নিয়ে। ডুগডুগি বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ঢুকেছিল বাড়িতে।

তখন মাতঙ্গের প্রথম বউ বেঁচে। এ বউটা তখন আসেনি। বেদেনী সেই মনিব-মাকে বলেছিল, 'ই যি মোরে বিয়া করতে বলে গো।'

'কারে? তোরে?

'লয়ত কি মোর পিসিরে? দাঁতীটারে?

'উ আজ্ঞীর।'

'কিনে লিয়েছ?'

'উরে নয়, উর পিত্তিপুরুষরে।'

'তাতে উ গোলাম হল?'

'হল না? উ কেন, উর বংশ হলে সেও মোদের গোলাম হবে। পাট্টা লিখা আছে।'

'তবে ত লাগর, হল না।'

বেদেনী পাতনকে হেসে হেসে বলেছিল। পাতনের চিবুকটা ধরে বলেছিল, 'বেশ লাগর গো! মনে ধরেছিল খুব।'

'তবে বিয়া কর?'

'ধুর।'

বেদেনী চলে গিয়েছিল। পরে গ্রাম ছেড়ে যাবার সময়ে বলেছিল, 'গোলামি ছেড়ে আয়। বেদে হ।'

'কেমন করে?'

'জাতধম্মো তেগে আয়। মোর সাথে থাকবি।'

পাতন বোঝেনি বেদেনী ঠাট্টা করছে। ও ভেবেছিল বেদেনী ঠিকই বলেছে।

জাতধর্ম ছেড়ে বেদে হলে মন্দ কী? দেশে দেশে যাওয়া যায় ডুগডুগি বাজিয়ে। আর মনিবের জোড়ালাথি খেতে হয় না পেটে।

পাতন পালিয়েছিল।

পাতনকে ধরে নিয়ে এসেছিল মাতঙ্গ।

মাতঙ্গ পাতনকে উঠোনে হাত-পা বেঁধে নারকোলদড়ির চাবুক দিয়ে নির্মমভাবে মেরেছিল। 'মহাপাপী বেটা! তু পালালে তুর পিত্তিপুরুষের মুখ পোড়ে না? তু জানিস না তু আত্মীয়?'

'বেদে হলে উ মোরে বিয়া করে গো! মোর সোমসার হয়। মোর পিত্তিপুরুষ জল পায়।

'জেতছাড়ার জল ল্যায় পিত্তিপুরুষ?'

'ল্যায় গো।'

পাতন কেঁদেছিল। ওর কান্না দেখে মাতঙ্গ মনে কষ্ট পেয়েছিল। আহা, বড়ো কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা। কিন্তু ও যদি জাত দিয়ে বেদে হয়, চলে যায় দেশান্তরে, তাহলে মাতঙ্গের সংসারে কাজগুলো করে কে?

মাতঙ্গ বলেছিল 'তুকে দেখে মনটা মোর কুকাইছে বাপ্! কিন্তুক আমি কী করি বল? তুমার পিত্তিপুরুষে আমার পিত্তিপুরুষে কথা। আত্মীয়পাট্টায় পাঁচটা সাক্ষীর ছাপ। ই কি মোর সাধ্য লাকচ করি?'

'আমি বা কী করি গো?'

পাতন মুখ তুলে জিজ্ঞেস করেছিল। পরে, মাতঙ্গের হুকুমে পাতনের গায়ে পাকাদদ মালিশ করে দিয়েছিল বেচন, শুঁড়িখানার চাকর। বেচনের দুটো বউ। একপাল ছেলেমেয়ে। ও যেতেই চায় না ঘরে। ওর ঘরে দুই সতীনে মারামারি আর কোঁদল লেগেই থাকে।

বেচন মদ মালিশ করতে করতে বলেছিল, 'তুকে দেখে আমি রিষ করি, পাতন কত ভাল আছে। হারে! কুন সুখে সোমসার চাস? মোর কথা শুন, সোমসারে কুনও সুখ নাই।'

পাতন বেচনের কথা কানে নেয়নি। বলেছিল, 'ই গাঁয়ে কুন বেটাছেলেটা

পরিবারকে ভাত দেয় ? মিঞারা গোবরঘসি করে, কাঠ গুড়ায়, ধান ভানে, পেটের ভাত তুলে। আমি সব দিতাম বেচন। কিন্তুক আজীররে কেও মিঞা দিবে না হে।'

'সেই কথা।'

'তা দেখ, আগে আমার পিত্তিপুরুষরা মিঞা পেত কুথা ? কুথা যেয়ে সোমসার করত ?'

'ত্যাত্তক্ষণ দিনকাল অন্যরকম ছিল হে! পেটে ভাত, পরনে বস্তর, ই দেখে মিঞা দিত।'

'আখুন দেয় না কেনে ?'

'আখুন কাঙাল ভিখারি কেও কারো গোলাম হতে চায় না হে! গোলাম রইতে চায় না। জীবনভোর, বংশ ধরে সবে গেলাম রইবে, পেটভাতে বস্তবস্তরে খাটবে, হাতে একটা টাকা মাইনে পাবে না, ই দেখে মিঞা দেয় কেউ ?'

'মোর কপাল!'

'তু এক কাজ কর না কেনে ?' বেচনের ভেতরে একটা ছিচকে মানুষ বাস করে। সে অসম্ভব সব দুঃসাহসিক কাজ করবে বলে তড়পায়, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। বেচন বলল, 'তু মনিবের ঘরের সকল আঁধিসাঁধি জানিস। তু সিন্ধুক খুলে পাট্টাটা চুরি কর্. যেমুন সিন্ধুক খুলবি, ট্যাকার গেঁজেটা নিবি। তা বাদে চল্ তোতে মোতে ভিনদেশে যেয়ে দোকান দেই গা।'

'বাপো রে! মোর সাহস নাই।'

'তবে মর্ গা।'

তারপর মাঝে মাঝে পাতনের মনে হয়েছে, কী হয় যদি চুরি করে পাট্টাখানা ? যদি চুরি করে ছিঁড়ে ফেলে কাগজটা ? সে কাগজ সে জীবনে দেখেনি। শুধু জানে তার সেই মরণকাঠি আছে মনিবের সিন্ধুকে। মনিব যে চৌকিতে শোয়, তার মাথার কাছে দেওয়ালে গাঁথা সিন্ধুক। সিন্ধুকের মুখে বড় কুলুপ। কুলুপের চাবি মনিবের কোমরে থাকে।

ভাবতে গেলেই ভয় হয়েছে তার। মনে হয়েছে কী করে ও চাবি নেবে, কুলুপ খুলবে ? পাতন বড় ভীরু, বড়ো দুর্বল। আজীর, খায় দায়, থাকে। আজীর পয়সা পায় না কি ? আজীরের কি ঘর আছে, না সংসার, না আলাদা কোনো সত্তা ? মনিবের ঘর তার ঘর। মনিবের সত্তা তোমারও সত্তা।

তোমার দেহটাও তোমার নিজের নয়। প্রাণ-মন-হৃদয় কিছুই তোমার নিজের নয়।

পাতন তাই পাট্টা চুরি করেনি।

সেই-মনিব মা মরে গেল নিঃসন্তান। নতুন মা এল। মনিব-মার শরীর বড়ো তাজা, দাঁতগুলি সাদা, চুল বড়ো কালো।

মনিব-মা মাতঙ্গ শুঁড়ির মেয়ের বয়সী হবে। বড় জ্বালা মনিব-মার শরীরে।

বিয়ের আগে মনিব হবু শ্বশুরবাড়িতে এক ঝালি গয়না, একটা চেলির কাপড়, একটা মাছ এই পাতনকে দিয়ে পাঠিয়েছিল।

বরের বয়সের কথা মনে কর বিয়ের কনের সর্বাঙ্গ বুঝি জ্বলছিল। তাই ঝালি নিয়ে কনের মা বলেছিল, 'পরো মা, গয়না পরো। সোনার পশ্‌শে অঙ্গ শেতল হবে।'

গয়নার স্পর্শে মনিব-মার অঙ্গ শীতল হয়নি। জেওঁচ ফল হাতে নিয়ে কত বারব্রত করেছে মনিব-মা, কোল জুড়ে ধিয়াপুতা আসেনি। মনিব-মা এখন নেমন্তন্ন নেয় না। বলে, বাঁঝারে সবে মন্দ দেখে। জেওচ মরুক্ষে সকল পোয়াতি খায় মাছের মাথা, সুখা দই। মোর বেলা হেলন-ফেলন। আমি যাই না লোকের বাড়ি গো।'

মনিব-মা মাটির মেঝেতে গড়াগড়ি খায় আদুল গায়ে। হক না হক ভরা বর্ষায় পুকুরের জলে গিয়ে অঙ্গ ডুবিয়ে বসে থাকে। মনিবের সামনে সাজে না গোজে না। মনিব ঘরে না থাকলে সর্ব অঙ্গ সোনায় রুপোয় সাজিয়ে বলে,

'কেমন দেখায় রে মোকে?'

পাতন বলে, 'ভাল।'

'তুর সি বেদেনী হতে ভাল? সজনলালের মিঞা হতে ভাল।'

'হা দেখ মনিব মা, তুমারে আমি মাত্তিভাবে দেখি তো। আমি তোমার ছেলা।'

মনিব-মা নিঃশ্বাস ফেলে। বলে, 'তু গোলাম পাতন, আমিও। সোনাদানা হাতে ছানব, টাকা নিব, ই কারণে বাপ মোরে শুঁড়ির গোলাম করে দিয়াছে, না কী বল্‌?'

'চুপ চুপ! কে বা শুনে?'

মনিব-মা পাতনকে ভালবাসে। দুঃখী জানে দুঃখীর ব্যথা। মনিব-মা আগে আগে পাতনের বিয়ের কথা শুনলে জ্বলে উঠত। বলত, 'আ রে আমার শখের গোলাম। তু বিয়া করবি, বউ লিয়ে সুহাগ করবি, সে কপাল তুর? বংশ-আত্মীয় না তুই? বিয়া হলে কী হবে? চার পা বেরাবে? আটকুড়া শুঁড়ি-মরবে তার ভায়ের বংশ শোরের পাল আসবে তার ঠেঙে। তুর ছেলা তাদের গোলাম খাটবে?'

কিন্তু এখন মনিব-মা অন্য কথা বলে। 'যা পাতন! মিঞা দেখ একটা। দেখ, আঁটকুড়ার ঘর করে করে মোর রক্তে নানা ওগ ধরে যেয়েছে। কবে মরি আমি! মনে বড় বেথা পাতন। এ দেহ কুনও কাজে নিল না ভগমান। না দিল সুখ, না দিল ধিয়াপুতা। তা দেখ, আমি গেলে তুরে দেখতে কেও নাই। তু মিঞা দেখ। বিয়া কর।'

'আত্মীয়রে কেও মিঞা দেয় না হে মনিব-মা।'

ভুবনদাসীর সঙ্গে কথা বলে পাতন মনে মনে কী ভাবল। তারপর ঘরে এসে গোয়ালে সাঁজাল দিল, গাইগরুকে খড়জল। মাহিন্দারা খেত থেকে আসবে। তাদের জন্যে বড়ো হাঁড়িতে ভাত রাঁধতে পারে না মনিব মা।

পাতন ভাত রাঁধল। মনিব মা রাঁধল ডিংলার টক, ঝিঙেপোস্ত। এই দিয়ে মাহিন্দাররা খাবে। তারপর বুনো খরার মাংস রাঁধল তাদের স্বামী স্ত্রী আর পাতনের জন্যে।

মাহিন্দাররা খেল। পাতনকে ভাত দিল মনিব মা। চৈত্রের তাতে পাতনের অঙ্গ জ্বলছিল। পাতন স্নান করে এল কুয়োতলা থেকে।

ভাত খেতে খেতে পাতন বলল, 'মা গো! ভুবনদাসী, ভুনির মা বলে শৌশানতলা যাও। যাও শৌশানতলার মা নিদান দিবে।'

'তাই যা পাতন!'

'যদি নিদান দেয়, তবে সোমসার হয়।'

'হয় পাতন। হা দেখ, তুর বিয়া হলে ইবার ভাল মিঞা আনবি। খু-ব ভাল মিঞা।'

'পাব কুথা?'

'আমার মতো মিঞা? এমুনি দলমলে যৈবন?'

'তুমার মতো?'

মনিব-মাকে মাতৃভাবে দেখতে হয়, অন্য চোখে দেখতে নাই। কিন্তু পাতনের মা ছিল শীর্ণ, পিঠকুঁজো।

মনিব-মা ভরা যুবতী, এই দলমলে যৌবন তার। চুল খুলে দিলে হাঁটুর নিচে পড়ে, চোখ উজ্জ্বল, দাঁতগুলি সাদা ঝকঝকে। শরীরের প্রতিটি রেখা নিখুঁত। সব যেন পাথর কুঁদে তৈরি। বয়সকাল বৃথা গেলে বুঝি যৌবন ওইরকম অচঞ্চল হয়, মাঝেমাঝে চোখ জ্বলে হিংস্রতায়। এখন যেমন জ্বলছে।

'আমার মতো।'

'কুথা পাব?'

'খুঁজবি।'

'তুমাকে মনিব কত সোনাদানা দিয়া আনল গো।'

'তুকে আমি দুব সোনাদানা।'

'হাই গো!'

'দুব রে। তু তবু একটা ছেলের সামিল। কার তরে এথে যাব বল? উ খালভরার গুষ্টির লেগে?'

'ডর লাগে গো, ডর খাই।'

'আর শুন—'

'কি?'

'মিঞা বাছা কর। তা বাদে তুরে আমি সি পাট্টা চুরি করে দিব। লিয়ে পালাস তু।'

'নিষ্যস?'

'নিষ্যস।'

'ভুলবে না?'

'না পাতন। তু জানিস না উ খালভরার কাছে আমি গোলাম। ই জীবনে মোর মুক্তি নাই। উয়ার ফাঁদ কেটে তু পালালে তাতেও মোর মনে শান্তি। তোরে পাট্টা দিব আমি।'

'তুমাকে ধরবে যি?'

'মোকে? উর সাধ্য কী?'

'পাপ হবে যি তুমার?'

'গঙ্গায় চ্যান করে লিব। সব পাপ গঙ্গায় হরে।'

'গঙ্গা ই দেশে নাই।'

'তু মোরে লিয়ে যাবি। যাবি না? তুর লেগে আমি পাট্টা চুরি করব, গয়না দুব তুর বউরে, তু নিয়ে যাবি?'

পাতনের মনে অসম্ভব দুরাশা। বড়ো লোভ হচ্ছে তার, পাপপুণ্যের হিসেব চোখ থেকে মুছে যাচ্ছে—'তবে আর শোঁশানে যাই কেন? মিঞা দেখি?'

'দেখ গা।'

'মনিব-মা, আজীরিপাট্টা ছিড়ে ফেললে, গয়না দিলে, উ সজনলাল ভুনির সঙ্গে বিয়ে দিবে।'

'ভুনি রুগা-ভুগাটা।'

'খেলেমাখলে তুমার মতো হবে গো।'

'দেখ তবে।'

সজনলাল বলল, 'গয়না তু পাবি কুথা।'

'মনিব-মা দিবে।'

'নিয্যস?'

'নিয্যস।'

তখন সজনলাল আর ভুবনদাসী পাতনকে ঘরে এনে বসাল। বলল, তবে আর কথা কি? আজীরপাট্টা না থাকলে তু গোলাম থাকিস না। ট্যাকা দিবে মনিব মা?'

'মোর আছে পাঁচ কুড়ি।'

'পেলি কুথা?'

'য্যাতক্ষণ যা দেয় মনিব-মা, সব আমি এখেছি না। তা বারো বছরে পাঁচ কুড়ি ট্যাকা হয়েছে মোর।'

'সি ট্যাকা লিয়ে করবি কী।'

'তুমার সমন্ধীর দেশে যাব। জমি লিব, চাষ খাটব। ধারে লিব জমি। ধান হতে ধার শুধব।'

সজনলাল আর ভুবনদাসী এ ওর দিকে চাইল। বলল, 'কবে পাবি গয়না?'

'সি আমি সামলে দুব, বলব তুমার সময় হলে।'

'মনিব-মা কী বলে !'

'সি সন্ধানে আছে। সময় হলে কাজ হবে গো।'

ভুবনদাসী নিঃশ্বাস ফেলল। পাতন যদি আত্মীয় না থাকে, ভুনির অঙ্গে সোনা দিতে পারে, তাহলে আর আপত্তি কিসের? পাতনের চুলে পাক ধরলেও শরীরে শক্তি আছে, নীরোগ শরীর ওর। চেহারাও ভাল। না, ভুনির সুখ হবে।

ভুবনদাসী বলল, 'লে, টুকচে মদ খা।'

সজনলাল বলল, 'কারেও বলিস না যেন?'

'না, কারে বলি?'

'কে কানভাঙাভাঙি করে দিবে!'

'বলব না গো!'

'যাস কুথা?'

'গোলক শার বাড়ি। মনিব-মা কাপড় কিনবে।'

'উ মনিব মা তোরে লজর ত দেয় না পাতন?'

'না না উ মোরে ছেলাভাবে দেখে আমি উরে মাত্তিভাবে দেখি।'

'মাত্তিভাবে দেখলে পরে ভাল। তু ত ভামপানা আছিস, বুঝিস না কিছু!'

'বুঝি গো, সব বুঝি। দেখ, আমার মনিব-মার রঙ্গে নানা 'ওগ ধরে যেয়েছে।'

'ত্যাতো খায়, তবু ওগ? ত্যাতো ভোগে থাকে, তবু ওগ?'

'উনার রক্ত জরজর। বলে বাঁচবে নাই গো।'

'হাঃ! তুরে বলদ পেয়ে বলেছে।'

ভুবনদাসী বলল, 'তা কেন? ওগ সুখী মানুষকে ধরে না? তাল্লে নবীন জোতদার মরল কেনে? কবিরাজমশায়ের বুনটা? কি দলমলে শরীল গো! কে বলে পাঁচ ছেলার মা! কবিরাজমশায় এলে দিলে। তা বাদে নালকি করে আসপাতালে নে গেল, তবু ত বাঁচল না হে।'

পাতন বলল, 'মনিব-মা বলে বাঁচব না পাতন। আমি গেলে তুকে দেখতে কেও নাই। মিত্যু জেনে সি মাহাপাতকী করবে বলেছে।'

মেয়ে ঠিক হল, মেয়ের বাপ মা রাজি হল। কিন্তু মনিব-মা আর উপযুক্ত দিন পায় না।

পাতন বলে, 'মনিব-মা', দেরি হলে মিঞাটাকে আর আখবে নি ঘরে। সামাজে কথা উঠে যেয়েছে কত।'

'মেয়ের বাপ মা কী বলে?'

'উয়া বলে বিয়ার ফুল ঝিঙাফুল। যে সমঝোয় ফুটবে, সেই সমঝো বিয়া। তা সামাজ শুনে না।'

'র পাতন, জল নামুক। এখুন শুঁড়ি আটটা বাজতে ঘরে আসে। জল নামলে তবে তিনি বিলম্ব করে। তিনি ঘরে না অইতে কাজ হাসিল করতে হবে গো।'

'দেখ তুমি।'

মনিব-মার রোগ এদিকে বেড়ে চলে। কথায় কথায় আজকাল মনিব-মা মূর্ছা যায়। এই প্রথম বৈশাখে মনিব-মা ঠাকুরথনে বলি পাঠাল না, পুজো দিল না ঘণ্টেশ্বরীর মন্দিরে। মনিবকে বলল, 'মোর দেহ ভাল দিশে না গো। সতীনের ছ্যামা দেখি দিনেরাতে। মোর বুঝি দিন নাই গো। তুমাকে আবার সোমসার করতে হবে।'

মনিব বলে, 'বাঁজা বলে এত ওগ তুর। দেখ না, কবিরাজ বলে ছেলা তুর হবে মাতং। ছেলা হলে তুর বউয়ের ওগ যাবে।'

মনিব-মা চেঁচিয়ে কাঁদে। বলে, 'আমি বাঁজা, তু আঁটকুড়া। কার লেগে ট্যাকা এনে সিন্দুকে ভর? তুর জ্ঞাতগুষ্টি?'

মনিব-মার অঙ্গে জ্বালা উঠে যায়। সে কুয়োতলার মাটি গায়ে মাখে, হক না হক জল ঢালে মাথায়। বিড়বিড় করে বলে, 'পাতন রে! তু বিনা মোর কেও লাই। আমি বিনা তুর কেও লাই, তুকে আমি দিশা করে দিব।'

পাতন মনে ভক্তিভাব এনে মনিব মার মাথা টেপে, পা টেপে। মাথায় বাতাস করে।

এবার খরা বড় বেশি। মানুষ ভেবেছিল জল হবে না। শ্মশানতলার ভৈরবী পঞ্চতপা হোম করল সাতদিন ধরে। গ্রামের মানুষ সেখানে ভিড় করে রইল।

জল চেয়ে চেয়ে মানুষ কত ক্রিয়াকাণ্ডই যে করল। গ্রামের পাঁচজন একত্রে হয়ে পাঁচবাড়ির মেয়েকে দিয়ে রাজার দিঘির মরা বুকে কাড়া ডাকাল। বলি পাঁঠার রক্ত চৌচির মাটির বুকে নিমেষে শুষল, জল হল না।

আকাশ ধূমলবর্ণ। রাতেও আকাশে অন্ধকার নামে না। জল, জল বলে

হাহাকার উঠে গেল। গ্রামের সবচেয়ে নষ্ট মেয়ে পুন্নশশীকে শ্মশানতলায় মা বললেন, 'যা বলি তাই কর্।'

গ্রামের সবাই অমাবস্যার রাতে দোরগোড়ায় দুধে জলে একবাটি রেখে দোর দিল।

পুন্নশশী উদোম হয়ে মাথায় বীজধানের সরা নিয়ে দোরে দোরে ঘুরে সেই দুধ-জল নিল, ভাঁড়ে ঢালল। তারপর রাজারদিঘির বুকে সেই বীজধান আর দুধ জল ঢালল। কাঁপতে কাঁপতে পুন্নশশী ফিরে গেল ঘরে।

তারপর জল এল।

আকাশ কালো করে মেঘ এল জ্যৈষ্ঠের শেষে। ইঁদরাজার হাতির শুঁড়ে এত জলও ছিল!

ভরে উঠল রাজারদিঘি। কুয়োতে জল, খালখন্দে জল। বৃষ্টি থামলে আর ধরে না। আর তেমনি কি ঝড়! সরকারি জঙ্গলে শালগাছ মাতামাতি জুড়ল। গ্রামের ঘরে ঘরে চাল উড়ে গেল, মানুষের বড়ো কষ্ট।

এমনি এক ঝড়-বাদলের মাতাল রাতে, মনিব-মার সময় হল। মহাপাতকী করল ও।

'পাতন! পাতন রে! উঠে বস।' মনিব-মা গোয়ালঘরে এসে পাতনকে ডেকে তুলল। বলল, 'চল মোর সাথে।'

'কুথা?'

'চল্ তু। তুর মনিব ঘরে নাই। আজ আসবে না উ।' পাতনের কানের কাছে মুখ এনেছে মনিব মা। মনিব মার গায়ে আশ্চর্য সব গন্ধ। যেন অঙ্গ দিয়ে পাকিমদ চুঁয়ে পড়ছে।

'আসবে না?'

'না রে ভাম। তু ত্যাতক্ষণ ঘুমে অচেতন। বেচন বলে গেল মনিব যেয়ে আজ নবীনের ছেলার ঘরে জুটেছে। সেথা পুন্নশশী নাচতেছে, আমোদ খুব।'

'তুমি লিয়েছ সব?'

'সব রে, সব!'

মনিব মার গায়ে একটা চাদর। চোখ যেন জ্বলছে। মনিব-মা বলল, 'আয় তু!'

'কুথা যাব?'

'বলব সব। তুর লেগে মহাপাতকী হলাম। চাবি সরালাম দুপুরে। এখন

তু কত কথা শুধাস পাতন? যদি এসে পড়ে? তুকে মোকে জীয়ন্তে কাটবে।'

'চল তবে।'

'বেরিয়ে তুকে দিব সব। তুর পাট্টা, গয়না। তু নিয়ে চলে যাবি। আমি এসে যেমুনকে তেমুন নিদ যাব সব স্থমলে এখে। বলব পাতন চুরি করেছে গো।'

'আর আমি?'

'তু যেয়ে জঙ্গলের পথ ধরে পলাবি। পরে যেয়ে তুর সঙ্গে গঙ্গা চ্যান করব।'

'চল তবে।'

আকাশে কড়াকাবাজ্র বাজে। এই মেঘ, এই বৃষ্টি, এই অন্ধকার, সব যেন উন্মত্ত ব্যাধ। সকলের লক্ষ্য দুটি পশু। পশু দুটি দৌড়োচ্ছে।

দৌড়োতে দৌড়োতে পাতন আর মনিব-মা গ্রামের সীমানা ছাড়াল, পৌঁছে গেল দুবোইবাবার মাঠে। বাবা বড়ই জাগ্রত। তাঁর থান একটি পাকুড় গাছের নিচে। বছরে একদিন তাঁর পুজো হয় ধুমধামে। অন্য সময়ে বেচনের কাকা লখিন্দর বাবাকে ফুল জল দিয়ে যায়। শিলীভূত দুবোইবাবার অঙ্গধোওয়া দুধ জল খেলে সাপেকাটা মরা রুগি বেঁচে ওঠে।

মাঠটি বড় মন্দ জায়গা।

গ্রামের চারদিক, দশকোণ, চৌমাথা, তেমাথা, দিঘি, খেত, সব নানা রকম দেবদেবীদের হাতে। সে ঢেলাইচণ্ডী, দণ্ডেশ্বরী, ধর্মঠাকুর, বুড়নবাবার বাতাসে প্রেত্নিনীরা স্বস্তি পায় না। এই দুবোইবাবার মাঠে তারা চৈত্রের দুপুরে, জ্যোৎস্না-হসিত শারদ নিশীথে, এমনি ধারা আষাঢ়ে রাতে নাচে, হাসে, গান করে, মুখে আগুন নিয়ে ছোটে শেয়ালের রূপ ধরে। মরা গাছের ডাল হয়ে পড়ে থাকে। মানুষ পা দিলে মানুষকে নিয়ে শূন্যে তুলে আছাড় মারে।

এ মাঠের বুক জোড়া শুধু পাথর আর পাথর। অগণিত বছর ধরে এই গণ্ডশিলাগুলির চারপাশে কাঁকর মাটি জমে জমে সব পাথুরে হয়ে গিয়েছে। পাথরের মাঝে মাঝে বর্ষা পড়লে ঘাস জন্মায়। অন্য সময় সব হা হা করে রুক্ষ অনুর্বরতার বিফল ক্ষোভে।

এখানে এসে মনিব-মা বলল, 'টুকুন দাঁড়া পাতন! দম নি।'

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। মনিব-মা হাঁপাচ্ছে। মনিব-মা এখন এই পাথরগুলোর মতই প্রাগৈতিহাসিক, অন্ধকার রহস্যময়।

'দাও মোকে পাট্টা।'

গা থেকে চাদর খুলে ফেলল মনিব-মা। ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'মোর গয়না…' পাতনের কথা মুখে থেমে গেল। সর্বাঙ্গে গয়না পরেছে মনিব-মা। বিদ্যুতের ঘন ঘন আলোতে পাতন দেখল নাকে বেশর, গলায় হাঁসুলি, হাতে বালা, ওপর হাতে জশম, কোমরে রুপোর গোট। দেখল মনিব মার গায়ে কাপড ভিজে লেপটে আছে।

'স—ব লিয়ে এসেছি।' মনিব মা গেঁজে বের করল একটা। বড় চেনা গেঁজে গো। এ গেঁজের খাপে পরতে পরতে মদবেচা টাকা।

'কী করবে?'

চলে যাচ্ছে, মন থেকে ভক্তিভাব চলে যাচ্ছে। মনিব-মা এখন আগুন, উত্তপ্ত কুলকাঠের আংরা। ভক্ত্যা হয়ে সে আগুন ভক্তিভরে মাড়িয়ে যেতে পারে যদি, তবে পাতনের গা পোড়ে না। কিন্তু পাতন তা পারছে না। মনে মনে যত চেষ্টা করুক, ও শুধু দর্শক হয়ে যাচ্ছে। ভক্ত্যা হতে পারছে না। অঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে পাতনের।

'কী করবে?' পাতন আবার জিজ্ঞেস করল।

'তুর সাথে যাব।'

মোর সাথে!'

'মোর মত দলমলে মিঞা তু পাবি কুথা পাতন? মোরা চলে যাব, যেয়ে যেথা হয় থাকব। চল পাতন, জঙ্গল পেরায়ে আরো পথ, তা বাদে বাসরাস্তা, তা বাদে টিসন, টেনে চেপে যাব মোরা।'

'দাও।'

'কী?'

'মোর পাট্টা। মোর আত্মীরিপাট্টা।'

'পাট্টা লাই পাতন।'

'কী বল?'

'পাট্টা লাই। আমি সব দেখেছি হাঁচুড়ে নামিয়ে, হাটকেছি কত। পাট্টা থাকে কখুনো? কবেকার কাগজ। ই দেখ, তু বিশ্বাস যাবি না ই গামছায় বান্ধা ছিল। লিয়ে এসেছি, দেখ ত সব ছিড়া গুঁড়া ধুলাটা রে!'

'মিছা কথা! তুমার সিন্ধুকে মোরে মারা করাবে বলে এথে এসেছ, তুমি!'

'পাতনরে! মোর কথা শুন্!'

'মহাপাতকী কর‍্লে যদি তবে মোর পাট্টা!'

পাতন কথা শেষ না করতে মনিব মা দলমলে যৌবন নিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু পাতনের বুকে এখন শত শত ক্রুদ্ধ মাতঙ্গের হিংস্র আক্রোশ। সে ঠেলে ফেলে দিতে চায় মনিব মাকে। মনিব-মা ওকে জড়িয়ে ধরে ঠেলতে থাকে। তার শরীরেও এখন অমিত শক্তি।

পাতন ওকে ছাড়িয়ে দেয় গলার দুপাশে টিপে, ঝাঁকুনি দিয়ে। সে ঝাঁকুনিতে মনিব-মার গলাটা পেছন দিকে উলটে যায়, ঘাড় ভেঙে মাথা ঝুলে পড়ে পাশে। পাতন চেয়ে দেখে না। মনিব-মাকে ফেলে দেয় ও।

পাতন ফিরতি পথে দৌড়োয়। ছাই, তার আজীরিপাট্টা চাই। তারপর ও ফিরে আসবে দুবোইবাবার মাঠে। গেঁজেটা নেবে কেড়ে। তারপর ওই মহাপাতকী মনিব-মাকে ফেলে রেখে পাতন পালাবে।

মুক্ত মানুষের জন্মে পৃথিবীটা পড়ে আছে। সে পৃথিবীতে অনেক অনাবাদী শস্যভূমি, অনেক মেয়ে দলমলে যৌবন নিয়ে পাতনের, শুধু পাতনের জন্মে অপেক্ষা করছে। সে পৃথিবীতে ওকে পৌছোতেই হবে।

পুন্নশশীর নাচ তেমন জমেনি। মাতঙ্গ শুঁড়ি তাই ঘরে ফিরে এসেছিল তাড়াতাড়ি। সিন্দুকভাঙা দেখে ও শোরগোল তুলে মানুষ ডেকেছিল। ওর ঘরে তখন অনেক মানুষ।

পাতনকে ওরা ধরে ফেলল। আজীরিপাট্টার কথা শুনে মাতঙ্গ বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল।

কাঁদল দুবোইবাবার মাঠে দাঁড়িয়ে। মনিব-মার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে।

মনিব-মা মিথ্যা বলেনি। সে পাট্টা ছিল না, কোথাও ছিল না। পাট্টার অবশেষ ওই জীর্ণ ধুলোটুকু একটা গামছায় মোড়া ছিল। মাতঙ্গ নিজেও সে পাট্টা দেখেনি। তার বাবাও দেখেনি। দু-পুরুষ আগেই ভুলট কাগজ কালের প্রকোপে জীর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

পাতনকে ওরা হাতকড়া দিয়ে নিয়ে গেল থানায়।

# স্তনদায়িনী

মাসিপিসি বনগাঁ-বাসী বনের মধ্যে ঘর।

কখনো মাসি বলল না যে, খই মোয়াটা ধর।

যশোদার মাসি কখনো আদর করত, না অনাদর, তা যশোদার মনে পড়ে না। জন্ম থেকেই সে যেন কাঙালীচরণের বউ, হাতে গুণে জ্যেয়ন্তে-মরন্তে কুড়িটা ছেলেমেয়ের মা। মনেই পড়ে না যশোদার, কবে তার গর্ভে সন্তান ছিল না, মাথা ঘুরত না সকালে, কাঙালীর শরীর কুপি-জ্বালা আঁধারে তার শরীরকে ভূ-তাত্ত্বিকের মতো ড্রিল করত না। মাতৃত্ব সে সইতে পারে, কি পারে না, সে-হিসেব কোনোদিন খতিয়ে দেখতে সময় পায়নি। নিরন্তর মাতৃত্বই ছিল তার বাঁচবার ও অসংখ্য জীবের সংসারকে বাঁচাবার উপায়। যশোদা পেশায় জননী, প্রফেশ্যনাল মাদার। বাবুদের বাড়ির বউ-ঝির মতো এ্যামেচার মা ছিল না যশোদা। এ জীবন পেশাদারদের একচেটিয়া। এ্যামেচার ভিখিরি-পকেটমার-গণিকা এ শহরে পাত পায় না, এ রাজ্যে। এমন কি ফুটপাথ ও পথের নেড়িকুত্তা, ডাস্টবিনলোভী কাক—তারাও নবাগত এ্যামেচাদের ঠাঁই দেয় না, যশোদা মাতৃত্বকে পেশা হিসেবে নিয়েছিল।

সে জন্যে দায়ী হালদারবাবুদের নতুন জামাইয়ের স্টুডিবেকার গাড়ি এবং বাবু-বাড়ির ছোট ছেলের ভরদুপুরে চালক হবার আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাটি ছেলেটির মনে হঠাৎ জেগেছিল। হঠাৎ-হঠাৎ ছেলেটির মনে ও শরীরে যেসব বাতিক চাগাত, তা তৎক্ষণাৎ পরিতৃপ্ত করতে না পারলে ছেলেটি শান্ত হতো না। হঠাৎ-হঠাৎ বাতিকগুলি ওর দুপুরের নৈঃসঙ্গ্যেই চাগাত এবং বোগদাদের খলিফার মতো ওকে বান্দা খাটাত। এ পর্যন্ত সেকারণে সে যা-যা করেছে, তাতে করে যশোদাকে মাতৃত্বের পেশা নিতে হয়নি।

এক দুপুরে হঠাৎ কামের তাড়নায় ছেলেটি তাদের রাঁধুনিকে আক্রমণ করে ও রাঁধুনিটির পেটে তখন ভরা ভাত, চোরাই মুড়ো ও কচুশাকের ভার ছিল বলে, আলস্যে শরীর মন্থর ছিল বলে, রাঁধুনিটি, 'নঃ, কি করবি কর'—বলে চিতিয়ে পড়ে থাকে। অতঃপর ছেলেটির ঘাড় থেকে বোগদাদী ভূত

নামে এবং সে—'ক্যারেও কইও না মাসি' বলে সানুশোচনা অশ্রু ফেলে। র্‌াঁধুনিটি তাকে, 'ইয়াতে আর কওন-বলনের আছে কি?' বলে সত্বর ঘুমোতে যায়। সে কোনোদিনই কিছু বলে দিত না। কেন না তার শরীর ছেলেটিকে আকর্ষণ করেছে জেনে সে যথেষ্ট গর্বিত হয়েছিল। কিন্তু চোরের মন বোঁচকার দিকে। ছেলেটি পাতে অসংগত সংখ্যায় মাছ ও ভাজা দেখে মনে-মনে প্রমাদ গণে। মনে করে, র্‌াঁধুনি তাকে ফাঁসালে সে কেচ্ছায় পড়বে। অতএব আরেক দুপুরে সে বোগদাদী জিহনের তাড়সে মায়ের আংটি চুরি করে, সেটি র্‌াঁধুনির বালিশের ওয়াড়ে ঢোকায় এবং শোর তুলে র্‌াঁধুনিকে তাড়িয়ে ছাড়ে। আরেক দুপুরে সে বাবার ঘর থেকে রেডিও তুলে নিয়ে বেচে দিয়েছিল। দুপুরের সঙ্গে ছেলেটির এহেন আচরণের সংগতি খুঁজে পাওয়া তার মা-বাপের পক্ষেও মুশকিল, কেন না তার পিতা পঞ্জিকা দেখে হরিসালের হালদারদের ঐতিহ্যমতে সন্তানদের গভীর নিশীথে সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুত এ বাড়িতে ফটক পেরোলেই ষোড়শ শতক। পঞ্জিকা ও স্ত্রী-গ্রহণ এ বাড়িতে আজো আচরিত। কিন্তু এসব কথা বাই-লেন মাত্র। এ সকল দুপুরে-বাতিকের জন্যে যশোদার মাতৃত্ব পেশা হয়নি।

কোনো এক দুপুরে কাঙালীচরণ দোকানের মালিককে দোকানে বসিয়ে কোঁচার আড়ালে চারটি চোরাই সিঙাড়া জিলিপি নিয়ে ঘরে ফিরছিল। প্রত্যহই ফেরে। যশোদা ও সে ভাত খায়। ছানাপোনা তিনটি বিকেলে বাসি সিঙাড়া ও জিলিপি খায়। কাঙালীচরণ ময়রার দোকানে তাড়ু নাড়ে ও সিংহবাহিনীর মন্দিরের যাত্রীদের মধ্যে যারা 'হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র' হয়নি সে সকল জাত্যভিমানী বামুনদের 'সদ্‌ব্রাহ্মণের প্রস্তুত লুচি তরকারি' খাওয়ার লুচি ভেজে। প্রত্যহই সে ময়দাটা-আশটা সরায় ও সংসারে সুসার করে। দুপুর নাগাদ পেটে ভাত পড়লে যশোদার প্রতি তার বাৎসল্যভাব জাগে এবং যশোদার স্ফীত স্তন নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুর নাগাদ ঘরে ফিরতে ফিরতে কাঙালীচরণ অদূর সুখের কথা ভাবছিল এবং স্ত্রীর সুবর্তুল স্তনের কথা ভেবে সে স্বর্গসুখ পাচ্ছিল। কচি মেয়ে বিয়ে করে তাকে কম খাটিয়ে প্রচুর খাওয়ালে আখেরে দুপুরে সুখ মেলে একথা চিন্তা করে তার নিজেকে দূরদর্শী পুরুষবাচ্চা মনে হচ্ছিল। এহেন সময়ে বাবুদের ছেলে স্টুডিবেকার-সমেত ঘ্যাক করে কাঙালীচরণকে বাঁচিয়ে তার পায়ের পাতা ও গোড়ালির গোছ দুটি চাপা দিল।

নিমেষে লোক জমল। নেহাত বাড়ির সামনে দুর্ঘটনা, নইলে 'রক্তদর্শন করে ছেড়ে দিতুম' বলে নবীন পাণ্ডা চেঁচাতে লাগল। শক্তি স্বরূপিণী মায়ের পাণ্ডা সে, দুপুরে রৌদ্ররসে তেতে থাকে। নবীনের গর্জনে হালদাররা যে-যে বাড়িতে ছিল, সবাই বেরুল। হালদারকর্তা সগর্জনে 'হালা আবুইদা ষাঁড়, তুমি ব্রহ্মহত্যা করবায়?' বলে ছেলেকে পেটাতে থাকলেন। ছোট জামাই তখন স্বীয় স্টুডিবেকার সামান্য আহত দেখে স্বস্তিতে হাঁপ ছাড়লেন এবং এই পয়সায় ধনী, কালচারে-পাঁঠা শ্বশুরগোষ্ঠীর চেয়ে তিনি যে শ্রেষ্ঠতর মানুষ, তা প্রমাণের জন্য মিহিন আদ্দির পাঞ্জাবির মতো ফিনফিনে গলায় বললেন, 'লোকটা কি মারা যাবে? হাসপাতালে নিতে হবে না?'—কাঙালীর মনিবও ভিড়ের মধ্যে ছিল এবং পথে বিক্ষিপ্ত সিঙাড়া জিলিপি দেখে সে বলতে গিয়েছিল, 'ছিঃ ঠাকুর! তোমার এই কাজ?'—এখন সে জিভ আগলাল এবং বলল, 'তাই করুন সার।'—ছোট জামাই ও হালদারকর্তা কাঙালীচরণকে গস্তর হাসপাতালে নিলেন। কর্তার মনে আন্তরিক দুঃখ হল। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে, যখন তিনি ছাঁট লোহা বেচে কিনে মিত্রশক্তির ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে সহায়তা করছেন—তখন কাঙালীচরণ কিশোর মাত্র। বামুন বলে তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা রক্তের পোকা ও সেই কারণে ভোরে চাটুজ্জেবাবুকে না পেলে ছেলের বয়সী কাঙালীকে প্রণাম করে তার কাটা পায়ের ধুলো জিভে ঠেকাতেন। কাঙালী ও যশোদা তাঁর বাড়িতে পালেপার্বণে যায়-আসে এবং বউমারা পোয়াতি হলে যশোদাকে কাপড়-সিঁদুর পাঠানো হয়। এখন তিনি কাঙালীকে বললেন, 'কাঙালী! ভাইব না বাপ! আমি থাকতে তোমার কষ্ট অইব না।'—এখনি তাঁর মনে হল, কাঙালীর পায়ের পাতা দুটি কিমা হয়ে গেছে, ঠেকা পড়লে আর পায়ের ধুলো নিতে পারবেন না। ভেবে বড় দুঃখ হল তাঁর, এবং 'কি করলে হারামজাদায়' বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। হাসপাতালের ডাক্তারকে বললেন, 'সবকিছু করেন। টাকার লিগ্যা ভাইব্যেন না।'

কিন্তু ডাক্তারেরা পায়ের পাতা ফিরে দিতে পারলেন না। খুঁতো বামুন হয়ে কাঙালী ফিরে এল। ক্রাচ দুটি হালদারকর্তা করিয়ে দিলেন। ক্রাচ বগলে কাঙালী যেদিন ঘরে ফিরল, সেদিনই সে জানল, হালদার-বাড়ি থেকে প্রত্যহ যশোদার জন্য সিধা এসেছে। নবীন পাণ্ডা পাণ্ডা-কুলে সেজো। মায়ের ভোগের আড়াই আনার অংশীদার এবং সেই দুঃখে সে নিচু হয়ে থাকত। সিনেমায় রামকৃষ্ণকে কয়েকবার দেখার পর সে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই

মতে দেবীকে 'তুই, বেটি, পাগলি' বলে ও শাক্ত-মতে কারণবারি দ্বারা চেতনা নিষিক্ত করে রাখে। সে কাঙালীকে বলল, 'তোর জন্যে বেটির পায়ে ফুল চড়িয়েছিলুম।' খেপী বললে, 'কাঙালীর ঘরে আমার অংশ আছে, তার বরাতে ও বেঁচে উঠবে।' কাঙালী একথা যশোদাকে বলতে গিয়ে বলল, 'অ্যাঁ? আমি যখন ছিলাম না, তুই ওই নবনেটার সঙ্গে লটর-পটর কচ্ছিলি?' যশোদা তখনি পৃথিবীর দুই গোলার্ধের মাঝে কাঙালীর সন্দেহী মাথাটি চেপে ধরল ও বলল, 'রোজ বাবুদের দুটো ঝি এখেনে শুত আমাকে পাহারা দিতে। নব্‌নেকে আমি আমল দিই? আমি না তোমার সতী স্ত্রী?'

বস্তুত হালদার বাড়িতে গিয়েও কাঙালী তার প্রজ্বলন্ত সতীত্বমহিমার বহু কথা শুনল। যশোদা মায়ের মন্দিরে হত্যা দিয়েছে, সুবচনীর ব্রত করেছে, চেতলা গিয়ে সিদ্ধবাবার চরণ ধরেছে। অবশেষে সিংহবাহিনী স্বপ্নে ধাইয়ের বেশে বগলে ব্যাগ নিয়ে এসে তাকে বলেছেন, 'ভাবিসনি। তোর সোয়ামি ফিরে আসবে।' কাঙালী কথা শুনে বিশেষ অভিভূত হল। হালদারকর্তা বললেন, 'বুঝলা কাঙালী! হালার অবিশ্বাসীরা কয়, মায়ে স্বপ্ন দিব, তা ধাই সাইজ্জা ক্যান্? আমি কই, তিনি সৃষ্টি করেন মা অইয়া, ধাত্রী অইয়া পালন করে।'

এরপর কাঙালী বলল, 'বাবু! ময়রার দোকানে কাজ করব কি করে আর? কেরাচ নিয়ে তো বসে তাড়ু নাড়তে পারব না। আপনি ভগবান। কত লোককে কতভাবে অন্ন দিচ্ছেন। আমি ভিক্ষে চাইনি। এট্টা কাজের ব্যবস্থা করে দিন।'

হালদারবাবু বললেন, 'হ কাঙালি! তোমার লিগ্যা জায়গা দেইখ্যা থুইছি। আমার বারিন্দায় ছাউনি দিয়া এট্টা দোকান কইরা দিমু। সামনে সিংহবাহিনী। যাত্রী আসে, যাত্রী যায়। তুমি মুড়ি-মুড়কি, চিড়া বাতাসার দোকান দাও। অহন বারিতে বিয়া লাগছে। আমার সপ্তম পুত্র, হেই আবাইগার বিয়া। যদ্দিন না দোকান অয় তদ্দিন সিধা যাইবে।'

একথা শুনে কাঙালীর মন বর্ষা সমাগমে বাদুলে পোকার মত উড্ডীন হল ও ঘরে ফিরে সে যশোদাকে বলল, 'সেই যে কালিদাসের শোলোক আছে, নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে? —আমার কপালে তাই হল রে! বাবু বলছে, ছেলের বিয়ে মিটলে মকে দোকান করে দেবে। যদ্দিন না দিচ্ছে,

তদ্দিন সিধে পাঠাবে। ঠ্যাং থাকলে কি এরকমটা হতো? সবই মায়ের ইচ্ছে রে!'

ক্রাচ খটখটিয়ে কাঙালী সুসংবাদটি আপামরকে বিতরণ করল। ফলে তার প্রাক্তন মনিব নবীন পাণ্ডা, ফুলদোকানের কেষ্ট মহান্তি, মায়ের বাঁধা চণ্ডী উল্লাস, সকলে বলল, 'আহা! কলি বললে তো হয় না! মায়ের তল্লাটে পাপের পতন, পুণ্যের জয়, এ হতেই হচ্ছে। নইলে কাঙালীর পা খোয়া যাবে কেন? আর হালদারকর্তা বা বামুনের মন্দির ভয়ে এত কথা স্বীকার যাবে কেন? সবচে বড় কথা, যশোদাকে বা মা ধাই বেশে দেখা দেবে কেন? সবই মায়ের ইচ্ছে।'

এ ঘোর কলিতে পাঁচের দশকে কাঙালীচরণ পতিতুণ্ডকে ঘিরে দেড়শো বছর আগে স্বপ্নাদেশে প্রাপ্তা দেবী সিংহবাহিনীর ইচ্ছাসকল এভাবে পাক খাচ্ছে, তা দেখে সকলে যথোচিত বিস্মিত হয়। হালদারকর্তার হৃদ্‌-পরিবর্তন, সেও মায়ের ইচ্ছে। হালদারকর্তা পাত্র না দেখে দয়া করেন না। তিনি স্বাধীন ভারতের বাসিন্দা, যে ভারত মানুষে-মানুষে, রাজ্যে-রাজ্যে, ভাষায়-ভাষায়, রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বৈদিকে, উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থে, কাপ-কুলীনে প্রভেদ করে না। কিন্তু তিনি পয়সা করেছেন ব্রিটিশ আমলে যখন ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল ছিল পলিসি। হালদারকর্তার মানসিকতা তখনই গঠিত হয়ে গেছে। ফলে তিনি পাঞ্জাবি-উড়িয়া-বিহারি-গুজরাটি-মারাঠি-মুসলমান, কারুকে বিশ্বাস করেন না এবং দুর্গত বিহারি শিশু বা অনাহারে কাতর উড়িয়া ভিখারি দেখলে তাঁর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি গোপাল গেঞ্জির নিচে অবস্থিত, চর্বিতে সুরক্ষিত হৃৎপিণ্ডে করুণার ঘামাচি আদপে চুলকোয় না। তিনি হরিসালের সুসন্তান। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মাছি দেখলেও তিনি 'আঃ! হ্যাশের মাছি আছিল রিষ্টপুষ্ট—ঘটির হ্যাশে হকলডি চিমড়া-চামসা' বলে থাকেন। সেই হালদারকর্তা গাঙ্গেয় কাঙালীচরণকে কেন্দ্র করে করুণাঘন হচ্ছেন, এ দেখে মন্দিরের চারিদিকে সকলেই বিস্মিত হয় এবং কিছুদিন ধরে লোকের মুখে-মুখে এই কথাই ফেরে। হালদারকর্তা এমন ঘোর দেশপ্রেমী যে নাতি, ভাইপো, ভাগ্নেরা দেশনেতাদের জীবনী পাঠ্যপুস্তকে পড়লে কর্মচারীদের বলেন, 'হঃ! ঢাকার পোলা, মইমনসিংহের পোলা, যশুইরা পোলা, ইয়াগর জীবনী পড়ায় ক্যান? হরিসাইলা অইল দধীচির হাড়ে তৈয়ার। ব্যাদ উপনিষদ হরিসাইলার লিখা এ্যাও একদিন প্রকাশ পাইব।' তাঁর কর্মচারীরা তাঁকে এখন বলে, 'আপনার

চেইন্‌জ অফ হার্ট হইত্যাছে, ঘটির লিগ্যা আপনার এই দয়া, ইয়ার পাছে ছাখবেন ঈশ্বরের কুন্‌ বা পার্পাস আছে।' কর্তা একথায় হ্লাদিত হন এবং 'ব্রাহ্মণের কি ঘটি-বাঙাল অয় ? গলায় উপবীত থাকলে হায় পাইখানায় বইয়া রইলেও মাইন্য দিতে অইব' বলে উচ্চ হাস্য করেন।

চতুর্দিকে এভাবে মায়ের ইচ্ছার প্রভাবে করুণা-মায়ামমতা-দয়ার সুবাতাস বইতে থাকে এবং নবীন পাণ্ডা কয়েকদিন ধরে সিংহবাহিনীর কথা যতবারই ভাবতে যায়, যশোদার উত্তুঙ্গস্তনা, গুরুনিতম্বা শরীর তার চোখে ভাসে এবং মা যশোদাকে যেমন ধাই সেজে স্বপ্ন দিলেন তাকে যশোদা সেজে স্বপ্ন দিচ্ছেন কিনা সেকথা ভেবে তার শরীরে মন্দ উত্তেজনা জাগে। আট-আনার পাণ্ডা তাকে বলে, 'মেয়েছেলের এ রোগ হলে বলে প্যাদ রোগ, বেটাছেলের হলে বলে ম্যাদ রোগ। তুই পেচ্ছাপ করার সময়ে কানে শ্বেত অপরাজিতার শেকড় বাঁধ্‌।'

একথা নবীনের মনে নেয় না। একদিন সে কাঙালীকে বলে, 'মায়ের ছেলে শক্তি নিয়ে র‍্যালা করব না। তবে একটা বুদ্ধি মাথায় এয়েচে। বোষ্টম ভাব নিয়ে র‍্যালা করতে বাধা নেই। তোকে বলি, স্বপ্নে গোপাল পা একখানা। আমার পিসি শ্রীখেত্তর থেকে গোপাল এনিছিল পাতরের, সেটা তোকে দিই। স্বপ্ন পেইছিস বলে পচার দে। দেকবি ভুদিনে রমরমা হবে, ঝমঝমিয়ে পয়সা পড়বে। পয়সার জন্যে শুরু কর্‌, পরে মনে গোপাল-ভাব আসবে।'

কাঙালী বলে, 'ছি দাদা! ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তামাশা করতে আছে ?'

নবীন তাকে, 'তবে মর্‌গা যা!' বলে তাড়া দেয়। পরে দেখা যায়, নবীনের কথা শুনলে কাঙালী ভাল করত। কেন না, হালদারকর্তা হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে মরে যান। কাঙালী ও যশোদার মাথায় শেক্সপীয়রের ওয়েল্‌কিন ভেঙে পড়ে।

২০

কাঙালীকে পথে বসিয়ে যান হালদারকর্তা। কাঙালীকে ঘিরে ভায়া-মিডিয়া হালদারকর্তা সিংহবাহিনীর যেসব ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছিল, তা প্রাক্‌-ভোট রাজনীতিক দল-প্রদত্ত প্রজকস্তু প্রতিশ্রুতির মতো শূন্যে মিলায় ও নিরুদ্দেশ-যাত্রার নায়িকার মতো রহস্যজালের মায়ায় অদেখা হয়। কাঙালী ও যশোদার দুর্দিন

স্বপ্ন-ফানুসটিতে য়ুরোপীয় ডাইনির বডিকিন ফুট্‌কে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী আতান্তরে পড়ে। ঘরে গোপাল, নেপাল ও রাধারানী খাবার তরে আথখুটে বায়না ধরে ও মায়ের মুখ খায়। শিশুদের এই 'ওদনের তরে' কান্নাকাটি খুবই স্বাভাবিক। কাঙালীচরণের চরণ খোয়া যাবার পর থেকে ওরা প্রত্যহ হালদার-বাড়ির সিধায় ভালমন্দ খেয়েছে। কাঙালীও 'ভাতের তরে কাতর' হয় এবং মনে গোপাল-ভাব জাগিয়ে যশোদার বুকে মুখ খুঁশতে গিয়ে ধমক খায়। যশোদা একেবারে ভারতীয় রমণী, যে-রমণীর যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারহীন স্বামীভক্তি ও সন্তানপ্রেমের কথা, অস্বাভাবিক ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা, সতী-সাবিত্রী-সীতা থেকে শুরু করে নিরূপা রায় ও চাঁদ ওসমানি পর্যন্ত সকল ভারতীয় নারী জনমানসে জাগিয়ে রেখেছেন। এহেন স্ত্রীলোককে দেখেই সংসারের জ্বালা-মাক্‌ড়ারা বোঝে, ভারতে সেই ঐতিহ্য প্রবহমান—বোঝে এদের কথা মনে রেখেই এই সব আপ্তবাক্য রচিত হয়েছে—

স্ত্রীলোকের জান যেন কচ্ছপের প্রায়—
বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না—
পুড়বে নারী উড়বে ছাই
তবে নারীর গুণ গাই—

বস্তুত, বর্তমান দুরবস্থার জন্য যশোদার একবারও স্বামীকে দুষতে ইচ্ছে যায় না। শিশুদের তরে যেমন কাঙালীর তরেও তেমনি মমতা তার বুকে উছলে ওঠে। পৃথিবী হয়ে গিয়ে ফলে-শস্যে অক্ষম স্বামী ও নাবালক সন্তানদের ক্ষুধা মিটাতে ইচ্ছা যায়। যশোদার এই স্বামীর প্রতি বৎসল ভাবটির কথা জ্ঞানী-মুনিরা লিখে যাননি। তাঁরা প্রকৃতি ও পুরুষ এইভাবে নারী-পুরুষকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সে তাঁরা করেছেন আদ্যি যুগে—যখন অন্য দেশ থেকে তাঁরা এই পেনিনসুলায় প্রবেশ করলেন। ভারতের মাটির গুণ এমনি, যে এখানে রমণীরা সবাই জননী হয়ে যায় এবং পুরুষরা সবাই গোপাল-ভাবে আপ্লুত থাকে। সকল পুরুষই গোপাল ও সকল রমণী নন্দরানী, এ ভাবটি যাঁরা অস্বীকার করে নানারূপ 'ইটার্নাল শী'—'মোনালিসা—'লা পাসিওনারিয়া' —'সিমন দ্য ব্যোভোআর'—ইত্যাদি পছন্দমতো কারেন্ট পোস্টার পুরনো পোস্টারের ওপরে সাঁটতে চান ও মেয়েদের সে ভাবে দেখতে চান, তাঁরাও এ ভারতের ছানাপোনা। তাই দেখা যায় শিক্ষিত বাবুদের এ সকল অভীপ্সা বাইরের মেয়েছেলেদের জন্যে। ঘরে ঢুকলে তাঁরা বিপ্রবিনোদের মুখে ও

ব্যবহারে নন্দরানীকেই চান। প্রসেসটি খুবই জটিল। এটি বুঝেছিলেন বলে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নায়কদের সতত চারটি বেশি করে ভাত খাইয়ে দিতেন। শরৎচন্দ্রের এবং অন্যান্য অনুরূপ লেখকদের লেখার আপাতসরলতা আসলে খুব জটিল এবং সন্ধেবেলা শান্তমনে বেলের পানা খেয়ে চিন্তা করার কথা। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরাই লেখাপড়া ও চিন্তাশীলতার কারবার করেন, তাঁদের জীবনে আমাশার প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং সে কারণে বেল ফলটিতে তাঁদের সমধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বেলফল-থানকুনি-বাসক-পাতাকে সমধিক গুরুত্ব দিই না বলে আমরা যে কত কি হারাচ্ছি তা নিজেরা বুঝি না।

যা হোক, যশোদার জীবনকথা বলতে বসে বারংবার বাই-লেনে ঢোকার অভ্যেস ঠিক নয়। পাঠকের ধৈর্য কিছু কলকাতার পথঘাটের ফাটল নয় যে দশকে-দশকে বেড়ে চলবে। আসল কথা হল, যশোদা সমধিক ফাঁপরে পড়ল। কর্তার শ্রাদ্ধ চলার কালে তারা লুসেপুসে খেল বটে, কিন্তু সব চুকেবুকে গেলে যশোদা রাধারানীকে বুকে ধরে ও-বাড়িতে গেল। বাসনা, গিন্নিকে বলে-কয়ে তাঁর নিরিমিষ হেঁসেলে রান্নার কাজ চেয়ে নেবে।

গিন্নির বুকে কর্তার শোক বেজেছিল খুব। কিন্তু উকিলবাবু জানিয়ে গেছেন, কর্তা এই বাড়ির মালিকানা, চালের আড়তের স্বত্ব তাঁকেই দিয়ে গেছেন। তিনি সেই বলে বুক বেঁধে আবার সংসার-সাম্রাজ্যের হাল ধরেছেন। মাছটা-মুড়োটা বলে বড় কষ্ট হয়েছিল। এখন দেখছেন উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি, গাঙ্গুরামের দই-সন্দেশ, ঘন ক্ষীর ও মর্তমান কলা খেয়েও কোনোমতে শরীরটা টিকিয়ে রাখা চলে। গিন্নি জলচৌকি আলো করে বসে আছেন। কোলে এক ছ-মেসে ছেলে, গিন্নির নাতি। এ পর্যন্ত ছয় ছেলের বিয়ে হয়েছে ও পঞ্জিকায় যেহেতু প্রায় মাসেই স্ত্রী-গ্রহণ অনুমোদিত, সেহেতু গিন্নির বাড়িতে একতলায় সার-সার আঁতুড়ঘর প্রায়শ ফাঁক যায় না। লেডি ডাক্তার ও সরলা ধাই এ বাড়ি ছাড়া হয় না। গিন্নির মেয়ে ছয়টি। তারাও দেড় বছরে পোয়াতি। তাই কাঁথা-কানি-ঝিনুক-বোতল-রবারক্লথ-বেবি জনসন্ পাউডার-স্নানের গামলার এপিডেমিক লেগেই থাকে।

গিন্নিনাতিকে দুধ খাওয়াবার চেষ্টায় জেরবার হচ্ছেন ও যশোদাকে দেখে স্বস্তি পেয়ে যেন বললেন মা আমার ভগবান হইয়া আসছ! এ্যারে দুধ দাও মা, পা ধরি। মায়ের অসুখ · তা এমুন পোলা যে বুতল মুখে ধরে না। যশোদা তখনি ছেলেকে দুধ দিয়ে শান্ত করল। গিন্নির সনির্বন্ধ অনুরোধে যশোদা রাত

ন-টা অবধি ওবাড়িতে থাকল এবং গিন্নির নাতিকে দফায় দফায় দুধ দিল। তার সংসারের জন্যে রাঁধুনি বামনী ভাত-তরকারি গামলা ভরে দিয়ে এল। ছেলেকে দুধ দিতে দিতেই যশোদা বলল, 'মা! কর্তা তো কত কথাই বলেছিলেন। তিনি নেই তাই সেকথা আর ভাবি না। কিন্তু মা! তোমার বামুন-ছেলের পা দুখানা নেই। আমার জন্য ভাবি না। কিন্তু সোয়ামি-ছেলের কথা ভেবে বলছি যা হয় এট্টা কাজ দাও। নয় তোমার সোমসারে রান্না কাজ দিলে?'

'দেখি মা! চিন্তা কইরা দেখি।' গিন্নি কর্তার মতো বামুন-ভক্তা নন। তাঁর ছেলের দুপুরে বাই চাগানো দোষে কাঙালীর পা গেছে একথা তিনি পুরো মানেন না। নিয়তি কাঙালীর, নইলে খটখটে রোদে ফিকফিক করে হেসে-হেসে পথ ধরে সে যাচ্ছিল কেন? তিনি মুগ্ধ ঈর্ষায় যশোদার ম্যামাল প্রোজেকশান দেখেন ও বলেন, 'কামধেনু কইরা তোমায় পাঠাইছিল বিধাতা। বাঁট টানলেই দুধ! আমার ঘরে যেগুলা আনছি তাদের এ্যার সিকিভাগ দুধ-অ বুঠায় নাই!'

যশোদা বলে, 'সে আর বলতে মা! গোপাল ছেড়ে দিল, বয়স হল তিন বছর। এটা তখনো পেটে আসেনি। তাতেও দুধ যেন বান ডাকত। কোথেকে আসে মা? খাওয়া নেই, মাখা নেই!'

একথা নিয়ে রাতে মেয়ে মহলে প্রচুর কথা হয় এবং রাতে ব্যাটাছেলেরাও একথা শোনেন। মেজ ছেলে, যাঁর স্ত্রী অসুস্থ এবং যাঁর ছেলে যশোদার দুধ খেল, তিনি সবিশেষ স্ত্রৈণ। অন্য ভায়েদের সঙ্গে তাঁর তফাত হল, ভাইরা পাঁজি দেখে সুদিন পেলেই সপ্রেম বা অপ্রেমে বা বিরক্ত মনে বা কারবারে গুণ-চটের কথা ভাবতে ভাবতে সন্তান সৃজন করেন। মেজ ছেলে একই ফ্রিকোয়েনসিতে স্ত্রীকে গর্ভবতী করেন, কিন্তু তার পেছনে থাকে সুগভীর প্রেম। স্ত্রী বারবার গর্ভবতী হন, সে ভগবানের হাত। কিন্তু সেই সঙ্গে স্ত্রী যাতে সুন্দরী থাকেন, সেজন্যেও মেজছেলে আগ্রহী। ক্রমান্বয়ে গর্ভাধান ও সৌন্দর্যের কমবিনেশন কি ভাবে করা যায়, একথা তিনি অনেক ভেবে থাকেন, কিন্তু কূল পান না। মেজ ছেলে আজ স্ত্রীর মুখে যশোদার সারপ্লাস দুধের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ বলেন, 'পাইছি পথ!'

'কিসের পথ?'

'এই, তোমার কষ্ট বাচাইবার পথ।'

'কেমনে? আমার কষ্ট যাইব চিতায় ওঠলে। বছর-বিয়ানীর আর শরীল সারে?'

'সারব, সারব, ভগবানের কল হাতে পাইছি! বছর বিয়াইবা, তাহও থাকব।'

স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ হল। স্বামী সকালে গিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলেন ও ঘুচুর-ঘুচুর করে কথা কইলেন। গিন্নি প্রথমটা গাঁইগুঁই করতে লাগলেন, কিন্তু তারপর স্বগতচিন্তা করতে করতে বুঝলেন প্রস্তাবটি লাখ টাকার। বউরা এসেছে, বউরা মা হবে। মা হলে ছেলেকে দুধ খাওয়াবে। যেহেতু যতদিন সম্ভব, ততদিনই মা হবে—সেহেতু ক্রমান্বয়ে দুধ খাওয়ালে চেহারা ঝটকাবে। তখন যদি ছেলেরা বারমুখো হয়, বা বাড়ির ঝিদের ওপর উৎপাত করে, গিন্নি কিছু বলতে পারবেন না। ঘরে পাচ্ছে না বলে বাইরে যাচ্ছে—হক কথা। তাই যশোদা যদি কচি কাঁচাদের দুধ-মা হয়, তাহলে নিত্য সিধা, পুজোর পার্বণে কাপড়, মাসান্তে কিছু টাকা দিলেই কাজ হয়। গিন্নির বাড়িতে আজ চাপাড়াষষ্ঠী, কাল সুবচনী, পরশু মঙ্গলচণ্ডী ব্রত লেগেই থাকে। তাতেও যশোদাকে বামুন-এয়ো করা চলবে। তার ছেলের কারণে যশোদার এত খোয়াব, পাপও স্খালন হবে।

যশোদা তাঁর প্রস্তাবে হাতে মন্ত্রিত্ব পেল। নিজের স্তন দুটিকে বড় মহার্ঘ মনে হল তার। রাতে কাঙালীচরণ খুনসুড়ি করতে এলে সে বলল, 'দেখ! এখন এর জোরে সংসার টানব। বুঝে শুনে ব্যবহার করবে।' কাঙালীচরণ সে রাতে গাঁই-গুঁই করল বটে, কিন্তু সিধাতে চাল-ডাল-তেল-আনাজের বহর দেখে তার মন থেকে গোপাল-ভাবটি নিমেষে চলে গেল। ব্রহ্মা-ভাবে সে উদ্দীপিত হল এবং যশোদাকে বুঝিয়ে বলল, পেটে সন্তান থাকলে তবে তোর বুকে দুধ আসবে। এখন সেকথা ভেবেই তোকে কষ্ট করতে হবে। তুই সতীলক্ষ্মী। নিজেও পোয়াতি হবি, পেটে ছেলে ধরবি, বুকে পালন করবি, এ তো জেনেই মা তোকে ধাইবেশে দেখা দিইছিল।'

যশোদা এ কথার যাথার্থ্য বুঝল ও সাশ্রুচোখে বলল, 'তুমি স্বামী, তুমি গুরু যদি বিস্মরণ হয়ে না-না করি, তুমি সোঙরে দিও। কষ্ট আর কি বল? গিন্নিমা কি তেরটা বিয়োয়নি? গাছের কি ফল ধরতে কষ্ট হয়?'

অতএব সেই নিয়মই বহাল রইল। কাঙালীচরণ পেশাদারী পিতা হল।

যশোদা হল প্রফেশনাল মা। বস্তুত যশোদাকে দেখলে এখন সেই সাধকমার্গের গানটির গভীরতা অবিশ্বাসীরও মনে জাগে। গানটি হল—

মা হওয়া কি মুখের কথা?
শুধু প্রসব করে হয় না মাতা।

হালদার-বাড়ির চক্‌মেলানো উঠোনের চারধারে বড়-বড় ঘরে বারো-চোদ্দটি সুলক্ষণা গাভী হামেশা হামেহাল বজায় থাকে। দুজন ভোজপুরী গো-মাতা জ্ঞানে তাদের পরিচর্যা করে। খোল-ভুসি-খড়-ঘাস-গুড় পাহাড় পাহাড় আসে। হালদারগিন্নি বিশ্বাস করেন, গরু খাবে যত, দুধ দেবে তত। যশোদার জায়গা এ বাড়িতে এখন গো-মাতাদের ওপরে। গিন্নির ছেলেরা ব্রহ্মাবতার হয়ে প্রজাদের সৃষ্টি করে। যশোদা প্রজা প্রপালিকা। তার দুগ্ধসঞ্চয় যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে হালদারগিন্নি কড়া নজর রাখলেন। কাঙালীচরণকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁ বামুন ছেলে? দোকানে ত তাড়ু নাড়তা। ঘরে পাকসাকের ভারটা নিয়া অরে আরাম দেও। নিজের দুটো, এখানে তিনটা, পাঁচটারে দুধ দিয়া ঘরে গিয়া পাক-সাক করতে পারে?'

কাঙালীচরণের জ্ঞাননেত্র এভাবে খুলে গেল এবং নিচে এসে ভোজপুরীদ্বয় তাকে খৈনি দিয়ে বলল, 'মা জী ত ঠিকহি বলেছে। হামরা গো মাতার ইতনা সেবা করি—তা তুর বহু তো জগৎমাতা আছে।'

এরপর থেকে কাঙালীচরণ বাড়ির রান্নার ভার তুলে নিল হাতে। ছেলেমেয়েদের করে তুলল কাজের সাগরেদ। ক্রমে সে থোড়ঘণ্ট, কলাই ডাল, মাছের অম্বল রাঁধতে বড়ই সেয়ানা হল এবং সিংহবাহিনীর প্রসাদী পাঁঠার মাথার মুড়িঘণ্ট রেঁধে নবীনকে খাইয়ে-খাইয়ে সেই দুর্দান্ত গেঁজেল মাতালকে নিজের বশীভূত করে ফেলল। ফলে নবীন কাঙালীকে নকুলেশ্বর শিবের মন্দিরে ঢুকিয়ে দিল। যশোদা প্রত্যহ রাঁধা ভাতব্যঞ্জন খেয়ে পি. ডব্লু. অফিসারের ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টের মতো ফুলে ফেঁপে উঠল। তার ওপর গিন্নিমা তাকে দুধ-উঠনো করে দিলেন। পোয়াতি হলে তার জন্যে আচার-ঝালনাড়ু-মোরব্বা পাঠাতে থাকলেন।

এইভাবে অবিশ্বাসীদেরও প্রত্যয় জন্মাল, যশোদাকে সিংহবাহিনী এই কারণেই বগলে ব্যাগ নিয়ে ধাই হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। নইলে নিরন্তর গর্ভধারণ, সন্তান-প্রসব, অপরের ছানাপোনাকে গাভীর মতো অকাতরে দুগ্ধদান কে কবে শুনেছে বা দেখেছে? নবীনের মন থেকেও মন্দ ভাব চলে গেল।

পাঁঠার মাথা, কারণবারি, গাঁজা, এহেন উগ্র জিনিস খেয়েও তার শরীর আর তাতল না। মনে আপনা হতেই ভক্তিভাব এল। যশোদাকে সে দেখা হতেই 'মা! মা! মাগো!' বলে ডাকতে থাকল। চতুর্দিকে সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য বিষয়ে বিশ্বাস পুনর্জাগ্রত হল এবং অঞ্চলটির বাতাসে দেবীমাহাত্ম্যের ইলেকট্রিফাইং প্রভাব বইতে থাকল।

যশোদা বিষয়ে সকলের ভক্তিভাব এমন প্রখর হল যে বিয়ে-সাধ-অন্নপ্রাশন-পইতের সকলে তাকে ডেকে প্রধানা এয়োর সম্মান দিতে থাকল। যশোদার ছেলে বলে নেপাল-গোপাল-নেনো-বোঁচা-পটল ইত্যাদিকে সবাই সেই চোখে দেখতে থাকল, এবং যে যেমনটি বড় হল, পইতে নিয়ে মন্দিরে যাত্রী ধরে আনতে থাকল। রাধারানী, আলতারাণী, পদ্মরানী, ইত্যাদি মেয়েদের জন্যে কাঙালীকে বর খুঁজতে হল না। নবীন আশ্চর্য তৎপরতায় মেয়েদের বর জুটিয়ে দিল ও সতী মায়ের সতী কন্যারা যে যার শিবের ঘর করতে গেল।

হালদার-বাড়িতে যশোদার আদর বেড়ে গেল। স্বামীরা খুশি, কেন না এখন আর তাদের পাঁজি উলটোতে দেখলে বউদের হাঁটুতে ঠকঠকি লাগে না। তাঁদের গোপালরা যশোদার স্তন্যে লালিত হচ্ছে বলে তাঁরা যথেচ্ছ গোপাল হতে পারেন বিছানায়। বউদের 'না' বলবার মুখ রইল না। বউরা খুশি। কেন না দেহের ডোলটি ভাল থাকল। তারা যথেচ্ছ মেম কাটের জামা ও বডিস পরতে পারল। হোলনাইট সিনেমা দেখে শিবরাত্তির করার সময়ে ছেলেকে দুধ দিতে হল না। এ সবই সম্ভব হল যশোদার জন্যে। ফলে যশোদার মুখ খুলল এবং শিশুদের নিরন্তর স্তন দিতে দিতে গিন্নির ঘরে বসে সে ফুট কাটতে থাকল, 'মেয়েছেলে বিয়োবে, তার জন্যে ওষুধ রে, বেলাডডপেসার দেখা রে, ডাক্তার দেখানো রে। আদিখ্যেতা! এই তো আমি! বছর-বিউনি হইছি। তাতে কি শরীর টস্‌কাচ্ছে, না দুধ কমছে? কি ঘেন্না মা! শুনছি না কি ইঞ্জিশান দিয়ে সব দুধ শুকিয়ে ফেলছে। এমন কথাও শুনিনি কখনো!'

হালদার-বাড়ির ছেলেদের মধ্যে যারা কিশোর, তাদের বাপ-জ্যেঠা-কাকারা গোঁফ গজাতেই ঝিদের আওয়াজ দিত। দুধ-মার দুধে তারাও মানুষ, তাই দুধ-মার বন্ধু ঝি-রাঁধুনিকে তারা এখন মাতৃভাবে দেখতে থাকল এবং মেয়ে ইস্কুলের চারপাশে হাঁটাহাঁটি শুরু করল। ঝিয়েরা বলল, 'যশি! ভগবতী হয়ে এইছিলি তুই! তো' হতে বাড়ির হাওয়া পালটাল'

ছোটছেলে যখন একদিন উবু হয়ে বসে যশোদার দুগ্ধদান দেখছে তখন

যশোদা বলল, 'তুমি বাছা আমার লক্ষ্মী। বামুনের ঠ্যাং খুঁতো করেছিলে বলে তো এতসব হল? বল দেখি কার ইচ্ছেয় হল?'

ছোট হালদার বলল, 'সিংহবাহিনীর ইচ্ছে।'

তার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল, ঠ্যাং নেই, তবু কাঙালীচরণ ব্রহ্মা হয় কি উপায়ে? কথাটা ঠাকুরদেবতার দিকে চলে গেল বলে, সেও প্রশ্নটি ভুলে গেল।

সবই সিংহবাহিনীর ইচ্ছে।

৩.

পঞ্চাশের দশকে কাঙালীর ঠ্যাং কাটা যায়। আমাদের কাহিনী এই সময়ে পৌঁছেছে। পঁচিশ বছরে, খুড়ি তিরিশ বছরে, যশোদা কুড়ি বার আঁতুড়ে ঢুকেছে। শেষের দিকের মাতৃত্বগুলো বেফয়দা যায়, কেন না, কেমন করে যেন হালদার-বাড়িতে নতুন হাওয়া ঢুকে পড়ল। ওই পঁচিশ না তিরিশ বছরের গণ্ডগোলটুকু সেরে নিই। কাহিনী যখন শুরু হয় তখনি যশোদা তিন ছেলের মা ছিল। তারপর তার সতেরো বার সন্তান-সম্ভাবনা হয়। হালদার গিন্নিও মরে গেলেন। তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল, তাঁর শাশুড়ির যেমনটি হয়েছিল, তেমনটি বউদের কারো হোক। কুড়িটি সন্তান হলে আবার স্বামী-স্ত্রীর বিয়ে হবার নিয়ম ছিল বংশে। কিন্তু বউমারা বারো তেরো-চোদ্দতে ক্ষান্ত দিল। দুর্বুদ্ধিবশত তারা স্বামীদের বোঝাতে সক্ষম হল এবং হাসপাতালে গিয়ে ব্যবস্থা করে এল। সে সবই নতুন হাওয়ার কুফলে ঘটল। কোনো যুগেই জ্ঞানী পুরুষ বাড়িতে নতুন হাওয়া ঢুকতে দেন না। দিদিমার কাছে শুনেছি জনৈক ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে এসে 'শনিবারের চিঠি' পড়ে যেতেন। কদাচ ঘরে বইটি ঢোকাতেন না। বলতেন, 'বউ-মা বোন যে ওই কাগজ পড়বে, সেই বলবে আমি নারী! মা নই, বোন নই, বউ নই।' ফলে কি ঘটবে, তা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'চটি পরে ভাত রাঁধবে।' নতুন হাওয়ার প্রকোপে অন্দরে অশান্তি হয়, এ চিরকালের নিয়ম।

হালদার-বাড়িতে চিরকাল ষোড়শ শতক চলছিল। কিন্তু সহসা বাড়িতে মেম্বর সংখ্যা অগণিত হল বলে ছেলেরা যে-যার মতো নতুন বাড়ি বানিয়ে সটকে পড়তে থাকল। সবচেয়ে আপত্তির কথা, মাতৃত্ব বিষয়ে গিন্নির নাতবৌরা একেবারে উলটো হাওয়া খেয়ে ঘরে ঢুকল। বৃথাই গিন্নি বললেন, চালের

অভাব, টাকার অভাব নেই। কর্তার বড় সাধ ছিল হালদারদের দিয়ে অর্ধেক কলকাতা ভরে ফেলেন। নাতবৌরা নারাজ। তারা বুড়ির দাবড়ি অগ্রাহ্য করে স্বামীদের নিয়ে কর্মস্থলে ছুটল। এরই মধ্যে সিংহবাহিনীর মন্দিরের পাণ্ডাদের মধ্যে বিষম কলহ হওয়াতে কে বা কাহারা যেন দেবীর মূর্তি ঘুরিয়ে দিল। মা মুখ ফিরিয়েছেন একথা শুনে গিন্নির বুক ভেঙে গেল এবং মনোদুঃখে ভরা জ্যৈষ্ঠে অসংগত পরিমাণে কাঁঠাল খেয়ে দাস্তবমি হয়ে তিনি মরে গেলেন।

৪.

গিন্নি মরেই খালাস পেলেন, কিন্তু জ্যান্ত থাকার জ্বালা মরণ হতে বেশি গিন্নির মৃত্যুতে যশোদার আন্তরিক দুঃখ হল। বয়স্ক মানুষ পাড়ায় মরলে বাসিনীর মতো সুবিন্যাসে কেউ কাঁদতে পারে না, বাসিনী এ বাড়ির পুরোনো ঝি। কিন্তু যশোদার ভাতের থালাটি গিন্নির সঙ্গে বিসর্জন গেল, তাই যশোদা আরো সুবিন্যাসে কেঁদে সকলকে অবাক করে দিল।

বাসিনী কাঁদল, 'অ ভাগ্যিমানী মা' মাথার চুড়োটি খসতে কত্তা হয়ে সকলেরে যে আগলে রেকেছিলে মা! কার পাপে চলে গেলে মা গো! ওগো, আমি যে বন্নু, অত কাঁ্যাটাল খেওনি, তা মোর কতা যে মোটে নিলে না গো মা!'

যশোদা বাসিনীকে দম নিতে সুযোগ দিল ও সেই বিরতিতে কেঁদে উঠল, 'কেন রইবে মাগো! ভাগ্যিমানী তুমি, পাপের সংসারে রইবে কেন বল গো মা! সিংহাসন পাতা ছিল তা যে তুলে ফেললে গো বউদিরা। গাচ যখন বলে ফল ধরবনি, সে যে পাপ গো। অত পাপ কি তুমি সইতে পার মাগো। তা বাদে সিংহবাহিনী যে মুখ ফেরালে গো মা। বুঝিছিলে পুণ্যের পুরী পাপের পুরী হয়ে গেল, এ পুরীতে কি তুমি বাস কত্তে পার? কত্তা চলে যেতে তোমারো যে মন চলে গিইছিল গো মা। শরীলটা সংসারের দিকে চেয়ে ধরে রেখেছিলে বই তো নয়। অ বউদিরা। আলতা দিয়ে পায়ের ছাপ উটিয়ে রাখ গো। ও পায়ের ছাপ ঘরে রইলে লক্ষ্মী বাঁধা থাকবে গো! সকালে উঠে ওতে মাতা ঠেকালে ঘরে রোগ দুঃখ ঢুকবে না গো!'

শবদেহের পেছন-পেছন যশোদা কেঁদে-কেটে শ্মশানে গেল ও ফিরে এসে

বলল, 'স্বচক্ষে দেখনু সগ্‌গ থেকে রথ নেমে এসে চিতায় বুক থেকে গিন্নিমাকে নিয়ে ওপর পানে চলে গেল।'

গিন্নির শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে বড় বউ যশোদাকে বললেন, 'বামুন দিদি। সংসারে তো ভাঙন ধরল। মেজ সেজ বেলেঘাটার বাড়িতে উইঠা যাইত্যাছে। রাঙা আর নতুন যাইত্যাছে মানিকতলা-বাগমারী। ছোট যাইব গিয়া আমাগো দক্ষিণেশ্বরের বাড়ি।'

'এখানে কে থাকবে?'

'আমিই থাকুম। তবে গিয়া নিচতলা ভাড়া দিব হ্যায়। অহন সংসার গুটাইতে অইব। তোমার দুগ্ধে সবারে পাল্‌ছ, নিত্য সিধা গেচে। হ্যায় সন্তান দুধ ছারছে, তবুও আট বছর মা সিধা পাঠাইছে। উনি যা মন লয় তাই করছে। পোলারা কথা কয় নাই। কিন্তু অহন তো আর পারবাম না।'

'আমার কি হবে বড়বউদি?'

'তুমি যদি আমার সংসারে পাক-সাক কর, তোমার প্যাট চলব। কিন্তু ঘরের হকলডির কি করবা?'

'কি করব?'

'তুমিই কও। জেয়ন্তে তুমি বারো সন্তানের মা! মাইয়াগুলান্ বিয়া হইয়া গিছে। পুলারা ত শুনি যাত্রী ডাকে, মন্দিরে ভোগ খায়, চাতালে পইড়া থাকে। বামুনও ত শুনি নকুলেশ্বর মন্দির ভালই জমাইছে। তোমার অভাব কিসের?'

যশোদা চোখ মুছে বলল, 'দেখি! বামুনকে বলি।'

কাঙালীচরণের মন্দিরে এখন খুবই রমরমা। কাঙালী বলল, 'আমার মন্দিরে তুই কি করবি?'

'নব্‌নের বোনঝি কি করে?'

'সে মন্দিরের সোম্‌সার দেখে, রাঁধে-বাড়ে। তুই ঘরেই রাঁধিস না কদ্দিন, মন্দিরের উঠ্‌নো তুই ঠেলতে পারিস?'

'ওবাড়ির সিধে উঠে গেল। সে কতা মাথায় ঢুকল ড্যাকরার? খাবে কি?

নবীন বলল, 'সে তোকে ভাবতে হবে না।'

'এ্যাদ্দিন ভাবিয়েছিলে কেন? মন্দিরে খুব দু পয়সা হচ্ছে, তাই না? সব জমিয়েছ আর আমার গতরজল করা ভাত খেয়েছ বসে বসে।'

'বসে বসে রাঁধত কে ?'

যশোদা হাত নেড়ে বলল, 'বেটাছেলে এনে দেয়, মেয়েছেলে রাঁধে-বাড়ে। আমার কপালে সকলই উলটো হইছিল। আমার ভাত খেয়েছ যখন, তখন আমাকে ভাত দেবে এখন। ন্যায্য কথা।'

কাঙালী ফস্ করে বলল, 'কোত্থেকে ভাত যোগাড় করলি ? হালদার-বাড়ি তোর কপালে জুটত ? আমার ঠ্যাং কাটা গেল বলেই না তোর কপালে ওবাড়ির দোর খুলল ? কত্তা তো আমাকেই সব দেবেথোবে বলিছিল। সব ভুলে বসে আছিস মাগী ?

'তুমি মাগী না আমি মাগী ? বউয়ের গতরে খায়, সে আবার বেটাছেলে !'

একথা থেকে দুজনের তুমুল কলহ বেধে গেল। দুজনে দুজনকে শাপশাপান্ত করল। অবশেষে কাঙালী বলল, 'তোর মুখ আর দেখব না, যাঃ !'

'না দেখলে না দেখবে।'

যশোদাও রেগে ঘর ছেড়ে বেরলো। ইতিমধ্যে পাণ্ডাদের শরিকে-শরিকে সট হয়েছে, ঠাকুরের মুখ ফেরাতে হয়, নইলে সমূহ সর্বনাশ। সে জন্যে মন্দিরে মহা ধুমধামে প্রায়শ্চিত্ত পুজো হচ্ছে। যশোদা সেখানে হত্যা দিতে গেল। দুঃখে তার প্রৌঢ়, দুগ্ধহীন, স্থূল বুক দুটি ফেটে যাচ্ছে। সিংহবাহিনী তার দুঃখ বুঝে পথ বাতলে দিন।

তিনদিন যশোদা চাতলে পড়ে থাকল। নতুন হাওয়া সম্ভবত সিংহ-বাহিনীও খেয়েছেন। তিনি মোটেই স্বপ্নে দেখা দিলেন না। উপরন্তু তিনদিন উপোসী থেকে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে যশোদা যখন ঘরে গেল, ছোট ছেলে বলে গেল, 'বাপ মন্দিরে থাকবে। আমাকে আর নবাকে বলেছে তোরা ঘণ্টা বাজাবি, রোজ পেসাদ পাবি, পয়সা পাবি।'

'বটে। তা বাপ কোথা !'

'শুয়ে আছে। গোলাপী মাসি বাবার পিঠের ঘামাচি গেলে দিচ্চে। বলল, তোরা পয়সা দিয়ে ল্যাবেঞ্চুস খেগে যা। আমরা তাই তোকে বলতে এনু।'

যশোদা বুঝল, হালদার-বাড়িই নয়, কাঙালীর কাছেও তার দরকার ফুরিয়েছে। জলবাতাসা খেয়ে সে নবীনকে নালিশ করতে গেল। নবীনই সিংহবাহিনীর প্রতিমা হিঁচকে বিমুখ করেছিল ও অন্য পাণ্ডাদের সঙ্গে বাসন্তী

পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ও শারদ দুর্গাপূজার বিশেষ রোজগার বিষয়ে ফয়সালা হবার পর পুনর্বার প্রতিমাকে হিঁচড়ে মুখ ফিরিয়ে সে ব্যথিত নড়ায় পাকি মদ মালিশ করে গাঁজা টেনে বসেছিল এবং স্থানীয় ভোটের ক্যাণ্ডিডেটের উদ্দেশে বলেছিল. 'পুজো দিলি নে তো? মায়ের মাহাত্ম্য আবার ফিরেছে। এবার দেখে নেব কেমন করে জিতিস!'

মন্দিরের আওতায় থাকলে এ দশকেও কি কি অলৌকিক ঘটনা ঘটে, নবীনই তার প্রমাণ। দেবীর মুখ সে নিজেই ফিরিয়েছিল এবং নিজেই বিশ্বাস করেছিল পাণ্ডারা ভোট-চাই দলসকলের মতো জোট বাঁধছে না বলে মা বিমুখ হয়েছেন। এখন মার মুখ ফেরাবার পর তার আবার ধারণা জন্মাল, মা নিজে ফিরেছেন।

যশোদা বলল, 'কি বকছ?'

নবীন বলল, 'মায়ের মাহাত্ম্যের কথা কইছি।'

যশোদা বলল, 'নিজে ঠাকুরের মুখ ঘুরিয়েছিলে তা জানি না ভেবেছ?'

নবীন বলল, 'চুপ কর যশি। ঠাকুর শক্তি দিলে বুদ্ধি দিলে, তবে না আমা হতে কাজটি হল?'

'তোমাদের হাতে পড়ে মায়ের মাহাত্ম্য গেল।'

'মাহাত্ম্য গেল। গেলে পরে পাখা ঘুরছে, পাখার নিচে বসে আছিস, তা হল কি করে? চাতালের ছাতে ইলেটিরি পাখা এর আগে ঘুরেছে?'

'তা তো হল। এখন আমার কপাল পোড়ালে কেন, তাই কও দিকি? আমি তোমার কি করিছি?'

'কেন? ক্যাঙালী তো মরেনি?'

'মরবে কেন? মরার বাড়া হয়েছে।'

'কি হল?'

যশোদা চোখ মুছে ভারি গলায় বলল, 'এতগুলো পেটে ধরিছি, সেই বলে বাবুদের বাড়ি বাঁধাধরা দুধ-মা ছিলাম। জান তো সবই। কোনোদিন কুপথে হাঁটিনি।'

'আই ব্বাস্! তুই হলি গে মায়ের অংশ।'

'মা তো ভোগেরাগে রইল। অংশ যে অন্ন বিনে মরতে বলেছে। হালদারবাড়ি তো হাত ওঠালে।'

'তুই বা ক্যাঙালীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলি কেন? বেটাছেলে ভাতের খোঁটা সয়?'

'তুমি বা তোমার বোনঝিকে হোথা গছালে কেন?'

'সে ঠাকুরের লীলে হয়ে গেল। গোলাপী যেয়ে মন্দিরে ধন্না দিত। তা ক্রেমে-ক্রেমে ক্যাঙালী বুঝল ও হচ্চে ঠাকুরের ভৈরব আর গোলাপী ওর ভৈরবী।'

'ভৈরবী! খ্যাংরা মেরে ওর হাত হতে সোয়ামী ছাড়িয়ে আনতে পারি এখনি।'

নবীন বলল, 'নাঃ! সে আর হতে হচ্চে না। ক্যাঙালী পুরুষ ছেলে, ওর আর তোতে মন ওঠে? তা বাদে গোলাপীর ভাইটে সাক্ষাৎ গুণ্ডা, সে হোথা যেয়ে পাওরা দিচ্ছে। আমাকেই গেট আউট করে দিলে। আমি যদি দশ ছিলিম টানি, সে টানে বিশ ছিলিম। কঁ্যাকালে লাথি মেরে দিলে। যেয়েছিলাম তোর কথা বলতে। ক্যাঙালী বললে, ওর কতা আমায় বল না। ভাতার চেনে না, বাবু-বাড়ি চেনে। বাবু-বাড়ি ওর ইষ্টদেবতা, সেথা যাক গা।'

'তাই যাব!'

বলে সংসারের অবিচারে পাগল-শাগল যশোদা ঘরে ফিরল। কিন্তু শূন্য ঘরে মন টেকে না। দুধ থাক না থাক, কোলের কাছে একটা ছেলে না থাকলে ঘুম আসে না। মা হওয়া বড় ভীষণ নেশা। সে নেশা দুধ শুকোলেও কাটে না। অগত্যা মান খুইয়ে যশোদা হালদারনীর কাছে গেল বলল, 'রাঁধব বাড়ব, মাইনে দেবে দিও, না দেবে না দিও। হেথা থাকতে দিতে হবে। মিনসে নিজের মন্দিরে থাকতেছে। ছেলেগুলো কি বেইমান মা! সেথা গিয়ে জুটেছে। কার তরে ঘর আটকে রাখব মা?'

'তা থাকো। তুমি ছেলেদের দুধ দিছ, তায় বামুন। তা থাক। কিন্তু দিদি, থাকতে তোমার কষ্ট হইব। ওই বাসিনীদের লগে এক ঘরে থাকবা। ক্যান্নো, লগে ঝগড়াবিবাদ কইর না। বাবুর মাথা গরম। তার সেজ পুলা বুম্বে গিয়া সেই দেশী মেয়ে বিয়া বসছে বইলা ম্যাজাজ মন্দ। ক্যাচাকেচি হইলে তাই চটব।'

সন্তান হবার ক্ষমতাই যশোদার লক্ষ্মী ছিল। সেটি খতম হতেই তার কপালে এত, এত দুর্গতি ঘটল। পাড়ার মায়ের ভক্তবাড়িগুলির প্রত্যেক

দুগ্ধবতী সতীসাধ্বী যশোদার এখন পড়তির সময়। মানুষের স্বভাবধর্ম হল উঠতির কালে অসংগত অহমিকা হয় এবং পড়তির কালে 'অবস্থা বুঝে নিচু হয়ে থাকি'—এ সারেগুয়ার আসে না মনে। ফলে মানুষ তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আগের দাপে দামড়াতে যায় ও ব্যাঙের লাথি খায়।

যশোদার কপালেও তাই হল। বাসিনীরা তার পা ধোয়া জল খেত। এখন বাসিনী অক্লেশে বলল, 'তুমি তোমার বাসন মেজে নেবে। তুমি কি মনিব, যে তোমার এঁটো বাসন মাজব? তুমিও মনিবের চাকর, আমিও।'

'জানিস আমি কে?'—বলে গর্জে উঠতে যশোদা বড় বউয়ের মুখ শুনল, 'এই লিগাই আমার ডর ছিল খুব। মায়ে অরে মাথায় উঠাইয়া দিয়া গেছে। দেখ বামুন দিদি! ডাইকা আনি নাই, সাইধা আসছ, অশান্তি কইর না।

যশোদা বুঝল, এখন আর তার টুঁ কথাটিও কেউ শুনবে না। মুখ বুজে সে রাঁধল বাড়ল, এবং বিকেলে মন্দিরের চাতালে কাঁদতে বসল। মন খুলে কাঁদতেও পারল না। নকুলেশ্বর মন্দির থেকে আরতির বাজনা শুনে ও চোখ মুছে উঠে এল। মনে মনে বলল, 'এবার দয়া কর মা! শেষে কি টিনের বাটি হাতে পথে বসতে হবে? তাই চাও?'

হালদার-বাড়ি ভাত রেঁধে আর মায়ের কাছে মনোদুঃখ নিবেদন করে দিন কাটতে পারত। কিন্তু যশোদার কপালে তা সইল না। যশোদার দেহ যেন এলে পড়ল। কেন কিছুতে ভাল লাগে না, যশোদা বোঝে না। মাথার ভেতর বিভ্রম সব। রাঁধতে বসলে মনে হয় এ বাড়ির দুধ-মা। কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে সে সিধে নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। স্তন দুটি বড় শূন্য লাগে, যেন বরবাদ। স্তন বৃন্তে শিশুর মুখ নেই, এ তার জীবনে ঘটবে বলে ভাবেনি।

খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল যশি। ভাত তরকারি প্রায় সবই বেড়ে দেয়, নিজে খেতে ভুলে যায়। মাঝে-মাঝে নকুলেশ্বর শিবের উদ্দেশে বলে, 'মা না পারে, তুমিই আমায় সরিয়ে নাও। আর পারি না।'

শেষে বড় বউয়ের ছেলেরাই বলল, 'মা! দুধ-মার শরীর কি অসুস্থ? কেমন যেন হইয়া গেছে?'

বড় বউ বলল, 'দেখি!'

বড়বাবু বলল, 'দেখ! বামুনের মাইয়া, কিছু অইলে আমাগো পাপ অইব।'

বড় বউ জিজ্ঞেস করতে গেল। ভাত চড়িয়ে যশোদা রান্না ঘরেই আঁচল

পেতে শুয়েছিল। বড় বউ তার আদুড় গা দেখে বলল, 'বামুন দিদি! তোমার বাঁও মাইয়ের উপরটা লাল মতো দেখায় ক্যান? ইশ! দগদগা লাল!'

'কি জানি। ভেতরে যেন পাতর ঠেলে উঠেচে। বড শক্ত, ঢিল পারা।'

'কি অইল?'

'কি জানি? এতগুলোকে দুধ দিইছি, তাতেই হয়ত অমন ধারা হল?'

'ধুর! ঠুন্‌কা হয়, মাইঠোস হয় দুগ্ধ থাকলে। তোমার তো কুলেরটা দশ বছইরা।'

'সেটা নেই গো! তার উপরেরটা আছে। সেটা তো আঁতুড়ে গেছে। গেছে, ভাল গেছে! পাপের সংসার!'

'রও কাল ডাক্তার আইব নাতিরে দেখতে। তারে জিগামু। আমি যান্ ভাল দেখি না।'

যশোদা চোখ বুজে বলল, 'যেন, পাতরের মাই গো, পাতর পোরা। আগে শক্ত গুলিটা সরত নড়ত, এখন আর নড়ে না, সরে না।'

'ডাক্তাররে দেখামু।'

'না বউদিদি, বেটাছেলে ডাক্তারের কাছে আমি গা আদুড করতে পারব না।'

রাতে ডাক্তার আসতে ছেলেকে সামনে রেখে বড বউ জিজ্ঞেস করল। বলল, 'ব্যথা নাই, জ্বালা নাই কিন্তু হায় জানি আলাইয়া পডত্যাছে।

ডাক্তার বললেন, জেনে আসুন দিকি, কুঁচকে গেছে না কি নিপ্‌ল, বগলের নিচটা বিচিফোলা মতো কিনা।'

বিচিফোলা শুনে বড় বউয়ের মনে হল, ছিঃ! কি অসভ্য! তারপর সরজমিনে তদন্ত সেরে এসে বললেন, 'কয়, অনেকদিন থইক্যাই আপনে যা যা বললেন তা হয়েছে।'

'বয়স কত?'

'বড় ছেলের বয়স ধল্লে পরে পঞ্চান্ন হবে।'

ডাক্তার বললেন, 'ওষুধ দেব।'

বেরিয়ে গিয়ে বড়বাবুকে বললেন, 'আপনার কুকের ব্রেস্টে কি হয়েছে শুনলাম। আমার মনে হয় ক্যানসার হাসপাতালে নিয়ে দেখানো ভাল। চোখে দেখিনি। তবে যা শুনলাম, তাতে ম্যামারি গ্ল্যাণ্ডে ক্যানসার হতে পারে।'

বড়বাবু ষোড়শ শতকে সেদিন অব্দি ছিলেন। অতি ইদানিং তিনি বিংশ শতকে এসেছেন। তেরটি সন্তানের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন এবং ছেলেরা যে যার পথে মতে বড় হচ্ছে, বড় হয়েছে। কিন্তু এখনো তাঁর মগজের বুদ্ধি-কোষ অষ্টাদশ এবং প্রাক্-রেনেসাঁস উনিশ শতকীয় অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢাকা। আজও তিনি বসন্তের টিকা নেন না ও বলেন, 'বসন্ত হয় ছুডলোকের। আমার টিকা লইতে লাগব না। উচ্চ বংশ, দেবদ্বিজে ভক্তিমান বংশে ও রোগ হয় না।'

ক্যানসার শুনে তিনি উড়িয়ে দিলেন ও বললেন 'হঃ। হইলেই হইল ক্যানসার। অতই সোজা। কি শুনতে কি শুনছেন, যান, মলম দিলেই সারব। আপনের কথায় আমি বামুনের মাইয়ারে হাসপাতালে পাঠাইতে পারুম না।'

যশোদাও শুনেমেলে বলল, 'হাসপাতালে যেতে পারবনি বাপু। তার চে আমায় মত্তে বল। ছেলে বিয়োতে হাসপাতালে গেলুম না এখন যাব? হাসপাতালে গিছল বলে তো মডিপোড়া ঠ্যাং দুটো খুঁতো করে ফিরে এল।'

বড় বউ বলল 'সিদ্ধমলম আইনা দেই লাগাও। সিদ্ধমলমে ঠিক আরাম হইব। গুপ্ত ফোঁড়া মুখ লইয়া ফাটব।'

সিদ্ধমলমে কোনোই কাজ হল না এবং ক্রমে যশোদা খাওয়াদাওয়া ছেড়ে হীনবল হল। বাঁ দিকে আঁচল রাখতে পারে না। কখনো মনে হয় জ্বালা, কখনো মনে হয় ব্যাথা। অবশেষে চামড়া ফেটে ফেটে ঘা দেখা দিল। যশোদা বিছানা নিল।

ভাবগতিক দেখে বড়বাবুর ভয় হল, বুঝি তার ভিটেতে বামুন মরে। যশোদার ছেলেদের ডেকে সে ধমকে বলল, 'মা হয়, এতদিন খাওয়াইছে, এখন হ্যায় যে অসুখে মরে। তোরা নিয়া যা! হকলডি থাকতে হ্যায় কায়েতের ভিটায় মরব?'

কাঙালী একথা শুনে বড়ই কাঁদল ও যশোদার প্রায়ান্ধকার ঘরে এসে বলল, 'বউ! তুই সতীলক্ষ্মী! তোকে হেনস্তা করার পর দু বছরের মধ্যে মন্দিরের বাসন চুরি হল, আমার পিঠে ফোঁড়া হয়ে ভুগলাম, গোলাপী হারামজাদী ন্যাপলাকে ভুলিয়ে বাক্স ভেঙে সবস্ব নিয়ে তারকেশ্বরে দোকান দিলে। চ, তোরে আমি মাথায় করে রাখব।'

যশোদা বলল, 'বাতিটা জ্বাল।'

কাঙালী বাতি জ্বালল।

যশোদা অনাবৃত ও ঘা-বিজবিজে বামস্তন দেখিয়ে বলল, 'ঘা দেখেছ? ঘায়ের গন্ধ কেমন জান? এখন নিয়ে যেয়ে কি করবে? নিতে বা এলে কেন?'

'বাবু ডাকলে।'

'বাবু তবে রাখতে চাইছে না।'—যশোদা নিঃশ্বাস ফেলল, ও বলল, 'আমারে দিয়ে কোনো সুসার হবেনি জান? নিয়ে যেয়ে করবে বা কি?'

'তা হোক, কাল নে যাব। আজ ঘর পষ্কের করে রাখি। কাল নিয্যস নে যাব।'

'ছেলেরা ভালো আচে? মাঝে মধ্যে নবলে আর গৌরটা আসত, তাও আসে না।'

'সব বেটা সাথপর। আমার ইয়েতে জন্ম তো? আমার মতোই অমানুষ।'

'কাল আসবে?'

'আসব—আসব—আসব।'

যশোদা সহসা হাসল। সে হাসি বড়ই বুকে দাগা-দেওয়া ও প্রাচীন স্মৃতির কথা মনে-পড়ানো।

যশোদা বলল, 'হ্যাঁ গো মনে আচে?'

'কি মনে থাকবে বউ?'

'এই মাই নিয়ে তুমি কত সোহাগ কত্তে? নইলে তোমার ঘুম হতো না? কোল খালি হতো না, এটা বোঁটা ছাড়ে তো ওটা ধরে। তার বাবুর বাড়ির ছেলেগুলো! কি করে পাত্তাম, তাই ভাবি!'

'সব মনে আছে বউ!'

কাঙালীর এ কথাটি এ মুহূর্তে সত্য। যশোদার ক্লিষ্ট, শীর্ণ, কাতর চেহারা দেখে কাঙালীর স্বার্থপর দেহ ও প্রবৃত্তি এবং উদরসর্বস্ব চেতনাও অতীত স্মরণে মমতাকাতর হল। সে যশোদার হাতটি ধরল ও বলল, 'তোর জ্বর?'

'জ্বর তো হয়ই। আমি ভাবি ঘায়ের তাড়সে?'

'এমন পচা গন্ধ কোথেকে আসছে?'

'এই ঘা হতে।' যশোদা চোখ বুজে বলল।

তারপর বলল, 'তুমি বরং সন্নিসী ডাক্তারকে দেখিও। তিনি হোমোপাথি দিয়ে গোপালের টাইফয়েড সারিয়েছিল।'

'ডাকব। কালই নে যাব তোকে।'

কাঙালী চলে গেল। সে যে বেরিয়ে গেল, ক্রাচের খটখট শব্দ যশোদা শুনতে পেল না। চোখ বুজে, কাঙালী ঘরে আছে জানে নিজেকে বলল, 'দুধ দিলে মা হয়, স—ব মিছে কতা। না নেপাল-গোপালরা দেখে, না বাবুর ছেলেরা উঁকি মেরে এট্টা কতা শুধোয়।'

ঘা-গুলি শত মুখে, শত চোখে যশোদাকে ব্যঙ্গ করতে থাকল। যশোদা চোখ মেলে বলল, 'শুনচ ?'

তারপরই সে বুঝল কাঙালী চলে গেছে।

রাতেই সে বাসিনীকে দিয়ে লাইফবয় সাবান আনাল ও ভোর হতে সাবান নিয়ে নাইতে গেল। গন্ধ, কি দুর্গন্ধ। বেড়াল-কুকুর ডাস্টবিনে পচলে এমন গন্ধ হয়। যশোদা চিরকাল, বাবুদের ছেলেরা স্তনবৃন্ত মুখে দেবে বলে কত যত্নে তেলে-সাবানে স্তন দুটি মার্জনা করেছে। সেই স্তন তার এমন বেইমানি করল কেন ? সাবানের ঝাঁঝে চামড়া জ্বলে ওঠে। যশোদা তবু সাবান দিয়ে স্নান করে এল। মাথা ঝিমঝিম করে, সব যেন আঁধার আঁধার। যশোদার শরীরে আগুন, মাথায় আগুন। কালো মেঝেটি বড় ঠাণ্ডা। যশোদা আঁচল বিছিয়ে শুল। স্তনের ভার সে দাঁড়িয়ে সইতে পারছিল না।

সেই যে শুল যশোদা, জ্বরে অজ্ঞান ও বিবশ। কাঙালী ঠিক সময়েই এল ; কিন্তু যশোদাকে দেখে সে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। অবশেষে নবীন এসে ধমকে বলল, 'এরা কি মানুষ ? সবগুলো ছেলেকে দুধ দিয়া বাঁচাল, তা এট্টা ডাক্তার ডাকে না ? হরি ডাক্তারকে ডেকে আনছি !'

হরি ডাক্তার দেখেই বললেন, 'হাসপাতাল।'

এমন রুগী হাসপাতালে নেয় না। কিন্তু বড়বাবুর চেষ্টায় ও সুপারিশে যশোদা হাসপাতালে ভর্তি হল।

'কি হয়েছে ? অ ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে'—কাঙালী বালকের মতো কেঁদে জিজ্ঞেস করল।

'ক্যানসার।'

'মাইয়ে ক্যানসার হয় ?'

'নইলে হল কি করে ?'

'নিজের কুড়িটা, বাবুদের বাড়ির তিরিশটা ছেলে—খুব দুধ ছিল ডাক্তারবাবু—'

'কি বললে ? কতজনকে ফীড করেছে ?'

'তা পঞ্চাশ জনা তো হবে।'

'প—ঞ্চা—শ—জ—ন?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'ওর কুড়িটা সন্তান হয়েছে?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'গড্!'

'বাবু!'

'কি?'

'এত মাই খাওয়াত বলেই কি—?'

'তা বলা যায় না ক্যানসার কেন হয়, তা বলা যায় না। তবে বুকের দুধ যারা অতিরিক্ত খাওয়ায়—আগে বোঝ নি? একদিনে তো এমনটা হয়নি?'

'আমার কাছে ছিল না বাবু। ঝগড়া করে—'

'বুঝেছি!'

'কেমন দেখছেন?' ভাল হবে তো?

'ভাল হবে! কদিন থাকে সেই দেখ। এনেছ তো শেষ অবস্থায়। এ অবস্থা থেকে কেউ বাঁচে না।'

কাঙালী কাঁদতে কাঁদতে চলে এল। বিকেলে, কাঙালীর কান্নাকাটিতে বিপর্যস্ত হয়ে বড়বাবুর মেজছেলে ডাক্তারের কাছে গেল। যশোদার জন্যে তার সামান্যই উৎকণ্ঠা ছিল, কিন্তু বাবা হুড়কো দিলেন—সে বাবার টাকার ওপর নির্ভর করে।

ডাক্তার তাকে সব বুঝিয়ে বললেন। একদিনে হয়নি, বহুদিন ধরে হয়েছে। কেন হয়েছে? তা কেউই বলতে পারে না। বুকের ক্যানসার কি ভাবে বোঝা যাবে? স্তনের ওপর দিকে ভেতরে শক্ত গুলি, সেটা সরানো চলে। তারপর ক্রমে ভেতরের গুলি শক্ত ও বড় ও জমাট চাপের মতো হল। চামড়া কমলারঙ হওয়া প্রত্যাশিত, যেমন প্রত্যাশিত স্তনবৃন্তের সংকোচন। বগলের নিচে গ্ল্যাণ্ড আওয়ে উঠতে পারে। আল্সারেশন, অর্থাৎ ঘা যখন হল, তখন বলা চলে শেষ অবস্থা। জ্বর? সেটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে পড়বে গুরুত্বের দিক থেকে। শরীরে ঘা জাতীয় কিছু থাকলে জ্বর হতেই পারে। সেটা সেকেণ্ডারি।

এতগুলি বিশেষজ্ঞ-কথা শুনে মেজছেলের মাথা গুলিয়ে গেল। সে বলল, ‘বাঁচব ?’

‘না।’

‘কদ্দিন কষ্ট পাইব ?’

‘মনে হয় না বেশি দিন।’

‘কিছুই যখন করার নাই, কি চিকিৎসা করবেন ?’

‘পেইনকিলার, সেডেটিভ, জ্বরের জন্যে অ্যান্টিবায়োটিক। শরীরও তো ডাউন খুব, খুবই।’

‘খাওয়া ছাইরা দিছিল।’

‘কোনো ডাক্তার দেখান নি ?’

‘দেখ্‌ছিল।’

‘বলেন নি ?’

‘বল্‌ছিল।’

‘কি বলেছিলেন ?’

‘ক্যান্‌সার অইতে পারে। আসপাতালে লইতে বলছিল। হ্যায় যাইতে চায় নাই।’

‘চাইবে কেন ? মরবে যে!’

মেজছেলে বাড়ি ফিরে এসে বলে, ‘তখন যে অরুণ ডাক্তার কইল ক্যানসার হইছে তখন লইলেও বাঁচত বুঝি।’

তার মা বলল, ‘অতই যদি বুঝিস তবে লইস নাই ক্যান ? আমি কি বাধা দিছিলাম ?’

মেজছেলে ও তার মনের কোথাও অজানা পাপবোধ ও অনুশোচনা পচা ও আবদ্ধ জলে বুদ্‌বুদের মতো জাগছিল ও নিমেষে লয় পাচ্ছিল।

পাপবোধ বলছিল—আমাদের কাছেই আছিল, কুনদিন দেখি নাই উঁকি মাইরা, কবে বা হছিল রোগ, গুরুত্ব দেই নাই। হ্যায় তো আবুইদা মানুষ, আমাদের এত জনরে পালছিল, দেখি নাই অরে। অহন হকলে আসপাতালে গিয়া মরতাছে, পুলা এতগুলা, স্বামী আছে, আমাদের আকড়াইয়া ধরছিল যহন, তহন আমাদেরই—! এইও তাজা শরীর আছিল, দুধ খাইরাইত ঠিকরু দিয়া, কুনদিন ভাবি নাই হেয়ার এই রোগ অইব।

পাপবোধের লয় বলছিল—নিয়তি কে খণ্ডাইতে পারে! হেয়ার কপালে

আছে ক্যানসারে মরণ—ঠেকাইব ক্যাডা। আমাদের এহানে মরলে দোষ অইত—হেয়ার স্বামীপুত্র কইত কি কইরা মরল। অহন হেই দোষ হইতে বাচছি। কেও কিছু বলতে পারব না।

বড়বাবু ওদের আশ্বস্ত করে বলল, 'অহন অরুণ ডাক্তার কইতাছে ক্যান্সার হইলে কেও বাঁচে না। বামুন দিদির যেই ক্যানসার হইছে তা অইলে মাই কাইটা ফালায়, জরায়ু বাদ দেয়, হেয়ার পরও মাইন্‌ষে ক্যানসারে মরে। দেহ, বাবায় বামুন বইলা বড ভক্তি দিয়া গিছে—বাবার দয়ায় আমরা বাইচা আছি। ভিটায় বামুনদিদি মরলে প্রায়চ্চিত্ত করতে অইত।'

যশোদার চেয়ে কম আক্রান্ত রোগী কত আগে মরে, যশোদা ডাক্তারদের আশ্চর্য করে প্রায় এক মাস টিকে রইল হাসপাতালে। প্রথম প্রথম কাঙালী, নবীন, ছেলেরা যাতায়াত করেছিল বটে, কিন্তু যশোদা একই রকম আছে। কোমাটিক, জ্বরে ভাজা-ভাজা, আচ্ছন্ন। স্তনের ক্ষতগুলি ক্রমেই বড় বড় হাঁ করছে এবং স্তনটির চেহারা এখন এক নগ্ন ক্ষতসদৃশ। অ্যান্টিসেপটিক লোশন নিষিক্ত পাতলা গজ কাপড়ে সেটি আবৃত, কিন্তু গলিত মাংসের তীব্র গন্ধ ঘরের বাতাসে ধূপের ধোঁয়ার মতো নীরবে ও চক্রাকারে ছড়াচ্ছে সর্বদা। ত দেখে কাঙালীদের উৎসাহে ভ'টা পড়ল ও ডাক্তারও বললেন, 'সাড়া দিচ্ছে না? না দিলেই তো ভাল। অজ্ঞানেই সওয়া যায় না, সজ্ঞানে কেউ ঐ যমযন্ত্রণা সইতে পারে?'

'কিছু জানছে, আমরা আসি যাই বলে?'

'বলা কঠিন।'

'খাচ্চে কিছু?'

'নল দিয়ে।'

'তাতে মানুষ বাঁচে?'

'এখন যে খুব—'

ডাক্তার বুঝলেন, যশোদার এ অবস্থার জন্ত তাঁর মনে অহেতুক রাগ হচ্ছে। যশোদার ওপর কাঙালীর ওপর, যে সব মেয়েরা ব্রেস্ট-ক্যানসারের লক্ষণকে যথেষ্ট সিরিয়াসলি নেয় না এবং আখেরে বীভৎস নরক যন্ত্রণায় মরে, তাদের ওপর। ক্যানসার, রোগী ও ডাক্তারকে নিয়ত পরাজিত করে। একটি রোগীর ক্যানসার মানে রোগীর মৃত্যু এবং বিজ্ঞানের পরাজয়, ডাক্তারের তো বটেই। সেকেণ্ডারি সিম্প্‌টমের ওষুধ দেওয়া যায়, খাওয়া বন্ধ হলে ড্রিপ দিয়ে

শরীরকে গ্লুকোজ খাওয়ানো চলে, শ্বাস নিতে ফুসফুস অপারগ হলে অক্সিজেন —কিন্তু ক্যানসারের অগ্রগমণ, প্রসারণ, ব্যাপ্তি, হত্যা, অব্যাহত থাকে। ক্যানসার শব্দটি এক সাধারণ সংজ্ঞা, এ সংজ্ঞা দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ম্যালিগ্‌ন্যান্ট গ্রোথ বোঝায়। 'দি গ্রোথ ইজ পার্পাসলেস, প্যারাসাইটিক, অ্যান্ড ফ্লারিশেস অ্যাট দি এক্‌সপেন্‌স অফ দি হিউম্যান হোস্ট।' এর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য হল, সংক্রমিত শরীরাংশকে ধ্বংসকরণ, মেটাস্‌টাশিয়া দ্বারা ব্যাপ্তি, রিমুভালের পর প্রত্যাবর্তন, টক্‌সিমিয়া সংঘটন।

কাঙালী তার প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে বেরিয়ে এল। মন্দিরে এসে সে নবীন ও ছেলেদের বলল, 'আর যেয়ে লাভ নেই। চিনতে পারে না, চোখ খোলে না, জানতে পারে না। ডাক্তার যা পারে কত্তেছে।'

নবীন বলল, 'যদি মরে যায়?'

'বড়বাবুর টেলিফোন নম্বর আচে, বলবে।'

'ধর যদি তোমারে দেকতে চায়। সতীলক্ষ্মী বউ তোমার ক্যাঙালী। কে বলবে এতগুনোর মা। শরীর দেকলে—তা কোনো দিকে হেলেনি, চায়নি।'

বলতে বলতে নবীন গুম্ মেরে গেল। বস্তুত, অচৈতন যশোদার ক্ষতাক্রান্ত স্তন দেখার পর তার গাঁজা-চরস-মদ জনিত ঘোলাটে মাথায় বহু দার্শনিক চিন্তা ও দেহতত্ত্বের কথা মিথুনমত্ত ঢোঁড়া সাপের মতো মন্থর খেলা করে। যেমন,—ওর জন্তেই এত আকুলি-ব্যাকুলি ছিল?—সেই মনমাতানো বুকের এই পরিণাম? হোঃ! মানবদেহ কিস্‌সু নয়। তার তরে পাগল হয় যে সেও পাগল।

কাঙালীর এত কথা ভাল লাগল না। যশোদার প্রতি তার মন থেকেই রিজেকশান এসে গিয়েছিল। সেদিন হালদার-বাড়ি যশোদাকে দেখে মন সত্যিই কাতর হয় ও হাসপাতালে নেবার পরও ব্যাকুলতা থাকে। কিন্তু সে অনুভূতি ঠাণ্ডা মেরে আসছে এখন। ডাক্তার যখন বলেছে যশোদা বাঁচবে না, সে মন থেকে যশোদাকে প্রায় অকষ্টে বাদ দিয়েছে। তার ছেলেরাও তারই ছেলে। তাছাড়া মা তাদের কাছে অনেকদিনই দূরের মানুষ হয়ে গেছে। মা মানে চুড়ো করে বাঁধা চুল ধপধপে কাপড়, প্রবল ব্যক্তিত্ব। হাসপাতালে যে শুয়ে আছে, সে অন্য কেউ, মা নয়।

স্তনের ক্যানসারে ব্রেন কোমাটোজ হয়, যশোদার বেলা সেটি মুশকিল-আসান হল।

সে যে হাসপাতালে এসেছে, হাসপাতালে আছে, তা বুঝল যশোদা এবং এও বুঝল, এই যে বিবশকারী ঘুম, এ ওষুধের ঘুম। তাতে খুব স্বস্তি হল তার এবং দুর্বল ও আক্রান্ত, আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে মনে হল, হালদার-বাড়ির কোনো ছেলেটা কি ডাক্তার হয়েছে? নিশ্চয় তার দুধ খেয়েছে বলে এখন দুধের ঋন শুধছে? কিন্তু ওবাড়ির ছেলেরা তো স্কুল না পেরোতে কারবারে ঢোকে। যেই হোক, যারা এত করছে তারা বুকের দুর্গন্ধময় উপস্থিতিটা থেকে তাকে মুক্তি দেয় না কেন? কি দুর্গন্ধ, কি বেইমানি? এই স্তনকে সে ভাতের যোগনদার জেনে নিয়ত গর্ভ ধরে দুধে ভরে রাখত। স্তনের কাজই দুধ ধরা। কত গন্ধসাবানে স্তন মেজে পরিষ্কার রাখত, বড্ড ভারি ছিল বলে জামা পরেনি যৌবনেও।

সেডেশান কমে এলেই যশোদা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আঃ! আঃ! আঃ!'—এবং ব্যাকুল ঘোলাটে চোখে নার্স ও ডাক্তারকে চায়। ডাক্তার এলে সাভিমানে বিড়বিড় করে বলে, 'দুধ খেয়ে এত বড়টা হলে এখন এমন কষ্ট দিচ্ছ?'

ডাক্তার বলে, 'বিশ্বসংসারে দুধ-ছেলে দেখছে!'

আবার ইঞ্জেকশন ও আবার নিদ্রাচ্ছন্ন আড়ষ্টতা। যন্ত্রণা, ভীষণ যন্ত্রণা, অ্যাট দি এক্‌স্‌পেন্‌স অফ দি হিউম্যান হোস্ট ক্যানসার সংক্রমিত হচ্ছে। ক্রমে যশোদার বাম স্তন ফেটে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার-সদৃশ হল। পূতিগন্ধে কাছে যেতে কষ্ট হয়।

শেষে এক রাতে, যশোদা বুঝল তার পা ও হাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। চোখ খুলতে পারল না যশোদা, কিন্তু বুঝল, কেউ কেউ তার হাত দেখছে। স্যূচ বিঁধল বাহুতে। ভেতরে শ্বাসের কষ্ট। হতেই হবে। কারা দেখছে? তারা কি তার আপন কেউ? যাদের পেটে ধরেছিল বলে দুধ দেয়, ভাতের জন্য যাদের দুধ দেয়, যশোদার মনে হল সে তো বিশ্বসংসারকে দুধ দিয়েছে, তবে সে কি একা-একা মরতে পারে? যে ডাক্তার দেখছে সে, যে ওর মুখে চাদর টেনে দেবে সে, যে ওকে ট্রলিতে তুলবে সে, যে ওকে শ্মশানে নামাবে সে, যে ওকে চুল্লিতে দেবে সে ডোম, সবাই তার দুধ-ছেলে। বিশ্বসংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ

থাকে না। অথচ শেষ সময়টা কারো থাকার কথা ছিল। সে কে? কে সে? সে কে?

যশোদা মারা গেল রাত এগারোটায়।

বড়বাবুর বাড়ি ফোন গেল। রাতে ওঁদের ফোন ডিস্কানেক্ট করা থাকে।

হাসপাতালের মর্গে যথাবিধি পড়ে থেকে যশোদা দেবী, হিন্দু ফিমেল। যথা সময়ে গাড়িতে শশ্মানে গেল ও দাহ হল। ডোমই তাকে দাহ করল। যশোদা যা-যা ভেবেছিল ঠিক তাই-তাই হল। যশোদা ঈশ্বর-স্বরূপিণী। সে যা ভাবে অন্যেরা ঠিক তাই করে, তাই করল। যশোদার মৃত্যুও ঈশ্বরের মৃত্যু। এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে সতত একলা মরতে হয়।